ডাঃ শ্রীব্রজগোপাল দাস

দাম পাঁচ টাকা

আষাঢ় ১৩৬৭ সাল

ডি, এম, লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট. কলিকাতা হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে
শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্তৃক মুদ্রিত

নিবেদন

১৯৪২-৫১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু এটা হচ্ছে নিছক উপন্যাস, ইতিহাস বা জীবনকাহিনী নয়। এর মধ্যে যে সব চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে জীবিত বা মৃত কোন লোকেরই সাদৃশ্য নেই। তবে এই দশ বছরের বাংলাদেশের পটভূমিকার যে ছবি আঁকা হয়েছে তা' যে নিতান্ত মিথ্যা নয় এ কথা আশা করি প্রত্যেক নিরপেক্ষ পাঠকই স্বীকার করবেন।

[illegible]গোপাল দাস
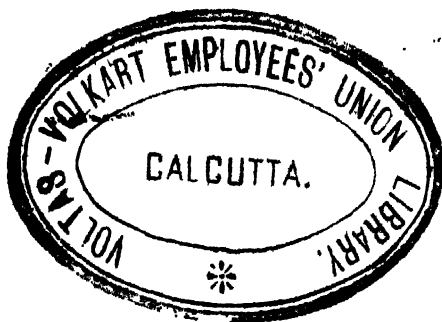
এই লেখকেরই

* উপন্যাস *

অনবগুণ্ঠিতা ৩'০০

সাগরদোলায় ঢেউ ৩'০০

নিঃসহ যৌবন ৪'৫০

* ছোটগল্প *

তারা দু'জন ২.৫০

অপরিচিতা দেবী ৩.৫০

* স্মৃতিকাহিনী *

এক অধ্যায় (যন্ত্রস্থ)

অভিযাত্রী

প্রথম পর্ব্ব

এক
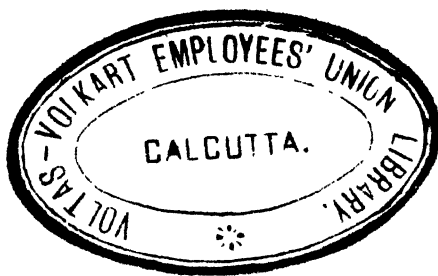
হঠ্ যাও—হঠ্ যাও—পালাও—পালাও—পুলিশ আসছে—

চার দিকে অস্বাভাবিক একটা কোলাহল, আর অগুণ্তি পথচারী, মেয়ে এবং পুরুষ, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায়, যেন প্রকাণ্ড একটা বিভীষিকার তাড়নায়।

রসা রোড এবং রাসবিহারী এভিন্যুর সংযোগস্থল। প্রদীপ তখন সবেমাত্র ট্রাম থেকে নেমেছে।

পলায়মান একটি ছেলেকে সে প্রশ্ন করল, কি হয়েছে হে? ছুটছ কেন?

—কংগ্রেসী দু'তিনজন ভলাণ্টিয়ার নিশান উঁচিয়ে পুলিশদের কি যেন বলেছিল, পুলিশ তাদের পেছনে ছুটেছে, ভলাণ্টিয়াররা ত কোথায় ভীড়ের মধ্যে মিশে গেছে, এখন যাকে সন্দেহ হবে তাকেই জেলে পুরবে, আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না, মশায়, এখখুনি কোন দোকানে ঢুকে পড়ুন। বলতে বলতে ছেলেটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে কোলাহলমুখর জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়ল কেমন একটা অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা।

প্রদীপ কিন্তু ছেলেটির উপদেশ শুনল না, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। অনতিবিলম্বে লরীবোঝাই সশস্ত্র একদল সিপাই এসে তার সামনে থামল।

একজন লালমুখো সার্জেন্ট লাফিয়ে নেমে পড়ল, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নাম্‌ল আরও তিন-চার জন পুলিশ।

সাম্‌নে প্রদীপকে দেখেই সার্জেন্টটি হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করল, ট্র্যাম্‌ নিশান দেখায়া? সাচ্‌ বাট্‌ ব'লো—Otherwise the consequences won't be very pleasant—

মৃদু হেসে প্রদীপ বাংলায় জবাব দিল, সার্জেন্ট-সাহেব, সত্যি কথা বলব নিশ্চয়ই, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি তুমি? নিশান আমি দেখাইনি, তবে প্রয়োজন হ'লে দেখাতে আমি পেছপা হ'ব না।

রাগে মুখ আরও লাল করে সার্জেন্ট বলল, ওঃ, টামাসা হচ্ছে! I am asking you for the last time: have you or have you not insulted the members of His Majesty's Forces?

—বলেছি ত সার্জেন্ট-সাহেব, নিশান আমি দেখাইনি। কিন্তু নিশানের ওপর এত রাগ কেন? নিশান ত বন্দুকও নয়, বোমাও নয়!

—Shut up, you b-d! চীৎকার করে উঠল সার্জেন্ট।

—মুখ সামলে কথা ব'লো, সার্জেন্ট-সাহেব। প্রদীপও সমান ওজনে চেঁচিয়ে উঠল।

মুহূর্তের মধ্যে সঙ্গের দু'জন পুলিশের লাঠির আঘাত পড়ল প্রদীপের হাঁটু এবং বুকের উপর। অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে সে ফুটপাতের উপর পড়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে সে যখন তার চেতনা ফিরে পেল, দেখল তার চার দিকে ছোটখাট একটা ভীড় জমে উঠেছে। পার্শ্বস্থ দোকানীটি এবং আরও একজন ভদ্রলোক তার চোখে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে। সার্জেন্ট বা পুলিশ বা তাদের লরীর চিহ্নমাত্রও নেই।

জ্ঞান ফিরেএসেছে—চোট বোধ হয় বিশেষ লাগেনি—পুলিশদের অত্যাচারে কলকাতায় থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আপনি ত অদ্ভুত একগুঁয়ে মানুষ মশায়, সামনেই দোকানের দরজা খোলা ছিল, ঢুকে গেলেই পারতেন—চার দিক

থেকে এই প্রকার মন্তব্য প্রদীপ শুনতে পেল। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল।

চলতে পারবেন কি ?—কোথায় যাবেন ?—একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব ?—ভিড়ের মাঝখান থেকে আবার প্রশ্ন উঠল।

একটু হেসে প্রদীপ জবাব দিল, ভাববেন না, খুব কাছেই আমার বাসা, হেঁটেই যেতে পারব।

যারা প্রশ্ন করেছিল, তারা যেন একটু ক্ষুণ্ণ বোধ করল। একজন তাকে শুনিয়েই তার বন্ধুকে বলল, দেখছ না, কিছুই হয়নি, সেয়ানা ছেলে, পুলিশের লাঠি গায়ে পড়তে না পড়তেই এমন ভাব দেখালেন, যেন কি ভয়ানক চোট লেগেছে।

পথ চলতে চলতে প্রদীপ থমকে দাঁড়াল। মেসে এখন যাওয়া চলবে না, যতীনদাস রোড-এ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সঙ্গে দেখা করা যে নিতান্তই প্রয়োজন।

পথের ওপাশে চা'য়ের দোকানের সম্মুখে পাড়ার ছেলেরা জড়ো হয়েছে। ওখানে একটা রেডিও এবং লাউডস্পীকার বসানো হয়েছে, দৈনন্দিন খবর সরবরাহ করবার জন্য। তা ছাড়া সিনেমার গানও শোনা যায়।

ট্রামলাইনটা ক্রশ করতে করতে প্রদীপ শুনল, রেডিয়োতে খবর বলছে, জাপানীরা বর্ম্মা-মুলুকে আরও এগিয়ে এসেছে, ওদিকে দিল্লী থেকে বড়লাট বাহাদুর বলছেন, এবার ভারতবর্ষকে সচেতন হতে হবে আত্মরক্ষার জন্য। সরকার আশা করেন, দেশের চিন্তাশীল যাঁরা তাঁরা বৃটেনের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগের কথা ভুলে গিয়ে দেশের জনসাধারণকে উদবুদ্ধ করবেন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে, দুয়ারে হানা দিতে উদ্যত শত্রু জাপানের সঙ্গে লড়াই করতে হবে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণীকে।

হাঁটুটা টন্‌টন্‌ করছে, বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ব্যথা, তবু প্রদীপ না হেসে পারল না।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বোধ হয় প্রদীপের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, এসো প্রদীপ, তোমার এত দেরী হ'ল যে ?

সংক্ষেপে প্রদীপ বলল তার অভিজ্ঞতার কথা।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল যেন। বললেন, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতেই হবে তোমাকে। এক হিসেবে ভালই হ'ল প্রদীপ, এবার তুমি আরও গভীরভাবে বুঝবে কিসের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ, মরণ-পণ করা অভিযান।

—আপনি ভুল বুঝছেন, এই সামান্য আঘাতটুকু না পেলেও যে পথ বেছে নিয়েছি, তা থেকে বিচ্যুত হতাম না আমি।

—সে আমি জানি, প্রদীপ। তোমার মত ছেলেরাই ত আমাদের দেশের আশা-ভরসা, আমাদের গৌরব। মেদিনীপুরে যাবার জন্য তুমি তৈরী হ'য়ে এসেছ ত ?

—নইলে আপনার কাছে আসব কেন জ্যোতির্ম্ময় বাবু ?

—বেশ, বেশ। আমারও খুব ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে চলে যাই, কিন্তু এখানে আমার অসংখ্য কাজ, এদিককার সমস্ত ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে যে !

—সে আমি জানি। গাঢ় ভাবে প্রদীপ জবাব দিল।

অনেকটা যেন আত্মগত ভাবেই জ্যোতির্ম্ময় বাবু বললেন, তাছাড়া আমাদের [illegible] হয়েছে, আমরা পিছন থেকে তোমাদের সাহস দিতে পারি মাত্র, পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিতে পারি। কিন্তু পথে চলতে হবে তোমাদের বুক ফুলিয়ে, [illegible] বাধা-বিপত্তিকে উপহাস ক'রে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি জয়যুক্ত হবে, আর দেশের সমস্ত নর-নারীর আশীর্ব্বাদে গরীয়ান্ হয়ে উঠবে তোমাদের অভিযান।

প্রদীপ মাথা হেঁট ক'রে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পদধূলি গ্রহণ করল।

এবার একটু চিন্তিত ভাবে জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রশ্ন করলেন, তোমার বিশেষ চোট লাগেনি ত ? পরশু মেদিনীপুরে যেতে পারবে ? না, আর কাউকে পাঠাব ?

—পাগল হয়েছেন ? এই একটু আঘাতের জের সাম্লাতে পারব না

আমি? আমাকে নির্ব্বাচন ক'রে আপনি আমার প্রতি যে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন, তার অমর্য্যাদা হ'তে দেব না, এটা আপনি স্থির জেনে রাখুন। দৃঢ়-ভাবে প্রদীপ বলল।

তার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠল শৃঙ্খলমুক্ত দেশমাতৃকার ছবি। দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন সে নিজেই উদ্বেলিত হয়ে উঠবে মুক্তির আনন্দে। শুধু তার কেন, আনন্দের স্পর্শ পৌঁছবে ছোট বড় প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে। এই আনন্দ জোগাবে কর্ম্মশক্তির প্রেরণা, দূর করবে দুঃখ, দারিদ্র্য, অবসাদ। স্বাধীন ভারতে যারা সুস্থ, যারা সবল তাদের জন্য রাষ্ট্র জোগাবে কাজ, আর যারা অসুস্থ, পঙ্গু, তাদের জন্য জোগাবে আশ্রয়। হয়ত একদিনে, এক সপ্তাহে, এক বছরে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠবে না; কিন্তু ক্ষমতা যখন আসবে দেশের লোকের হাতের মুঠোয়, যথা এই জ্যোতির্ম্ময় বাবুর, তখন সবাই অনন্যমনা হয়ে নিজেদের নিয়োগ করবে জনসাধারণের কল্যাণে।

—কি ভাবছ প্রদীপ? জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রশ্ন করলেন।

—না, কিছু ভাবছি না ত! সুপ্তোত্থিতের মত প্রদীপ জবাব দিল। তার-পর প্রশ্ন করল, সুমিত্রা বাড়ীতে আছে কি?

—সুমিত্রা?—না, বোধ হয় বেরিয়ে গেছে।—নিস্পৃহ ভাবে জ্যোতির্ম্ময় বাবু জবাব দিলেন।

সুমিত্রা জ্যোতির্ম্ময় বাবুর একমাত্র কন্যা, তাঁর চোখের মণি বললেও চলে। সুমিত্রা যে প্রদীপের প্রতি খানিকটা আসক্ত সে সংবাদ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু প্রদীপকে ভাবী জামাতারূপে গ্রহণ করতে তাঁর মন আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

সুমিত্রার প্রতি প্রদীপেরও বিশেষ কোন অনুরাগ ছিল না, তবে সে জানত যে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কাছে এসে যদি তার কোনই খোঁজ না নেয় তবে অনু-যোগের তীক্ষ্ণ বাণে তাকে জর্জ্জরিত হ'তে হবে। সুমিত্রা বাড়ীতে নেই জেনে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে আবার প্রণাম করে প্রদীপ বেরিয়ে এল।

প্রদীপ চলে যেতেই ঘরে ঢুকলেন কয়েক জন বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা। প্রতি সন্ধ্যায় এঁরা মিলিত হ'ন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বৈঠকখানায়। চার দিকের নবতম পরিস্থিতির সংবাদ দেন তাঁকে, আর স্থির করেন ভবিষ্যতের কর্ম্মসূচী।

—ঐ ছেলেটাকেই বুঝি আপনি মেদিনীপুরে পাঠাচ্ছেন? একজন প্রশ্ন করলেন।

—প্রদীপের কথা জিজ্ঞাসা করছ? হ্যাঁ, ওকেই পাঠানো স্থির করেছি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, ভরসা পাচ্ছি না। ছেলেটি আদর্শবাদী সন্দেহ নেই, কিন্তু অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা, যা আমাদের এই কাজের সাফল্যের জন্য নিতান্ত অপরিহার্য্য, তা' ওর মধ্যে তেমন দেখতে পাচ্ছি না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে আমাকে ক'রে তোলে উদ্ব্যস্ত। তবু ত আজ দেখলাম অনেকখানি সংযত, সংহত। হয়ত পুলিশের লাঠির সাময়িক প্রতিক্রিয়া, কিন্তু উপযুক্ত লোকই বা পাই কোথায়? ওর একটা বিশেষ গুণ এই যে, কোন কাজের দায়িত্ব একবার গ্রহণ করলে শেষ পর্য্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে তা সফল করবে।

—আপনি কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন, জ্যোতির্ম্ময় বাবু! সরকার বাহাদুর এবার যেন কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন মনে হচ্ছে। আরেকজন বললেন।

একটু হেসে জ্যোতির্ম্ময় বাবু জবাব দিলেন, জেলখানায় অতিথি হ'বার কথা বলছেন ত? তার জন্য তৈরী হয়েই আছি। তা' ছাড়া ঐ তিলকটা পরা নিতান্তই দরকার, নইলে লোকে আমাদের মানবে কেন? আপনারাও তৈরী থাকবেন, যদি রঙ্গমঞ্চের পুরোভাগে থাকতে চান।

জ্যোতির্ম্ময়বাবুর আত্মত্যাগের কাহিনী কে না জানে? নিজে হাতে চরকায় কাটা সূতোয় তৈরী ধুতি-পাঞ্জাবী ছাড়া আর কোন প্রকার পরিচ্ছদ তিনি পরেন না, সেই য়ুনিভার্সিটি বয়কট করা অবধি। স্বল্পাহারী, কোন প্রকার বিলাসিতা নেই, এমন কি সিগারেটটি পর্য্যন্ত খান না। দেশই তাঁর প্রাণ, কংগ্রেসের তহবিলে তিনি দান করে যাচ্ছেন আইন ব্যবসায়ে তাঁর উপার্জ্জনের মোটা একটা অংশ। বিপত্নীক, আছে এক মাত্র মেয়ে সুমিত্রা।

বাইরের ঝড়-ঝাপটার সংঘাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন যথাসাধ্য, কারণ তিনি মনে করেন দেশের সাধারণ তরুণ-তরুণীর জন্য নির্ব্বাচিত যে পথ তা সুমিত্রার পথ নয়। সুমিত্রা অসাধারণ, সাধারণের পর্য্যায়ে তিনি তাকে কিছুতেই নিয়ে আসতে পারেন না।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে প্রদীপ সোজা হাঁটতে সুরু করল লেক রোডের অভিমুখে। হাঁটুটা আরও যেন বেশী টন-টন করছে, বুকের ব্যথাটাও বাড়ছে, কিন্তু মেদিনীপুরে যাবার আগে বন্দনার সঙ্গে দেখা করা দরকার, নিতান্তই নিজের প্রয়োজনে।

—তুমি আজ আসবে আমি জানতাম। বন্দনা বলল।

—তাই না কি? তোমার দিব্যচক্ষু লাভ হয়েছে দেখছি। পরিহাসের সুরে প্রদীপ বলল।

—বাবার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর প্রায়ই দেখা হয়। তিনিই বলছিলেন তুমি মেদিনীপুরে যাচ্ছ দু'একদিনের মধ্যেই। জ্যোতির্ম্ময় বাবু তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।

—কিন্তু তোমার বাবার সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এত সম্প্রীতি কি করে গড়ে উঠল? আমার ত ধারণা, তাঁরা দু'জন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের মানুষ।

—বাঃ, তুমি বুঝি জান না! বাবা জ্যোতির্ম্ময় বাবুদের ফাণ্ডে নিয়মিত ভাবে চাঁদা দিয়ে আসছেন। কংগ্রেসের খাতায় লেখা সভ্য না হলেও বাবা কংগ্রেসের মতবাদের সমর্থক চিরকালই।

সংবাদটা শুনে প্রদীপ খুসী হতে পারল না। ধনী ব্যবসায়ী অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের মতবাদের সমর্থক? জিনিষটা কেমন যেন একটু অসঙ্গত ঠেকছে না?

বন্দনা বোধ হয় প্রদীপের মনের গতি বুঝতে পারল।—তোমার মনটা বড্ড একরোখা, প্রদীপ! সব জিনিষই তুমি বিচার করতে চাও তোমার নির্দিষ্ট

মাপকাঠিতে? কেন, যাদের পয়সা আছে তারা বুঝি দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারে না? বাবা উপায় করেন যথেষ্ট, কিন্তু তার তুলনায় তাঁর দান-ধ্যানও কম নয়।

প্রদীপ তার বিরক্তি গোপন করে গেল, কারণ এই মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলো সে নষ্ট করে দেবে না অবান্তর অপ্রয়োজনীয় সংলাপে।

বন্দনা প্রশ্ন করল, এখন কাজের কথা বল, কবে যাচ্ছ?

—বোধ হয় পরশু।

—কবে ফিরবে?

—সেটা ত আমার হাতে নয়। আমার প্রভুরা যদি সদয় হ'ন তাহ'লে না-ও ফিরতে পারি।

—অলক্ষুণে কথা ব'লো না প্রদীপ! বন্দনার চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

—একে অলক্ষণ বলছ কেন বন্দনা? এ যে আমাদের পরম পুরস্কার।

—তা হোক, তবু—

—তবু আমাকে ফিরে আসতে হবে, এই ত? প্রদীপের চোখে পরিহাসের আভাস।

—হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে বন্দনা জবাব দিল।

এবার প্রদীপ বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি জানি, তুমি একান্ত ভাবে চাও আমি ফিরে আসি তোমার বাহুবন্ধনে। কিন্তু সে সব আলোচনা করবার সময় এটা নয়। আমাকে যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা সুসম্পন্ন করাই এখন আমার প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য যদি সুষ্ঠু ভাবে ক'রে আসতে পারি তখন ভাববার অনেক সময় পাব, কার বন্ধনে ধরা দেব।

—তুমি আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখছ না।

—হয়ত দেখছি না। দেখছি না স্বেচ্ছায়, কারণ তোমার দিকটা ভাবতে সুরু করলে আমার এদিকের কাজের কথা ভুলে যাব।

—তুমি সত্যি হৃদয়হীন।

—আমাকে এখন খানিকটা হৃদয়হীন হতে হবে, বন্দনা! শুধু আমাকে নয়, আমার মত আর সবাইকেও। ভুলে যেয়ো না এটাও একটা যুদ্ধ—যুদ্ধে কঠোর হতে হয়, এমন কি নৃশংসও। নইলে যুদ্ধে জেতা যায় না।

—তর্কে আমি তোমার সঙ্গে কোন দিনই পেরে উঠব না। কাতর কণ্ঠে বন্দনা বলল!

—হার যখন মেনেছ তখন আমিও একটু উদার হতে প্রস্তুত আছি। কথা দিচ্ছি, প্রভুরা যদি আমার গতিবিধির উপর কোন বাধা সৃষ্টি না করেন, তাহ'লে সোজা চলে আসব তোমার কাছে, তুমিই হবে আমার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স। প্রথম রিপোর্টটা পাবে তুমি!

প্রদীপের কথার ভঙ্গীতে বন্দনা হেসে উঠল।

দুই

অটলবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যখন কলকাতায় আসেন তখন তিনি ছিলেন নিঃস্ব, কপর্দ্দকশূন্য। এসেছিলেন নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে, কিন্তু দেখলেন ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করতে হ'লে অমানুষিক পরিশ্রম এবং সাধনার প্রয়োজন।

প্রথমে একটু দমে গিয়েছিলেন, কিন্তু বছর খানেকের মধ্যেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি মোটামুটি স্থির ক'রে নিলেন। সুরু করলেন কাপড়ের ব্যবসায়, কাপড় ফিরি ক'রে দুপুরের রোদে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে সঞ্চয় করলেন কিছু মূলধন। তাঁর সততা এবং কৃচ্ছ্রশক্তি দেখে একজন গুজরাটী ব্যবসায়ী তাঁকে দিতে লাগলেন অগ্রিম কাঁচা মাল। কিছুদিন পরে শ্যামবাজারেই ছোট্ট একটি কাপড়ের দোকান খুললেন অটলবিহারী।

এর পর ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল দ্রুতগতিতে। কয়েক বছরের মধ্যেই শ্যামবাজার অঞ্চলে তিনি একখানা বাড়ীও কিনে ফেললেন। তারপর পাণি-গ্রহণ করলেন এক ধনী কণ্ট্রাক্টার-দুহিতার।

কিছুকাল পরে স্ত্রী সৌদামিনী মারা গেলেন। রেখে গেলেন আঠার বছরের ছেলে নবকিশোর এবং ষোল বছরের মেয়ে বন্দনাকে।

বন্ধু-বান্ধব, এমন কি তাঁর শ্বশুরমশায়ও, তাঁকে উপদেশ দিলেন আবার বিয়ে করতে, কিন্তু অটলবিহারী রাজী হলেন না। বললেন, গৃহিণীর সৌভাগ্য আমার কপালে নেই, মিথ্যা মরীচিকার পেছনে আমি ছুটব না। আজ পর্য্যন্ত অটলবিহারী অটল হয়েই রয়েছেন।

নিজের সমস্ত শক্তি এবং সাধনা তিনি নিয়োগ করলেন অর্থোপার্জনে। যে সততা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল শ্রীবৃদ্ধির প্রথম সোপানে, তা' পরিত্যাগ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ তিনি করলেন না, যখন তিনি দেখলেন যে লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করতে হলে সততার পথই সবচেয়ে সহজ পথ নয়। নিজেরই অজ্ঞাতে তিনি হয়ে উঠলেন নৃশংস, অর্থের নির্ব্যক্তিক পূজা তাঁকে অন্ধ ক'রে তুলল, পৃথিবীর কমনীয়তার রূপ তিনি ভুলে যেতে সুরু করলেন।

তারপর যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই অটলবিহারী তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্যে অনুভব করলেন যে, শীগগিরই দেশে দেখা দেবে বস্ত্র এবং অন্নসঙ্কট। তাই দাম যখন বেশ সস্তা সেই সময় তিনি কিনে রাখলেন অজস্র কাপড়।

যা' তিনি আশা করেছিলেন অবশেষে তাই ঘটল। বিশ্বব্যাপী দাবানল যখন জ্বলে উঠল, তার উত্তাপ ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছল। উল্লসিত হয়ে উঠলেন অটলবিহারী।

ওদিকে কংগ্রেসের সঙ্গেও সরকারের বিরাট যুদ্ধ চলেছে। জনমতকে জিজ্ঞাসা না ক'রে ভারতবর্ষকে প্রতিদ্বন্দ্বীদের দলে টেনে আনা হয়েছে বলে মহাত্মা গান্ধী জানিয়েছেন তাঁর তীব্র প্রতিবাদ। জাপানীদের অগ্রগতি সম্বন্ধে বলেছেন, ওদের যদি প্রতিরোধ করতে হয় তাহ'লে ভারতের প্রত্যেকটি নর-নারীকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে দেশকে বাঁচাবার ঐকান্তিক আগ্রহে। এই আগ্রহ কিছুতেই আসবে না, যত দিন দেশ পরাধীন থাকবে, যত দিন ভারতীয় সৈনিককে যুদ্ধ করতে হবে বৃটিশ এবং আমেরিকান সৈনিকের অনুসারীরূপে, তাদের সতীর্থ ভাবে নয়।

অটলবিহারী যদিও জানেন, কংগ্রেসের এই বিদ্রোহ দমন করতে সরকারকে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না, তবু মাঝে মাঝে তাঁরও মনে হয় গান্ধীজি যা' বলছেন তা হয়ত নিতান্ত মিথ্যা নয়। খবরের কাগজে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবগুলো তিনি আত্যন্ত পড়েন, বন্দনাকেও পড়ে শোনান, আর বলেন, তোমার কি মনে হয় বন্দনা? মহাত্মার এই কথাগুলোর মধ্যে খানিকটা লজিক আছে বই কি!

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সঙ্গে তাঁর আলাপ বেশ কয়েক বছর যাবৎ। তাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু শ্রদ্ধার চেয়েও বেশী করেন সমীহ।

অটলবিহারী যে কংগ্রেসের ফাণ্ডে চাঁদা দিতে সুরু করেছিলেন তা'ও এই জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সংস্পর্শে এসে। জ্যোতির্ম্ময় বাবু অবশ্য কোন অনুরোধ করেন নি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা ভাবভঙ্গী দেখে অটলবিহারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি তিনি উপার্জ্জিত অর্থের খানিকটা দেশের কাজে দান করেন তাহলে নিতান্ত অপাংক্তেয় হয়ে থাক্‌বেন না। তাছাড়া বুদ্ধিমান্ অটললিহারী বুঝতে পেরেছিলেন যে, যদি কংগ্রেস কোন দিন রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষমতা লাভ করে তাহ'লে তাঁর এই ত্যাগ দেশের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই ভুলবেন না!

অটলবিহারী এবং জ্যোতির্ম্ময়ের পরস্পরের পরিচয়টা আরও একটু নিবিড় হয়ে উঠেছিল তাঁদের দুই কন্যার অনুগ্রহে। বন্দনা এবং সুমিত্রা এক কলেজে পড়ত।

অটলবিহারী সেদিন বাড়ীতে ফিরলেন বেশ চিন্তাকুল চিত্তে। নিজের ভাবনা নিয়ে এতই বিব্রত ছিলেন যে, বন্দনার চোখের কোণের বিষাদ প্রথমে তাঁর নজরেই আসেনি। নবকিশোরকে বললেন, নবু, আমাদের টেলিফোন্‌টা ঠিক আছে ত?

—হ্যাঁ, ঠিক আছে বই কি! কিন্তু কেন, বাবা?

—দিন-কাল মোটেই ভাল নয়, নবু! জ্যোতির্ম্ময়ের ওখান থেকে এলাম। ওরা ত মরীয়া হয়ে উঠেছে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে লড়বার জন্য। আর গভর্ণমেণ্টও তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কংগ্রেসকে এমন শিক্ষা দেবে যে জীবনে তারা আর ভুলতে পারবে না। তারপর, জান ত, বাংলার মসনদে কারা রাজত্ব করছেন। কখন কি হয় বলা যায় না! আমি ত ডেপুটি কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করেছি আমার টেলিফোনটাকে যেন "প্রায়রিটি" দেওয়া হয়, ওঁকে সেদিন প্রায় কুড়ি জোড়া শাড়ী দিয়ে এসেছি।

নবকিশোর যেন একটু শক খেল। বলল, তুমি ডেপুটি কমিশনারকে ঘুষ দিলে বাবা? আর উনি সেটা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করলেন?

—তুমি এ-সব বুঝবে না, নবকিশোর! বিপদে পড়লে এর চেয়ে অনেক বেশী কিছু করতে হয়? আর তা ছাড়া উনি ত ঠিক ঐভাবে গ্রহণ করেননি, বাজারে স্থায্য দামে কাপড়-চোপড় পাওয়া যাচ্ছে না, আমি আমার লাভটা না রেখে পাইকারী দামে ওঁকে দিলাম। এর মধ্যে অন্যায় কি আছে?

—টাকাটা তিনি দিয়েছেন আশা করি? নবকিশোর বললে।

—দেননি, দেবেন। কাজের মানুষ, যদি ভুলেও বা যান, আমি কি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারি? আর, এই সামান্য কয়টা টাকা না পেলে আমারই কি প্রকাণ্ড একটা ক্ষতি হয়ে যাবে, নবু?

নবকিশোরের চোখে জিনিসটা ভাল লাগল না, কিন্তু সংসারের হালচাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অতি অল্প, সে চুপ ক'রে রইল।

—বন্দনা কোথায় রে? অটলবিহারী প্রশ্ন করলেন।

—একটু আগে সে ত এখানেই ছিল, তুমি তাকে ডাকনি, বোধ হয় ভেতরে চলে গেছে।

—দেখ, দেখ অভিমানী মেয়ের কাণ্ড!—শশব্যস্তে অটলবিহারী বললেন, এক দণ্ড অন্যমনস্ক হ'বার জো নেই। বন্দনা, ও বন্দনা!

বন্দনা এল।

—ডাকছ বাবা?···তোমার জন্যে জলখাবার আনতে গিয়েছিলাম।

—আজ আর জলখাবার খাব না, মা! ক্ষিদে মোটেই নেই, তাছাড়া মনটাও ভাল নেই।

বন্দনা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করল, কি হবে, বাবা?

সুপ্তোত্থিতের মত অটলবিহারী বললেন, অ্যাঁ, কিসের কি হবে রে?

—এই যে চার দিকে শুনছি মহাত্মা গান্ধী বলছেন, এই তাঁর শেষ যুদ্ধ। দেশকে স্বাধীন করবেন, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রমে ফিরবেন না। সত্যি কি দেশ স্বাধীন হবে, বাবা?

—দেশ স্বাধীন হওয়া কি এত সোজা পাগলী? ইতিহাসে পড়িসনি ইটালী, গ্রীস, হাঙ্গারী কি করে স্বাধীন হয়েছিল? আমরা মনে করি, খুব খানিকটা

চেঁচালে, বক্তৃতা করলেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভয় খেয়ে আমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেবেন! ছোঃ।

—কিন্তু তুমিও কি চাও না, বাবা, যে দেশ স্বাধীন হয়?

—চাই ত নিশ্চয়ই, কে না চায়? কিন্তু এই কি চাইবার সময়? যত দিন জাপানীরা আমাদের দেশের সীমান্তে আসেনি তত দিন কংগ্রেস তার দাবী জানিয়েছে, তার মধ্যে একটা যুক্তি একটা সঙ্গতি ছিল। কিন্তু এখন? এখন বৃটিশরা যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যায় তাহ'লে রক্তের গঙ্গা বইতে সুরু করবে যে।

—কেন, আমরা জাপানীদের সঙ্গে লড়ব। তাছাড়া ওদের ঝগড়া হচ্ছে বৃটিশদের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে নয়। বৃটিশরা চলে গেলে ওরা আমাদের আক্রমণ করবে কেন? নবকিশোর বলল।

—তোমরা জাপানীদের চেন না, নবু। আমি ওদের সঙ্গে ব্যবসা করেছি, ওদের জানি খুবই ভাল ভাবে। আমাদের ওরা বন্ধু মনে করে না, যদিও আমরা এসিয়ান। চীন দেশে ওরা কি করছে দেখছ না?

—তাহ'লে তোমার মতে কংগ্রেসের উচিত কোন রকম আন্দোলন না করে চুপচাপ থাকা? নবকিশোর প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়। আমি একথা বলছি না, মহাত্মা গান্ধী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তাঁর আত্মসম্মানে যদি বাধে, অন্ততঃ চুপ করে থাকলেও ত পারেন এই কয়টা বছর। যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ত পালিয়ে গেল না? বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গেই অটলবিহারী বললেন।

—আমরা কিন্তু তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পারলাম না, বাবা!—বন্দনা এবং নবকিশোর একসঙ্গে বলে উঠল।—কংগ্রেস যদি এখন চুপ করে থাকে তাহ'লে দেশের লোক মনে করবে কংগ্রেস মরে গেছে। লোকের বুকে স্বাধীনতার আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে না? তুমি দেখছ না, প্রতি বছর এই সংগ্রাম কত তীব্র, কত ব্যাপক হয়ে উঠেছে? আজ যদি কংগ্রেস চুপ

করে থাকে তাহলে দেশ ভুলে যাবে নেতাদের বাণী, মনে করবে ভয় ঢুকেছে তাঁদের মনে।

—না, না, লোকে এত সহজে ভুলে যায় না রে! তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, বৃটিশ সরকার আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কংগ্রেস যদি বিদ্রোহের আগুন জ্বালে, তাহলে নির্ম্মম ভাবে দমন করবে তা'। তাতে ক্ষতি হবে দেশের জনসাধারণেরই, বৃটিশদের নয়।

—এই তর্কের আর শেষ নাই, বাবা!—বন্দনা বলল।—তার চেয়ে কাজের কথা বল। কাকাবাবু কি বললেন? (জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে বন্দনা এবং নবকিশোর কাকাবাবু বলে সম্বোধন করে।)

—কী আর বলবেন, তোমরা যা বলছ তারই পুনরুক্তি করলেন। এঁরা যে দেশে তরুণদের মৃত্যুর সম্মুখে এগিয়ে দিচ্ছেন, এ কি কোন দিক থেকেই কল্যাণকর হবে?

—মৃত্যু! সে কি বাবা? আর্ত্তস্বরে বন্দনা বলে উঠল।

—খুবই সোজা কথা, মা! এঁরা করবেন বিদ্রোহ, আর সরকার চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবেন তা? এবার লাঠিচালানো এবং কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারেই ক্ষান্ত হবে না, এবার রীতিমত মিলিটারি বাহিনী দিয়ে এই সব প্রগলভতা চূর্ণ করে দেওয়া হবে। ভেতরের খবর আমি একটু-আধটু জানি রে!

স্থাণুর মত বসে রইল বন্দনা। এখন সে বুঝতে পারল, কী বিপদের সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছে প্রদীপ।

মেসে ফিরে গিয়ে প্রদীপ তার সামান্য পুঁজিপাতি গুছিয়ে রাখল ছোট্টো একটা স্যুটকেস-এ। তারপর রুমমেটকে বলল, এই বাক্সটা যেন তার হেফাজতে রেখে দেয়, সে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত। কোথায় সে যাচ্ছে তা বলল না, শুধু বলল যে কিছুদিনের জন্যে দেশে ঘুরে আসছে।

মনে মনে সে হাসল, যখন দেখল ভদ্রলোক একটিও প্রশ্ন করলেন না তাকে।

চারি পাশের বন্ধন থেকে মুক্তি নিতে হবে তাকে, যাত্রার প্রারম্ভে। অনন্যমনা হয়ে তাকে চলতে হবে নির্ব্বাচিত পথে। কিন্তু তবু সে কেন নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দিতে পারছে না এই যজ্ঞাহুতিতে? কোন দুর্বহ চিন্তা তাকে করে তোলে ভারাক্রান্ত, বিচ্ছিন্ন ক'রে আনে সাধারণের গণ্ডী থেকে? সে যে অসাধারণ নয় তা বেশ ভাল ভাবেই জানে, তবু নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখবার কেন এই ব্যর্থ প্রয়াস?

তার মনে পড়ে, বাইশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিবৃত্ত। শৈশবেই সে হারিয়েছে তার বাবা মা দু'জনকেই, মানুষ হয়েছে (একে যদি মানুষ হওয়া বলা যেতে পারে) তার মামার বাড়ীতে। কোন ভাই-বোন তার ছিল না, সে আশা করেছিল তার মামা এবং মামীমার স্নেহ তার উপর বর্ষিত হবে, অকাতরে না হলেও, অকুণ্ঠায়। কিন্তু তার আশা ব্যর্থ হয়েছিল।

স্কুল শেষ করে সে এল কলেজে, সায়েন্স পড়তে। মামা বললেন, চাকুরীর চেষ্টা কর, কিন্তু প্রদীপ রাজী হল না। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মামা তার কলেজের খরচ বহন করতে সুরু করলেন।

সংঘর্ষ বাধল বি, এস, সি পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রদীপ যখন মামাকে জানাল পরীক্ষা সে দেবে না। দেশের যা পরিস্থিতি, তাতে অন্ধভাবে সরকারের বিদ্যাশালা আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনই মানে হয় না, এই যুক্তি সে দিল।

মামা প্রথমে প্রদীপকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, বি, এস, সি পরীক্ষাটা অন্ততঃ তার দেওয়া উচিত, তারপর সে যা খুসী তা করতে পারে। অন্যথায়, মামা প্রস্তাব করলেন, সে একটা চাকুরী যেন নেয়, যুদ্ধের বাজারে চাকুরীর অভাব হবে না।

একগুঁয়ে প্রদীপ এর কোনটাতেই রাজী হ'ল না, মামা বিরক্ত হয়ে মাসোহারা বন্ধ করলেন।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সংস্পর্শে এসেছিল প্রদীপ, তাঁরই কথার বাঁধুনীর জালে জড়িয়ে পড়েছিল সে। মাসোহারা বন্ধ করবার খবর শুনে তিনি বললেন, তুমি এতটুকু ভেবো না প্রদীপ। কলেজের খরচ যদি চালাতে না হয় তাহ'লে তোমার সামান্য প্রয়োজন আমরা অনায়াসে মেটাতে পারব, আমাদের ফাণ্ড থেকে। কংগ্রেসের একটা দায়িত্ববোধ আছে, কর্ম্মীদের উপোসী থাকতে দেয় না। তাছাড়া, প্রয়োজন হ'লে তুমি একটা টুইশনিও ত করতে পারবে।

কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্ম্মিরূপে প্রদীপের জীবনের সুরু এই ভাবে। প্রথমে সে ঝাঁপ দিয়েছিল খানিকটা ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু ধীরে ধীরে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এঁদের উদাত্ত আদর্শ তার শরীরের প্রতিটি অণুকণায় সঞ্চার করল অননুভূতপূর্ব্ব এক পুলক, উপলব্ধি করতে লাগল নতুন এক জীবনের আস্বাদ। তারপর জাপানের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধী যখন আয়োজন করলেন দেশব্যাপী এক অভিযানের, তখন প্রদীপ এসে জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে জানাল যে, সম্মুখ সমরে সে যেতে চায়। বলা বাহুল্য, জ্যোতির্ম্ময় বাবু তার এই উপচার গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর গৃহে যাতায়াতের ফলে তার পরিচয় হয়েছিল সুমিত্রার, এবং তাদেরই মাধ্যমে অটলবিহারীবাবুদের সঙ্গে। অষ্টাদশী সুমিত্রা এবং বন্দনা উভয়েই প্রদীপকে ভালবেসে ফেলল। প্রদীপের আন্তরিকতা আর ভাবালুতা, উভয়কেই করল আকৃষ্ট।

দু'জনের মধ্যে সুমিত্রা যদিও বেশী সুরূপা এবং সুমিত্রার পরিবেষ্টনীর সঙ্গে প্রদীপের মনের মিল ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক, প্রদীপ কিন্তু সুমিত্রার পরিবর্ত্তে বন্দনাকেই দিল প্রাধান্য। সুমিত্রার অহমিকা, আর দম্ভ প্রদীপকে করল প্রতিহত। পক্ষান্তরে, বন্দনার মধ্যে সে খুঁজে পেল একটা স্নিগ্ধ শীতল স্নেহ, একটা কমনীয়তা, যা তার মনের বৃহৎ একটা অভাবকে পূর্ণ করতে সাহায্য করল।

প্রদীপ অবশ্য বন্দনাকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পারেনি। বাইরের মাধুর্য্যের অভ্যন্তরে যে কঠোর একটা দৃঢ়তা লুকানো আছে, তার পরিচয় সে পেয়েছিল অনেক পরে।

প্রদীপের এই বাইশ বছরের জীবনের উপর আর একটি মেয়ের প্রভাব এসে পড়েছিল, সে হচ্ছে মিঃ সুপ্রকাশ কর, আই-সি-এস-এর গৃহিণী গায়ত্রী।

তিন

গায়ত্রীর সঙ্গে প্রদীপের পরিচয়ের একটা ইতিহাস আছে।

মিঃ সুপ্রকাশ কর যখন নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন পল্লী-উন্নয়নের কাজে তিনি সপরিবারের গিয়েছিলেন কমলপুর গ্রামে। প্রদীপও সেখানে উপস্থিত ছিল কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্ম্মী হিসাবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্য বিরাট আয়োজন করা হয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং স্থানীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ উপস্থিত ত ছিলেনই, আর ছিল কমলপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সভ্যবৃন্দ এবং গ্রামরক্ষীর দল। তাছাড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও আসছেন, এবং তিনি পুরস্কার বিতরণ করবেন, এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল কমলপুরের সীমানা অতিক্রম করে। ফলে প্রায় হাজারখানেক লোক সমবেত হয়েছিল স্কুলের খেলার মাঠে।

উদ্বোধন সঙ্গীত, সভাপতি নির্ব্বাচন এবং ইউনিয়ন বোর্ড-প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক সাদর অভিনন্দনের পালা শেষ হবার পর মিঃ কর সুরু করলেন তাঁর ভাষণ। বলতে বলতে বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তীব্র কণ্ঠে করলেন আক্রমণ কংগ্রেসী ভলাণ্টিয়ারদের গুণ্ডামিকে এবং জানিয়ে দিলেন যে তিনি যত দিন জেলার অধিকর্ত্তা আছেন তত দিন কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না এই প্রকার অরাজকতা।

জনতার মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠল, ওরে বাবা, এ যে লিন্‌লিথ ষাঁড়ের চেয়েও বেশী গর্জ্জন করছে দেখি।

মিঃ কর তাঁর ভাষণ বন্ধ করলেন। উচ্চকণ্ঠে বললেন, এই রাজদ্রোহী কথা কে বললে? বেরিয়ে এসো, সাহস যদি থাকে তাহলে সামনে এসে কথা ব'লো।

জনতা নীরব। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হ'য়ে উঠ্‌লেন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর।

মিঃ কর ব'লে চল্‌লেন, যাদের এইটুকু সাহস নেই তারা আবার দেশ স্বাধীন করবার জন্যে লাফালাফি করে! সরকারের উচিত এরকম সৎসাহসী-দের প্রত্যেককে চাবকানো...

আর যাবে কোথায়? যে জনতা একটু আগেও নীরব ছিল তা' হয়ে উঠ্‌ল বিক্ষুব্ধ, ঢেউ-এর মত এগিয়ে এল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্চের সামনে। চৌকিদার এবং পুলিশ যে কয়জন উপস্থিত ছিল তারা শশব্যস্তে ঘিরে দাঁড়াল হাকিমবাহাদুরকে।

মিঃ কর একটু ভড়কে গিয়েছিলেন বই কি। তাঁর সঙ্গে যদিও রিভলভার ছিল তবু সেটা ব্যবহার করা যে আরো বড় মূর্খতার কাজ হবে, এই বুদ্ধি তাঁর লোপ পায়নি। তাছাড়া সঙ্গে আছে গায়ত্রী—এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয়। থরথর ক'রে কাঁপছিল সে।

এমন সময় জনতার মাঝখান থেকে বেরিয়ে এল প্রদীপ। চৌকিদার পুলিশের নিষেধ উপেক্ষা করে সোজা সে এসে দাঁড়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্চের পুরোভাগে:—আপনারা কিছু ভাববেন না, সব শান্ত হয়ে যাবে—মৃদুকণ্ঠে এই দু'টি কথা ব'লে সে তাকাল জনতার দিকে। বলল, আপনারা মহাত্মাজীর অহিংসবাণী ভুলে যাবেন না, আজ আমাদের হাকিম যদি অন্যায় কোন কথা ব'লেও থাকেন তার প্রত্যুত্তর তাঁকে আক্রমণ করা নয়, জবাব দিতে হবে অন্য পদ্ধতিতে। তাছাড়া আপনারা দেখছেন না, এখানে একজন মহিলা বসে আছেন; আপনাদের উচিত তাঁর সামনে সংযত হয়ে থাকা, অভদ্রোচিত কোন ব্যবহার না করা।

গায়ত্রী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছিল ময়লা খদ্দরের ফতুয়া পরা শ্রীহীন এই ছেলেটিকে। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে না? অস্ফুটকণ্ঠে তার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল একটি মাত্র শব্দ—প্রদীপ?

কোলাহলের মধ্যে গায়ত্রীর মুখের কথা মিঃ কর শুনতে পেলেন না, প্রদীপও বোধ হয় না।

ধীরে ধীরে জনতা শান্ত হয়ে এল, যারা সম্মুখে এগিয়ে এসেছিল,

গেল।

মিঃ কর তাঁর বক্তৃতা আর শেষ করলেন না। কোনপ্রকারে পুরস্কার বিতরণ পর্ব্ব সমাপন করে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হল।

ইন্‌স্‌পেক্‌শন বাংলোতে ফেরার পর গায়ত্রী তার স্বামীকে অনুরোধ জানাল যে ছেলেটি অসম্মানের হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছে তার খোঁজ করতেই হবে। মিঃ কর প্রথমে রাজী হন্‌নি। কিন্তু গায়ত্রীর মিনতি-ব্যাকুল মুখাখানার দিকে তাকিয়ে তিনি চৌকিদারকে পাঠালেন প্রদীপের সন্ধানে।

ঘণ্টাখানেক পরে চৌকিদারের সঙ্গে প্রদীপ এল। মিঃ কর এবং গায়ত্রী উভয়েই তাকে ডাকলেন বারান্দায়।

মিঃ করের প্রশ্নের উত্তরে বিনীত ভাবে সে জানাল যে কমলপুর তার জন্মভূমি নয়, সে থাকে কলকাতায়। বিশেষ কিছুই সে করে না, কলেজ ছাড়া আবধি। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে বলল যে কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্ম্মী সে। কমলপুরে এসেছে হপ্তা দু'য়েক হ'ল, কংগ্রেসেরই কাজে।

মিঃ কর আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে এই ছেলেটির সম্পর্ক আছে। প্রদীপের উত্তর শুনে তিনি বেশ একটু গম্ভীর হয়ে রইলেন।

ওদিকে গায়ত্রী প্রাদীপকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রে তাকে ভয়ানক ভাবে অপ্রস্তুত এবং লজ্জিত করে তুলল। নমস্কারান্তে প্রদীপ কোনপ্রকারে সেখান থেকে ছুটে পালাল।

বেশী দূর সে এগোয়নি, হঠাৎ শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে।—বাবু, ও বাবু, একটু দাঁড়ান। তাকিয়ে দেখে সেই চৌকিদার। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, আপনাকে মেমসাহেব ডাকছেন।

—আমাকে? কেন? সবিস্ময়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—জানিনে, বাবু, মেমসাহেবের হুকুম আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

—হুকুম ? মেমসাহেবকে বলো, তাঁর হুকুম তামিল করবার সময় আমার নেই। প্রদীপ রুখে দাঁড়াল।

কাতরকণ্ঠে চৌকিদার বলল, আপনি একবারটি আসুন বাবু, নইলে আমার চাকুরী যাবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট-গৃহিণীর এত প্রতাপ! প্রদীপ না হেসে পারল না। বলল, তোমার চাকুরী যায় এটা আমি চাই না। আচ্ছা, চলো।

মিঃ কর চলে গেছেন তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত এক ভোজন সভায়। ইন্সপেকশন বাংলোতে গায়ত্রী একা। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ এসে দাঁড়াল সেখানে।

—আমাকে আপনি ডেকেছিলেন ? বেশ অসহিষ্ণু ভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—ব'সো—আমাকে চিনতে পারছ না ? গায়ত্রী বলল।

চমকে উঠল প্রদীপ। কে এই মিসেস কর ? অন্ধকারে গায়ত্রীর মুখখানাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

—আমি ভোলানাথ বাবুর মেয়ে গায়ত্রী, জ্যেঠামশায়, নিস্তারণ বাবু, কেমন আছেন ?

মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত কুহেলিকা গেল কেটে। এই সেই গায়ত্রী, যার সাহচর্য্যে সে কাটিয়েছে তার শৈশব এবং কৈশোরের সোনালি দিনগুলো। বয়সে সে প্রদীপের চেয়ে মাত্র বছরখানেকের বড়, কিন্তু ব্যবহার করেছে তার অভিভাবিকার মত। তার অত্যাচার এবং শাসন নীরবে সহ্য করেছে প্রদীপ।

—আমি কি করে জানব আই-সি-এস এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। স্কুল ছাড়বার পরে চলে এসেছি কলকাতায়, তার পর দেশের, তোমার কোন খোঁজই করিনি।

—প্রয়োজন বোধ করোনি এই ত ?

—তা বলতে পার। সে যাক্, আবার যে আমাকে ডাকলে, এর জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না মিঃ করের কাছে ?

অসহিষ্ণু ভাবে গায়ত্রী জবাব দিল, সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না প্রদীপ। আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ পথে এলে কার বুদ্ধিতে?

—ওঃ, দশ বছর আগেকার কথা ভুলতে পারোনি বুঝি? এখন আমি তোমার নাগালের বাইরে, গায়ত্রী—

—নাম ধরে ডাকতে লজ্জা করে না? বয়সে আমি তোমার বড়, তাছাড়া আমার একটা মান-সম্মান আছে ত? দিদি ব'লে ডেকো।

—তথাস্তু। তুমি যে এখন মিসেস কর সেটা ভুলে গিয়েছিলাম, অপরাধ নিয়ো না।

—তুমি ঠিক আগেরই মত অবুঝ এবং অবাধ্য রয়েছ দেখছি। গায়ত্রীদি' বলতে বুঝি সঙ্কোচ হয়?

—সঙ্কোচ অসঙ্কোচের বালাই এখন আমার নেই। দেখলে না, তোমার কর্ত্তার প্রাণ রক্ষা করলাম নিজের সম্মান বিপন্ন ক'রে, তার পরিবর্ত্তে এতটুকু কৃতজ্ঞতাও মিলল না।

কাতর কণ্ঠে গায়ত্রী বলল, ওঁর হয়ে আমি ত তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি, সেটা কি যথেষ্ট নয়?

—না।...যাক সে কথা। এবার ব'লো কি জন্যে ডেকেছ? আমার হাতে এতটুকু সময় নেই। তাছাড়া বড়লোক, বিশেষ করে আই-সি-এস, ঘেঁষা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রদীপ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

—আর একটু বসো। কত দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, এই ভাবে যে দেখা হবে তা কে জানত? দেখা যখন হয়েই গেল তখন তোমার নিজের খবরগুলো দিয়ে যাও অন্তত। গায়ত্রীর কথার মধ্যে বেজে উঠল একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সুর।

—শোন, দিদি, তোমার এবং আমার পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের মাঝখানে গড়ে উঠেছে দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীর, যা' অতিক্রম করা আমাদের উভয়ের পক্ষেই দুঃসাধ্য।

—এখান থেকে তুমি কোথায় যাবে?

—জেনে কি লাভ হবে? দেখছ ত' আমি তোমাকে কোন প্রশ্নই করছি না!

—সেটা তোমার মহত্ব নয়, সেটা হচ্ছে তোমার দম্ভ, তোমার গভীর ঔদাসীন্য।

—হবে। সংক্ষেপে প্রদীপ জবাব দিল।

—নিজের কথা কিছুতেই বলবে না আমাকে?

প্রদীপ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, যখন তুমি কিছুতেই ছাড়বে না, তাহলে বলছি।—শীগ্‌গিরই আমি যাচ্ছি যুদ্ধে, মহাত্মাজীর আহ্বানে।

—যুদ্ধে? বল কি? কোথায় যাচ্ছ? বর্মায়?

—না, বর্মায় যাবার সময় হয়নি এখনও।—হেসে প্রদীপ বলল।—আমি যাচ্ছি এই বাংলা দেশেরই অখ্যাত এক জায়গায়।

—এখানে আবার কিসের যুদ্ধ? বিস্মিত ভাবে গায়িত্রী প্রশ্ন করল।

—এ যুদ্ধ হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তোমাদের বিরুদ্ধেও বলতে পার।

—তার মানে?

—কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, তবে মিঃ কর আমাদের প্রতিপক্ষ ত বটেই!

—এবার বুঝতে পারছি। তোমরা হচ্ছ বিপ্লবী, আবার সুরু করতে চাও তোমাদের শক্তি পরীক্ষা। কিন্তু কি লাভ হবে?

—লাভ লোকসানের চুলচেরা বিচার করে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না, দিদি অনেক সময় বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরতে হয় নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্যে। একটা কথা মিঃ করকে বলো, তাঁর বিচারশক্তি যেন তিনি হারিয়ে না ফেলেন, আজ কমলপুরে যা ঘটল তার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় অদূর ভবিষ্যতে।

—কিন্তু তুমি কি এর মধ্যে নিজেকে না জড়ালে পারতে না, প্রদীপ? এই কাজ করবার আরও কত লোক আছে। এতে তুমি কি নিতান্তই অপরিহার্য্য?

—সে অহমিকা আমার নেই।

—তবে?

—এর জবাব তুমি নিজেই জান। আজ আমার সময় নেই, চললাম।

—উনি শীগগিরই কলকাতায় বদলী হচ্ছেন, অর্ডারও এসে গেছে। আলিপুরে বাসা ঠিক হয়েছে, আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করো সেখানে।

—প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, দিদি! তবে ঠিকানাটা মনে রইল।

প্রদীপ চলে গেল।

মেদিনীপুরে যাবার প্রাকালে প্রদীপের কেবলই মনে হচ্ছিল গায়ত্রীর কথা। মিঃ কর বদলী হয়ে এসেছেন কলকাতায়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের স্পেসাল অফিসার-রূপে। প্রদীপ একবার তাঁর আলিপুরের বাংলোর পাশ দিয়ে ঘুরেও এসেছে, কিন্তু প্রবেশ করেনি।

সে স্থির করল গায়ত্রীকে একবার টেলিফোন করবে।

টেলিফোন ধরল গায়ত্রী নিজে।

—হ্যালো—

—আমি প্রদীপ কথা বলছি, গায়ত্রীদি'।

—প্রদীপ? দিদিকে এত দিনে মনে পড়ল?

—আমি কালই বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না। কিছু মনে ক'রো না।

—কোথায় যাচ্ছ? উৎকণ্ঠিত ভাবে গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

—সেটা বলতে পারব না। যথাসময়ে জানতে পাবে।

—একবার আসবে না?

—না, সময় নেই। টেলিফোনেই তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছি, হাজার হোক্ দিদি ব'লে স্বীকার করেছি ত! প্রদীপের কথায় উপহাসের সুর বেজে উঠল যেন।

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব সমস্ত বিপদ থেকে যেন তোমাকে রক্ষা করেন। গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

—চলি, দিদি।

টেলিফোনটার পাশে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গায়ত্রী। তার চেতনা হ'ল যখন অফিস থেকে ফিরলেন মিঃ কর।

—ও কি? তুমি অন্ধকারে বসে রয়েছ যে? মিঃ কর প্রশ্ন করলেন।

—কিছু না, শরীরটা ভাল বোধ করছি না। তোমার চা'টা আনতে বলছি বয়কে। পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে গেল গায়ত্রী।

চার

মেদিনীপুরের পথে রওনা হ'বার আগে প্রদীর আবার গেল জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কাছে, শেষ নির্দ্দেশগুলো জেনে নিতে।

সুস্থ এবং একান্ত মন নিয়েই যেতে পারবে আশা করেছিল। কিন্তু গোলমাল বাধাল সুমিত্র।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাবে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খুলে সুমিত্রা বাইরে এসে দাঁড়াল।

—আমাকে না ব'লেই চলে যাচ্ছ?—সুমিত্রা অভিযোগ করল।

একটু লজ্জিত হয়ে প্রদীপ জবাব দিল, আজ বড্ড তাড়াতাড়ি আছে, সুমিত্রা। তোমার বাবার কাছে কতকগুলো উপদেশ নিতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল—ভোরের ট্রেনেই মেদিনীপুরে ছুটতে হবে, কেন তা' ত তুমি জান।

—তাই ব'লে আমার সঙ্গে দুটো কথা বলবার সময়ও তোমার হয় না? আমার বাবার মেয়ে আমি, তোমার কর্ত্তব্যের পথে প্রতিবন্ধক আমি হ'ব না সেটা নিশ্চয়ই তুমি বোঝ। সুমিত্রার কণ্ঠে বেশ খানিকটা দম্ভ, আত্মপ্রত্যয়।

— তুমি তিলকে তাল ক'রে তুলছ। আচ্ছা, এসো, নীচে চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তর্ক করার কোনই মানে হয় না।

সুমিত্রা এবং প্রদীপ একতলার একটা ছোট ঘরে, যেখানে অভ্যাগতরা এসে বসেন, ঢুকল।

প্রদীপ একটা চেয়ারে বসল, কিন্তু সুমিত্রা দাঁড়িয়ে রইল।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো না? প্রদীপ অনুরোধ করল।

—বস্‌লেই আবার তোমার মূল্যবান্ সময় নষ্ট হবে। তাছাড়া বিশেষ কোন বক্তব্যও নেই। শুধু তোমাকে একবার দেখতে চেয়েছিলাম।

প্রদীপ অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করল। সে আর সব সহ্য করতে পারে, বরদাস্ত করতে পারে না এই প্রকার লুকোচুরি খেলা।

—আমাকে শুধু একবার দেখবার জন্তে তুমি আমাকে টেনে নিয়ে এলে এখানে? সিঁড়িতে দেখাটা যথেষ্ট হয়নি বুঝি?

সুমিত্রা আহত বোধ করল, কিন্তু সেটা গোপন ক'রে শান্তমুখে বলল, আমি তোমাকে এখানে টেনে নিয়ে আসিনি প্রদীপ, তুমিই বললে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন মানে হয় না!

কথাটা সত্য। প্রদীপ চুপ করে রইল। সুমিত্রাও নীরব। মিনিট পাঁচেক এইভাবে কাটবার পর প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। বলল, আশা করি আমাকে দেখা তোমার সম্পূর্ণ হয়েছে এতক্ষণে। আমার অসংখ্য কাজ আছে, আর সময় নষ্ট করতে পারব না, চললাম।

সুমিত্রা দরজার সাম্নে এসে দাঁড়াল। তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, উদ্দীপ্ত যৌবনের হাওয়া দিয়ে সে যেন প্রদীপকে ঘিরে রাখতে চাচ্ছে।

বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, প্রদীপ, মেয়েদের মধ্যে তোমরা কি দেখতে চাও। আমার ধারণা ছিল তোমরা একদিকে যেমন চাও নারীর সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য, অন্তদিকে চাও তার তেজ, বুদ্ধি এবং জ্ঞান। তোমার মত লোকে শুধু শয্যাসঙ্গিনী চায় না, চায় সহধর্ম্মিণী, একক্রিয়াসঙ্গিনী।

—আমি কি চাই না চাই সে সব চুলচেরা বিচার করবার অবসর আমার নেই, সুমিত্রা। ছাড়ো, পথ ছাড়ো। বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই প্রদীপ বলল।

সুমিত্রা সরে দাঁড়াল। লজ্জায়, অপমানে তার চোখের জলও যেন শুকিয়ে এল।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে প্রদীপ পৌঁছে গেছে। তার সঙ্গে আছে জন দশ-বারো বাছাই করা কর্ম্মী। জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলে দিয়েছেন, মহাত্মাজী শেষ বারের মত চেষ্টা করবেন বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝাতে যে দমননীতি অনুসরণ করে সরকার ভারতবর্ষের নর-নারীর সহায়তা পাবেন না।

মহাত্মাজীর এই শেষ প্রয়াস যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তিনি দেবেন সিগন্যাল, দেশব্যাপী অসহযোগের। এ বছরের অসহযোগ হবে আরও তীব্র, আরও ব্যাপক।

কিন্তু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ মহাত্মাজীর মিলল না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাব পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে করা হল গ্রেপ্তার।

মেদিনীপুরের অভ্যন্তরে দূর গণ্ডগ্রামে বসে প্রদীপ খবরগুলো শুনল কয়েক দিন বাদে, লোকপরম্পরায়। আরও শুনল যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ সুরু হয়ে গেছে—বিহারে, উত্তরপ্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তে, উড়িষ্যায়, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন জায়গায়, সুদূর গুজরাটে।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রদীপকে বলেছিলেন যে যদি সাত দিনের মধ্যে বিপরীত কোন নির্দ্দেশ না পায় তাহলে সে যেন মহাত্মাজীর উপদেশ মত আন্দোলন সুরু করে তার নিজের এলাকায়। সেখানে তাকেই হ'তে হবে নেতা।

প্রদীপের হাতে এসে পড়েছিল মহাত্মাজীর শেষ বাণীর এক কপি, কারারুদ্ধ হবার প্রাক্কালে দেশবাসীর কাছে তাঁর শেষ আবেদন।—সব সময় মনে রেখো তোমরা স্বাধীন, যদি স্বাধীনভাবে চলতে পারো তাহলে কারো ক্ষমতা নেই তোমাদের পায়ে পরিয়ে দেয় পরাধিনতার শৃঙ্খল। অহিংস ভাবে আন্দোলন চালাও নির্ভয়ে, তোমাদের বিবেকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী। জাতির সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখো, তাতে যদি মৃত্যুকে বরণ করতে হয় সেও শ্রেয়ঃ।

প্রদীপ দেখল তার সহকর্ম্মীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অলসভাবে ঘটনার গতির প্রতীক্ষায় বসে থাকতে তারা রাজী নয়। তাছাড়া চারদিক থেকে আসছে সত্যাগ্রহীদের সাফল্যের সংবাদ। কতদিন তারা চুপ ক'রে বসে থাকবে?

সে তাদের জানাল যে পরের দিন ভোরবেলায় সূর্য ওঠবার আগেই তারা রওনা হবে শিবগ্রামের দিকে। বৃটিশ সরকারের দাম্ভিকতার পরিচিতি, দেশের পরাধীনতার প্রতীক, শিবগ্রামের থানাই হবে তাদের লক্ষ্য।

প্রদীপ জানত এই জাতীয় অভিযানে সাফল্যলাভ করতে হলে তার পেছনে থাকা চাই সম্মিলিত জনবাহিনীর দৃঢ়তা। যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও সে করেছিল। কিন্তু সেও অবাক হয়ে গেল যখন সে দেখল তার বাহিনীর মধ্যে রয়েছে অন্ততঃ একশত বালক-বালিকা এবং বেশ কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলা। তাদের মুখ আগ্রহোজ্জ্বল, নতুন প্রভাতের আশায় দীপ্যমান।

খোলামাঠের মাঝখান দিয়ে গান গাইতে গাইতে চলল এই সত্যাগ্রহীদল। তাদের সঙ্গে না আছে কোন অস্ত্র, না আছে অস্ত্রপ্রতিরোধকারী কোন আবরণ। আছে শুধু কংগ্রেসের পতাকা, আর আছে অপরিসীম নির্ভয়।

বেশীদূর তাদের এগোতে হ'ল না। দেখল, সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের দল, রাইফল হাতে।

—খবরদার, আর এক পা'ও এগিয়ো না। এগিয়েছ ত গুলী করব। চীৎকার করে জানালেন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

অগ্রগামী দল থমকে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে প্রদীপ স্থির করে নিল তার কর্ত্তব্য। মৃত্যুকে সে ভয় করে না, কিন্তু তার সঙ্গে আছে বালক-বালিকা, বৃদ্ধা। বন্দুকের গুলীর আঘাত থেকে এদের বাঁচাতেই হবে।

সে একটু পিছু হঠে এল। উদ্দেশ্য, এদের সে অনুরোধ করবে ফিরে যেতে।

কিন্তু জনতা ভুল বুঝল। একজন চীৎকার করে বলে উঠল, পেছিয়ে এসো না, পেছিয়ে এসো না, আমরা ভয় পাই নি'। আরেকজন বলল, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—

দেখতে দেখতে শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতা হয়ে উঠল উদ্দাম, বাঁধনছাড়া স্রোতের মত আছড়ে পড়ল সম্মুখে। প্রদীপ একবার শেষ চেষ্টা করল তাদের প্রতিরোধ করতে, কিন্তু দুর্ব্বার বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল এগিয়ে।

তারপর যা' অবশ্যম্ভাবী তা'ই ঘটল। প্রথমে পুলিশ করল গুলীবর্ষণ, সম্মুখের দু'-একজন গুলীর আঘাতে মাটিতে লুটিয়েও পড়ল, কিন্তু হাজার লোককে ঠেকানো জনকুড়ি পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য—রাইফল থাকা সত্ত্বেও।

জনতা অনায়াসে পুলিশের ব্যূহ ভেদ করে ছুটে চলল থানাঘরে। কয়েকজন ভেতরে গিয়ে টেনে আনল সব নথিপত্র, বাইরের উঠোনে সেগুলো স্তূপীকৃত ক'রে জ্বালাল আগুন। আরও কয়েকজন প্রস্তাব করল সমস্ত থানাটাকেই দাও পুড়িয়ে।

ততক্ষণে প্রদীপ থানাঘরে এসে পড়েছে। জনতা তখন খুবই উত্তেজিত, পুলিশের গুলীতে যে দু'জন পড়ে গিয়েছিল তাদের একজনের অবস্থা খুবই সঙ্গীন, বাঁচবে বলে ভরসা হয় না। প্রদীপ তাড়াতাড়ি তাদের পাঠিয়ে দিল নিরাপদ এক জায়গায়, স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে।

তারপর সে চেষ্টা করল জনতাকে শান্ত করতে, কিন্তু তার প্রয়াস ব্যর্থ হ'ল। প্রতিশোধের ক্ষুধায় উন্মত্ত জনতা থানাঘরের চালায় আগুন লাগিয়ে দিল, আর কয়েকজন সমবেত কণ্ঠে সুরু করল ভাঙনের গান।

জনতার এই রুদ্রমূর্ত্তি, এই সার্ব্বভৌম স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় প্রদীপ এর আগে কখনও পায়নি। নতুন এক উপলব্ধি তাকে কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত, চমৎকৃত করে রাখল।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। সে বুঝতে পেরেছিল পুলিশ শীগগিরই ফিরে আসবে, একা নয়, মিলিটারি সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, মেসিনগান সহ। দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে মূর্খতা, তাছাড়া এতগুলো প্রাণ নিয়ে খেলা করবার কোনই অধিকার নেই তার।

সে প্রস্তাব করল তারা চলে যাবে অন্যত্র, তারপর ছড়িয়ে পড়বে নানা জায়গায়, যাতে পুলিশ বা মিলিটারি তাদের সন্ধান না পায়।

থানাঘর ভস্মীভূত হবার পর জনতাও একটু শান্ত হয়েছিল, প্রদীপের উপদেশ গ্রহণ করতে তারা অস্বীকৃত হ'ল না।

ঘণ্টা দুই পরে পুলিশের সঙ্গে গুর্খা ব্যাটেলিয়ান যখন এসে পৌঁছল তখন চারিদিক নিশ্চুপ, যত দূর দেখা যায় জনমানবের চিহ্ন নেই, পড়ে আছে শুধু ভস্মের স্তূপ।

বলা বাহুল্য, সরকার ক্ষমা করলেন না। শিবগ্রামকে কেন্দ্র করে কুড়ি মাইলের মধ্যে যত বসতি ছিল সেখানে স্থাপন করা হ'ল মিলিটারী ইউনিট এবং তাদের হাতে দেওয়া হল সীমাহীন ক্ষমতা। তারপর যে অত্যাচার চলল তা' অকথ্য, অবর্ণনীয়। প্রতিহিংসার লেলিহান জিহ্বার নগ্ন লোলুপতার কাহিনী বাইরের জনসাধারণের কাছে পৌঁছল অনেক দিন পরে, যখন মেদিনীপুরের উপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রকৃতির তাণ্ডব ঝড়।

প্রদীপ তার ছত্রভঙ্গ হওয়া বাহিনীকে সমবেত করে নতুন এক অভিযানের আয়োজন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু দেখল তা' একপ্রকার অসম্ভব। তার সহকর্মীদের অনেকেই পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দও। রাজশক্তিকে এড়িয়ে মাস পাঁচেক পরে ছদ্মবেশে প্রদীপ চলে এল কলকাতায়।

পাঁচ

কলকাতায় পৌঁছে দেখল অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কংগ্রেসের বিদ্রোহ দমন করবার পর বৃটিশ সরকার হয়ে উঠেছেন আরও অনম্র আরও উদ্ধত। কংগ্রেসের নাম নিয়ে লোকে কোন কোন জায়গায় যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ দেখিয়েছিল তার অতিরঞ্জিত বর্ণনা প্রকাশিত হ'ল সরকারী দপ্তরখানা থেকে। ওদিকে কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যেও অনেকে ভিড়লেন সরকারী দলে।

প্রদীপ আরও লক্ষ্য করল যে বামপন্থীদলগুলো নতুন এক জীবন লাভ করেছে। কংগ্রেসী নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা সরকারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে সুরু করল যে আগষ্ট সেপ্টেম্বরের গণ্ডগোলের জন্ম সম্পূর্ণ দায়ী হচ্ছে কংগ্রেস।

চারিদিকে গোয়েন্দার ছড়াছড়ি, কাকে বিশ্বাস করবে এবং কাকে বিশ্বাস করবে না তা' নির্দ্ধারণ করা কঠিন। প্রদীপ বুঝেছিল, গোয়েন্দা তার পেছনেও লেগেছে—তাকে সাবধানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে বেশ কিছুদিন।

এক দোকান থেকে সে টেলিফোন্ করল গায়ত্রীকে। সংক্ষেপে জানাল যে তার সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। গায়ত্রী তাকে আসতে বলল অবিলম্বে, মিঃ কর অফিসে আছেন, বাড়ীতে ফিরতে বেশ দেরী হবে।

গায়ত্রী ঘরের জানালার কাছে তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। প্রদীপ আসতেই সে তাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ, টিফিনের পর বয় বেয়ারারা চলে গেছে তাদের নিজের নিজের কামরায়, প্রদীপের আগমন কারও নজরে পড়ল না।

—প্রদীপ ভাইটি, বড্ড রোগা হয়ে গেছ তুমি। সস্নেহে গায়ত্রী বলল।

—শরীরের কি অপরাধ, দিদি! এই কয় মাস যে ভাবে কেটেছে তাতে

বেঁচে যে আছি এই যথেষ্ট। কিন্তু সে সব কথা ব'লে সময় নষ্ট করতে চাইনে। তোমার কাছ থেকে কতকগুলো খবর হয়ত পাব, সেই আশায় এসেছি।

গায়ত্রী ক্ষুণ্ণ হবার ভাণ করল। বলল, অর্থাৎ এসেছ নিজের প্রয়োজনে ? দিদির খোঁজ নিতে নয়।

—দিদির কাছে ভাইরা সব সময়ই আসে নিজের প্রয়োজনে। দিদিদেরই কর্ত্তব্য ভাইদের খবর নেওয়া।

—ওঃ, চমৎকার লজিক্ ত! তা' বল, তোমার কি কাজে আমি লাগতে পারি ?

—তার আগে কিছু খেতে দাও, বড্ড খিদে পেয়েছে।

গায়ত্রী তাড়াতাড়ি প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল সন্দেশ এবং ফল। আর আনল রেফ্রিজারেটার থেকে শীতল পানীয়।

এক নিঃশ্বাসে খাবারগুলোর সদ্‌গতি ক'রে প্রদীপ বলল, আঃ, বেশ উপভোগ করা গেল! আই-সি-এস-এর গৃহিণীর সঙ্গে ভাব রাখায় লাভ আছে।

তারপর বলল, এবার আমার নিজের কথাটা বলছি। কিন্তু দেখো, মিঃ কর যেন কিছু জানতে না পারেন, কারণ আমি চাইনে তিনি আমার বা আমার বন্ধুদের গতিবিধির খবর পান। তা ছাড়া, আমি তোমার কাছে এসেছি এই খবর পেলে চারিদিকে তিনি বসাবেন কড়া পাহারা, যা ভেদ ক'রে ভবিষ্যতে তোমার কাছে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব হবে।

গায়ত্রী চুপ করে শুনল প্রদীপের কাহিনী। নতুন এক পৃথিবীর ছবি, যার সঙ্গে তার পরিচয় কত সামান্য! প্রদীপ কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সম্মোহন কাটিয়ে উঠেছে, ঘটনাটার ঘাত-প্রতিঘাত সে দেখতে পাচ্ছে সম্পূর্ণ নির্ব্যক্তিক ভাবে। মন্ত্রমুগ্ধের মত গায়ত্রী শুনতে লাগল।

গল্প বলা শেষ হ'ল। ম্যান্টেলপিসএর উপর স্থাপিত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলল, ওরে বাবা, চারটে বাজতে চলল। এবার ত তোমাদের চায়ের পালা, এখখুনি চাকর-বাকর এসে পড়বে। আমাকে পালাতে হবে।

গায়ত্রী বলল, ওরা পাঁচটার আগে আসে না, কারণ ওঁর ফিরতে ফিরতে ছ'টা সাড়ে ছ'টা হয়। সময় আছে, তোমার প্রশ্নগুলো এবার শুনি—

—এই দেখ, দিদি, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আসল উদ্দেশ্যের কথা, যে জন্যে তোমার কাছে আসা। বুঝতেই ত পারছ, আমার পক্ষে সব জায়গায় এখন যাতায়াত করা একটু মুস্কিল, তাই তোমার মাধ্যমে খবর নিতে হচ্ছে।

—বলো, কি খবর চাও।

—প্রথমত জ্যোতির্ম্ময় বাবুর খবর। তিনি কি বাইরে আছেন, না তিনিও সরকারের অতিথি?

—জ্যোতির্ম্ময় বাবু জেলে আছেন।

—এই সম্ভাবনাটাই আশা করেছিলাম। আর তাঁর মেয়ে সুমিত্রা?

—তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

—সরকারের বিশেষ অনুকম্পা ত'! যাক্, অটলবিহারী বাবুদের কি খবর? তাঁরা ভাল আছেন ত'।

—হ্যাঁ, তাঁরা ভালই আছেন, বন্দনাও। ব'লে গায়ত্রী একটু হাসল।

অটলবিহারীদের গায়ত্রী আগে থেকেই জানত। খানিকক্ষণ নীরব থেকে প্রদীপ বলল, আচ্ছা, দিদি, তুমি আমাকে একটা উপদেশ দাও দেখি! জ্যোতির্ম্ময় বাবু বা অটলবিহারী বাবুর ওখানে আমার যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কি?

—আমার উপদেশ যদি শুনতে চাও তাহ'লে বলব জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ওখানে তুমি আপাতত যেয়ো না, কারণ কংগ্রেসের সমস্ত নেতাদের বাড়ীর ওপর পুলিশের এখন কড়া নজর। তবে অটলবিহারী বাবুদের ওখানে তুমি যেতে পার, যদি তুমি মনে করো কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তবু বলব, দিনে দুপুরে যেয়ো না।

—অটলবিহারী বাবুর ওখানে কে আমাকে পুলিশে লেলিয়ে দেবে? বন্দনা বা নবকিশোর নিশ্চয়ই নয়, আর অটলবিহারী বাবুকে এতটা নীচ ভাবতে পারিনে, নিজেরই সঙ্কোচ হয়।

—আমি যাদের সংস্পর্শে এসেছি তাদের চরিত্রের নানা দিক্ দেখে মানুষের উপর বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমার স্বামীকেও বাদ দিয়ে বলছি না। আমাকেও তুমি বিশ্বাস করো না।

—কি যে বলছ তুমি, দিদি! প্রদীপ বলল।

—এখন তুমি এসো, ভাই, বেয়ারাদের আসবার সময় হ'ল। একটা কথা, যদি তোমাকে কোন খবর দিতে হয় কোথায় তোমাকে পাব?

প্রদীপ একটু ভাবল, তারপর বলল, আপাতত অটলবিহারী বাবুর বাড়ীতেই টেলিফোন ক'রো, বন্দনাকে ডেকো, যা বলবার তাকেই ব'লো।

আলিপুরের বড় রাস্তায় এসে প্রদীপ ভাবতে লাগল এখন কি করা যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আরো ঘণ্টা দুয়েক দেরী—অটলবিহারী বাবুদের বাড়ী এখন যাওয়া চলবে না।

অবশেষে সে ঢুকল ছোট একটা রেস্তঁরা ক্যাবিন-এ। চা এবং ডিমের অম্‌লেট সামনে নিয়ে হরেক রকমের লোক সেখানে বসে তুমুল তর্ক আলোচনা করছে। একটা টেবিলও খালি নেই, এদিকে ওদিকে দু'একটা সীট খালি আছে মাত্র। প্রদীপ তারই একটা অধিকার করে বসল, এবং অন্যান্য অতিথিদের অনুকরণ করে সেও অর্ডার দিল একপেয়ালা চা এবং ডবল ডিমের অমলেট।

গল্প করবার প্রয়াসে তারই টেবিলের অপর অতিথি বলল, এখানকার অম্‌লেটটা কিন্তু খাসা মশায়, কি দিয়ে যে তৈরী করে বুঝতেই পারিনে—বাড়ীতে কতবার বলেছি, কিছুতেই এখানকার মত হয় না।

—আমি এই প্রথম এখানে এসেছি। প্রদীপ জবাব দিল।

—ওঃ, তাই নাকি? আপনি বুঝি এদিকে থাকেন না? আমিও অবশ্যি এই অঞ্চলের বাসিন্দা নই, তবে এদিকে প্রায়ই আমাকে যাতায়াত করতে হয়, সময় পেলেই এখানে ঢুকে পড়ি অম্‌লেট-এর লোভে।

বয় প্রদীপের চা' এবং অম্‌লেট নিয়ে এল। ছোট চামচটার সাহায্যে অম্‌লেটটা একটু ভেঙ্গে মুখে ফেলে তার আস্বাদ গ্রহণ করে প্রদীপ বলল, সত্যি, ভারী চমৎকার তৈরী করেছে কিন্তু।

—কিছুদিন পরে আপনিও এখানকার নিয়মিত অতিথি হয়ে উঠবেন। লোকটা কিন্তু এই ক্যাবিন চালিয়েই একটা বাড়ী তৈরী করে ফেলেছে!

—বাড়ী? এত লাভ হয়? সবিস্ময়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

বিচিত্র এক চক্ষুভঙ্গী করে সন্তোষ বলল, আরে মশায়, ক্যাবিনটা হচ্ছে বাইরের একটা আবরণ মাত্র। এর পেছনে আরও অনেক ব্যবসা চলে—আয় হচ্ছে সে সব ব্যবসাতে, চা আর অম্‌লেট বিক্রি করে নয়।

এ আবার কি কথা? প্রদীপ বুঝতে পারল না, বিহ্বলভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

ফিসফিস করে সন্তোষ বলল, এখানে বড্ড চেঁচামেচি হচ্ছে, একটু শান্তিতে আলাপ করবার উপায় নেই। চা টা শেষ করে ফেলুন, বাইরে আসুন, বলছি আপনাকে।

প্রদীপ প্রথমে ভাবল পরচর্চ্চায় কাজ নেই, কি প্রয়োজন এই অপরিচিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার? তা'ছাড়া সে ফেরারী আসামী, একটু সন্তর্পণে তার চলাফেরা করা দরকার। কিন্তু হাতে এখনও অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা সময় আছে, এই সময়টা কোন রকমে কাটাতে হবে ত। দোকানের বিল চুকিয়ে সন্তোষ এবং সে বাইরে চলে এল।

সন্তোষ বলল, আসুন, হাঁটা যাক। ঝিরঝির করে বেশ হাওয়া বইছে, রাস্তা ফাঁকা, হাঁটতে ভালই লাগবে। হ্যাঁ, আমার পরিচয় দেই, আমার নাম হচ্ছে সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, এ-আর-পি-তে কাজ করি। এখন আমার অফ-ডিউটি, তাই ইউনিফর্ম্ম দেখছেন না। ভাল লাগে না সব সময় ধড়াচুড়ো পরে সং সেজে থাকতে। আপনার নাম?

প্রদীপ একটু ইতস্ততঃ করল। না, পরিচয় দেওয়া চলবে না, এ-আর-পি'র লোক, গোয়েন্দা কি না কে জানে? এর সঙ্গে না বেরুলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

বলল, আমার নাম যতীন মজুমদার। বিশেষ কিছু করিনে, আমার এক খুড়োর কাপড়ের ব্যবসা আছে, দেখাশুনা করি।

হো হো করে হেসে উঠল সন্তোষ। বলল, দেখুন, আমার কাছে নাম এবং পরিচয় ভাঁড়াবার প্রয়োজন ছিল না আপনার। আপনি যে যতীন মজুমদার নন আমি হলফ করে বলতে পারি, আর কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে আপনার কোনই সংশ্রব নেই। ভয় পাবেন না, আমি পুলিশের টিকটিকি নই, তবে শার্লক হোমস এবং অ্যাগাথা ক্রিষ্টি পড়ে প্রাইভেট গোয়েন্দাগিরি একটু আধটু করে থাকি।

প্রদীপ অবাক! লোকটার দৃষ্টিশক্তি ত খুবই প্রখর বলতে হবে, কিন্তু কি করে সে বুঝল যে তার নাম যতীন মজুমদার নয়?

সন্তোষ বলে চলল, আপনার আসল নাম বলতে চান না, আমি জোর করব না, তবে আপনার জেনে রাখা ভাল যে আত্মগোপনের আর্টে আপনি এখনও ছেলেমানুষ।

তারপর বলল, আপাতত আপনাকে আমি যতীন বাবু ব'লেই ডাকব, কিন্তু ভুলে যাবেন না নিজের দেওয়া নামটা। ডাকলে সাড়া দেবেন যেন।

প্রদীপ একবার ভাবল পরিচয় গোপন না রেখে সত্যি কথাটা বলে ফেলে। কিন্তু তখনই তার মনে পড়ল গায়ত্রীর সতর্কবাণী—আজকের পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস করো না, প্রদীপ!

সন্তোষ বলতে লাগল, আমাদের ঐ ক্যাবিনের মালিকের কথা বলছি। ভদ্রলোকের আসল ব্যবসা হচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাত্রিবেলা ওখানে আসে শাঁসালো খদ্দের, যাদের হাতে পয়সা আছে প্রচুর, জীবনটাকে যারা উপভোগ করতে চায়। ওদের নিয়ে যান তাঁর ফ্লাট-এ—সুবিধে আছে, ভদ্রলোক বিয়ে করেন নি—সেখানে আসে উদ্ভিন্নযৌবনা মেয়ে, যাদের পয়সার প্রয়োজন। দক্ষিণার এক-চতুর্থাংশ তিনি নেন, বাকীটা দেন তাদের, যারা উপচার পরিবেশন করে। ইচ্ছে করলে অর্দ্ধেকটা বা তারও বেশী হয়ত নিতে পারতেন, কিন্তু ভদ্রলোকের বুদ্ধিশক্তি সুদূরপ্রসারী। তিনি জানেন যাদের

নিয়ে কারবার তাদের খুসী রাখতে হবে, তারা যদি জানতে পার যে তিনি তাদের প্রাপ্যের বেশীর ভাগটা আত্মসাৎ করছেন তাহলে হয়ত বিদ্রোহ করে বসবে। কাজেই লোভটা সম্বরণ করেন তিনি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে, আপনি যদি কোন দিন তাঁর ফ্ল্যাট-এ যেতে চান আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি অনায়াসে। কোন ভয় নেই, আমি কোন দালালি চাইব না—পরোপকার করেই আমার আনন্দ।

প্রদীপ শিউরে উঠল। এ কী বীভৎস খেলা চলেছে কলকাতার বুকে? মানুষ আজ নেমেছে অধঃপতনের এত নীচু সোপানে? লোকের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যারা ধনী, যারা শক্তিশালী, তারা করছে ব্যভিচার, লুণ্ঠন! প্রদীপের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল।

সন্তোষ বলল, আপনার খুব শক্ লাগছে, না? অনেকেরই লাগে, অন্ততঃ প্রথম প্রথম। কিন্তু বলুন ত, এতে শক্ পাবার কি আছে? স্বেচ্ছায় মেয়েরা আসছে, দু'পক্ষের কারোরই কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া এ হচ্ছে ডিমাণ্ড আর সাপ্লাইএর কথা। ডিমাণ্ড যদি বাড়ে তাহ'লে সাপ্লাইকে বাড়তেই হবে। ও কি, কোন কথা বলছেন না যে?

—বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

—ওরে বাবা! আপনি দেখছি ভয়ানক পিউরিটান্! আচ্ছা, আপনাকেই একটা প্রশ্ন করি, আপনাদের বাংলা দেশেই কত মেয়েকে মা বাপের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে হয় অশীতিপর লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের হাতে, মদ্যপায়ী পরনারীতে আসক্ত প্রৌঢ় বা যুবকের [illegible]। শুধু একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে বলেই সে সব হবে শোভন, সুরুচিস[illegible]?

—আপনি কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছেন, সন্তোষবাবু? তীব্রকণ্ঠে প্রদীপ বলল।

সন্তোষ বোধ হয় একটু লজ্জিত বোধ করল। বলল, দেখুন এটা হচ্ছে ডিগ্রীর কথা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই বলেই মেয়েরা দেহবিক্রয় করতে বাধ্য হয়—কখনও বা একজনের কাছে করে, কখনও বা একাধিকের কাছে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সেটা স্বেচ্ছায় করছে, আমাদের, বাইরের লোকেদের, বিচার করার কি অধিকার?

—আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর মিল কখনও হবে না, সন্তোষ বাবু। এসব কাহিনী আমি শুনতে চাইনে। আর কোন কথা যদি থাকে, বলুন।

হতাশার সুরে সন্তোষ বলল, আপনি যেরকম মরালিষ্ট তাতে আপনার সঙ্গে কথা বলবার মত টপিক খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল! হ্যাঁ, আমাদের ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির আরও একটি ব্যবসা আছে, সেটা হচ্ছে কালোবাজারে খেলা করা।

—কালোবাজার? সে আবার কি? প্রদীপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—নাঃ, আপনি নেহাতই ব্যাক্‌-নম্বর। কোথায় থাকেন আপনি? ব্ল্যাক মার্কেটে কখনও কোন জিনিষ কেনেন নি? কাপড়, চাল, ওষুধ?

না, প্রদীপের কোন প্রয়োজন হয়নি ব্ল্যাকমার্কেট থেকে কোন জিনিষ কেনবার। তবে, হ্যাঁ, সে মাঝে মাঝে সুমিত্রা এবং বন্দনার কথার ফাঁকে এই ধরণের একটা বাজারের কথা শুনেছে বই কি!

বলল, আমি সত্যি ব্যাক্‌নম্বর, সন্তোষ বাবু!

—তবে শুনুন। সরকার ত বলে দিয়েছে মাসে কয়েক সেরের বেশী চাল বা কয়েক গজের বেশী কাপড় পাব না, দাম বেঁধে দিয়েছে ওষুদের, কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে (অথবা ভুলে যাবার ভাণ করছে) দুটো জিনিষ। প্রথম, লোকের যা প্রয়োজন তার তুলনায় কন্‌ট্রোল থেকে জিনিষ দিচ্ছে খুবই সামান্য। তাই লোকে খুঁজছে অন্য কোথাও বাকীটা পাওয়া যায় কি না। যাদের পয়সা আছে! দ্বিতীয়, কনট্রোল যদি সাধুভাবে চলত তাহলে হয়ত প্রথম নম্বরের পরিস্থিতির সৃষ্টিই হত না। কিন্তু কন্‌ট্রোলে চলেছে ঘোরতর অরাজকতা, অসাধুতা, রীতিমত লুঠ। যারা অপেক্ষা করতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক তারা ছুটতে বাধ্য হচ্ছে কালোবাজারে। আমাদের ক্যাবিনের ভদ্রলোকের কাছে যান্‌, যা' চাইবেন তিনি জোগাড় করে দেবেন, [illegible] উপযুক্ত দক্ষিণী দিতে হবে।

—কিন্তু সরকার এ সব দেখে না? দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়?

—আপনিও পাগল! সরকারের এসব দেখবার সময় কোথায়? তারা ব্যস্ত কংগ্রেসী দলের লোকদের জেলে পুরতে। তাছাড়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়াটাই যে তাদের একটা পলিসি, যাতে দেশের সবাই হয়ে ওঠে নীতিজ্ঞান-রহিত। যারা সাধু নয় তারা কি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে পারে কখনও? সরকারের এই বুদ্ধি আর কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, এ-আর-পি'র সন্তোষ মুখুজ্যের বুঝতে দেরী হয় না।

প্রদীপকে মনে মনে স্বীকার করতেই হল সন্তোষের কথার মধ্যে সঙ্গতি আছে। অথচ সরকারের আচরণের এই দিকটা এত দিন তার চোখেই পড়েনি!

নিজেরই অজ্ঞাতে সন্তোষকে তার কেন যেন ভাল লাগল। কিন্তু লোকটা সুবিধের নয়, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। প্রদীপ বলল, আমার কাজ আছে সন্তোষ বাবু, এখন যেতে হবে।

—আচ্ছা, আসুন। পরিচয় যখন দিলেন না তখন ভবিষ্যতে কখন কি ভাবে দেখা হতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে আপনাকেই। তবে এ চায়ের ক্যাবিনে প্রায় প্রত্যেক বিকেল এবং কোন কোন সন্ধ্যায় আমাকে পাবেন। যদি আসেন দেখা হ'তে পারে।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল অটলবিহারী বাবুর বাড়ীর অভিমুখে। শুনল সন্তোষ চেঁচিয়ে বলছে, আজকের মত নমস্কার, যতীন বাবু। ও যতীন বাবু, শুনতে পাচ্ছেন ত?

প্রদীপের চোখ কান লাল হয়ে উঠল।

ছয়

অটলবিহারী বাবুর বাড়ীর সম্মুখে এসে প্রদীপ দেখল চার দিক।

অন্ধকার। অবশ্য এ-আর-পি'র সতর্কতা নিবন্ধন কোন বাড়ীর আলোই বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় না, কিন্তু অটলবিহারী বাবুর বাড়ী যেন একটু অসম্ভব রকম আলোক-বিবর্জ্জিত এবং নিস্তব্ধ।

প্রদীপ খানিকক্ষণ ইতস্তত করল ভেতরে ঢুকবে কি না। কে জানে, এঁরা বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন হয়ত! অথবা, সরকারী সিভিল ডিফেন্স-এর ঘাঁটি এখানে বসেনি ত?

নাঃ, অনুসন্ধান করে দেখাই যাক না কি ব্যাপার। প্রদীপ বারান্দার সামনে এসে বাইরের দরজার কড়া নাড়ল।

কোনই সাড়া-শব্দ নেই! প্রদীপ আবার কড়া নাড়ল, এবার একটু বেশী জোরে।

ভেতর থেকে কার গলা শোনা গেল। কে যেন প্রশ্ন করছে, কে?

—দরজাটা একবার খুলুন, জরুরী দরকার আছে। প্রদীপ অসহিষ্ণুভাবে বলল।

অতি সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করে অটলবিহারী বাবু উঁকি মারলেন। আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি, তুমি, কে?

—আমি প্রদীপ, কাকাবাবু।

—ওঃ, প্রদীপ? কোথেকে? এই অন্ধকারের মধ্যে এসেছ? অটলবিহারী বাবু এবার দরজাটা সম্পূর্ণ খুললেন এবং প্রদীপ তাঁকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দেখল, ঘর সত্যি সত্যি অন্ধকার। ওপাশের বারান্দায় অবশ্য মৃদু আলো [illegible], কিন্তু তার রেখা রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছয় না।

সম্মুখের দরজাটা বন্ধ করে অটলবিহারী প্রদীপের পেছনে পেছনে চলে এলেন। প্রদীপ ততক্ষণ বারান্দার মসৃণ মেঝের উপর বসে পড়েছে।

—আপনি এই সামান্য আলোয় কাজ করছেন, কাকাবাবু? চোখে কষ্ট হচ্ছে না?

—কষ্ট হলেই বা আর কি করব বল? এ-আর-পি'র যত কড়াকড়ি, কোন খুঁত খুঁজে পায় না, কোথা থেকে একটু আলো ঠিকরে বাইরে পড়েছে, অমনি কি ধমক! জাপানীরা নাকি আলো দেখে বোমা ফেলবে! যত সব ছেলেমানুষী কথা!

—বন্দনা নেই? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—বন্দনা? না, সে তার দিদিমার কাছে আছে, বেলুড়ে।

—কবে ফিরবে?

—সে ত ঠিক বলতে পারিনে, সবাই বলল কলকাতায় বোমা পড়তে পারে, তাই ওকে পাঠিয়ে দিলাম কলকাতার বাইরে। এখন দেখছি, কোন প্রয়োজন ছিল না।

—আর নবকিশোর?

—সে আমার কাছেই আছে। এখন বাড়ীতে নেই, কোথায় বেরিয়েছে। আজ-কাল তার দেখা পাওয়াই মুস্কিল, এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, কোন কোন দিন বাড়ীতে ফেরে রাত বারোটা-একটায়। অন্ধকার রাতে এই ভাবে চলা-ফেরা করা আমার ভাল লাগে না।

—কিন্তু গাড়ী ত আছে তার?

—গাড়ী থাকলে কি হবে? চালায় সে নিজে। তুমি ত দেখছ, কি রকম অন্ধকার কলকাতার পথঘাট, তার ওপর গাড়ীর বাতিও অর্দ্ধেকটা কালো কাগজে ঢাকা। অথচ একটু হুঁসিয়ার হয়ে যে গাড়ী চালাবে, সেদিকে ওঁর এতটুকু খেয়াল নেই। এই ত সেদিন কোন্ এক ভিখিরীর ছেলেকে চাপা দিয়েছিল, অনেক কষ্টে তার মাকে শ'খানেক টাকা দিয়ে আমি ব্যাপারটার নিস্পত্তি করি।

তারপর একটু কাতরভাবে অটলবিহারী বললেন, তোমার কথা সে খুব শোনে প্রদীপ। তুমি ওকে একটু বুঝিয়ে ব'লো এরকম বেপরোয়া হয়ে গাড়ী যেন না চালায়।

—আমার কথা কি সে এখন শুনবে? প্রদীপ হাসল। আচ্ছা, দেখা হ'লে বলব।

—তারপর, তোমার খবর কি? মেদিনীপুরে তোমরা ত খুব স্বাধীনতার নিশান ওড়ালে। তবু যদি শেষ পর্য্যন্ত যুঝবার মত সাহস এবং শক্তি তোমাদের থাকত!

প্রদীপ ক্ষণেকের জন্য দপ্ করে জ্বলে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিল। বলল, আপনি ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, কাকাবাবু, সব কথা না জেনে এ রকম একটা অভিমত প্রকাশ করা কি উচিত হচ্ছে? আমরা ছিলুম নিরস্ত্র, তাছাড়া মহাত্মাজীর মত স্থৈর্য্য এবং সাহস আমাদের আসছে কোথেকে? কাজেই আমরা যদি হঠে গিয়েও থাকি তার জন্যে লজ্জিত হ'বার কোন কারণে নেই।

—আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি যে উপলব্ধি এখন তোমার হয়েছে, সেটা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। আমরা, যারা বয়সে প্রবীণ, তোমাদের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ, তোমাদের কি প্রথম থেকেই বলিনি যে বৃটিশ মিলিটারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া ঘোরতর মূর্খতা? শুধু শুধু কতকগুলো লোক প্রাণ হারাল, আর কতকগুলো লোক জেলে গেল। এই ধর, জ্যোতির্ম্ময় বাবু, কি সার্থকতা হ'ল তাঁর কারাবরণে? মাঝখান থেকে তাঁর মেয়ে সুমিত্রার কি লাঞ্ছনা!

—আমি জ্যোতির্ম্ময় বাবু বা সুমিত্রার কথা জানিনে, তবে আমরা যারা অত্যন্ত নগণ্য—আমাদের কথা বলতে পারি। আমরা হেরেছি বটে, কিন্তু এ পরাজয় সাময়িক। আবার দিন আসবে, যখন আমরা যুদ্ধ করব, নতুন উদ্যমে, নতুন অস্ত্রশস্ত্রে।

—বড় বড় কথা বলতে তোমরা খুব পারো, প্রদীপ। তবে তোমাদের

দৈন্য কোথায় তা যদি সত্যি বুঝে থাক, তাহলে আমিও বলব, তোমাদের এই ছেলেমানুষিটা নেহাৎ নিরর্থক হয়নি।

বাইরে আবার কে কড়া নাড়ল। অটলবিহারী একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন যেন।

প্রদীপ বলল, নবকিশোর এসেছে বোধ হয়। আমি দরজাটা খুলে দিয়ে আসি।

—না, না, তোমায় যেতে হবে না, আমিই দেখছি। বলে শশব্যস্তে অটল-বিহারী এগিয়ে গেলেন।

প্রদীপ শুনতে পেল, অটলবিহারী ফিস্ ফিস করে আগন্তুকের সঙ্গে কি কথা বলছেন। কথোপকথনটা সম্পূর্ণ সে অনুধাবন করতে পারল না, তবে শুনল অটলবিহারী বার বারই বলছেন, একশ' টাকার কমে আমি কিছুতেই একবাক্স ইনজেকৃশন দিতে পারব না, মশায়! কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জোগাড় করতে হয়েছে, জানেন? তাছাড়া সব সময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকৃতে হয়, কখন কে এসে খানাতল্লাসী সুরু করে।

আগন্তুক বলছিল, কিন্তু তাহ'লে আমার কমিশন যে কিছুই থাকবে না বাঁড়ুজ্যে মশায়!

অটলবিহারী জবাব দিলেন, আমি তার কি জানি? আমার এক দাম, পছন্দ হয় নিন, না হয়, অন্যত্র দেখুন।

—অন্য জায়গায় যদি পাওয়া যেত তা হ'লে কি আপনার এতখানি খোসামোদ করতাম বাঁড়ুজ্যেমশাই? তবে, একটা কথা বলতে পারি, আমার মক্কেল বড্ড গরীব।

—তাহ'লে আপনার কমিশনটাই তাকে রেহাই দিন না কেন? আমার ঘাড় ভেঙে মহানুভবতা না দেখালে বুঝি চলে না?

অটলবিহারী বাবু ভেতরে চলে এলেন। দেখলেন, প্রদীপ একই ভাবে বসে আ[illegible] তুমি একটু অপেক্ষা কর, প্রদীপ, ব'লে তিনি ওপরে চলে গেলেন এবং একটু পরেই কাগজের ছোট একটা প্যাকেট হাতে ক'রে নীচে

নেমে এলেন ? আগন্তুকের সঙ্গে আরও দু' একটা কথা ব'লে তাকে বিদায় করে দিয়ে তিনি ফিরে এলেন প্রদীপের কাছে।

—ও কে কাকাবাবু, কেন এসেছিল ? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—পাড়ারই এক ভদ্রলোক। একটা জিনিষ চাইতে এসেছিল। সংক্ষেপে অটলবিহারী জবাব দিলেন।

প্রদীপ বুঝল, প্রশ্নটা তিনি এড়িয়ে গেলেন।

অটলবিহারী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি ফেরারী আসামী নও ত ?

প্রদীপ হাসল। বলল, সে ত ঠিক জানিনে, অর্থাৎ আমার নামে কোন ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে কি না। তবে, হ্যাঁ, কর্তারা আমাকে চিনতে পারলে বাইরে থাকতে দেবেন না এটা একরকম নিশ্চিত।

চিন্তান্বিত মুখে অটলবিহারী বললেন, তাহ'লে এ ভাবে ঘুরে বেড়ানো কি তোমার উচিত হচ্ছে ? কখন কে দেখে ফেলে ?

—সেই জন্যেই ত সন্ধ্যার অন্ধকারে এখানে এসেছি। এক আপনারা ছাড়া এখানে আমাকে চেনে কে ? আশা করি আপনি পুলিশ ডাকবেন না।

সোজাসুজি এই উক্তিতে অটলবিহারী বেশ একটু বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, আরে, ছিঃ, আমাদের কথা বলছিনে, বলছি এই যে আমার এখানে হরেক রকমের লোক আনাগোনা করে, তাদের কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে।

—সে সম্ভাবনা খুবই কম। আমি এখানে আসব খুবই কচিৎ কদাচিৎ। আরও খুলে বলি, বন্দনা যখন এখানে নেই আমার আসবার প্রয়োজনই হবে না হয়ত।

অটলবিহারী খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। তার পর বললেন, কথাটা যখন তুমি নিজেই তুলেছ, আমিও খুলে বলি। তোমাকে আমরা স্নেহ করি, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে আমাদের বিপদের মধ্যে টেনে না আনলেই আমরা খুসী হ'ব। অর্থাৎ, আপাতত তুমি একটু দূরে থাকলে উভয় পক্ষের মঙ্গল।

—আপনারা খুসী হবেন একথাটার মানে ? আপনারা কে কে ?

—কেন ? আমি, নবকিশোর, বন্দনা।

—বন্দনারও এই অভিমত ? আমি বিশ্বাস করিনে।

—আমি তাকে খোলাখুলি একথা জিজ্ঞাসা করিনি বটে, তবে কোন্ মেয়ে চায় যে তার বাবা, তার ভাই বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ে ? তোমার কোন ভাই-বোন্ নেই ব'লে অন্যের দিকটা তুমি আদৌ দেখতে পাও না !

—আমি বেলুড়ে গিয়ে বন্দনার সঙ্গে এসম্বন্ধে মুখোমুখি কথা বলব।

—কেন একগুঁয়েমি করছ ? মুখোমুখি প্রশ্ন করলে বন্দনা হয় ত অপ্রিয় সত্যটা বলতে পারবে না, তার সঙ্কোচ হবে। তাকে এই দ্বিধার মধ্যে ফেলা তোমার কি উচিত হবে, প্রদীপ ? তাছাড়া অন্য কারণেও আমি চাই তুমি বন্দনার সঙ্গে একটু কম মেলামেশা কর।

—ঐটাই হচ্ছে আসল কারণ, কাকাবাবু ! আপনার ভয়, বন্দনা আপনার উত্তরীয়ের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য প্রধানত দায়ী আমি। আপনি কিন্তু ভুল করছেন। বন্দনা যদি আজ নতুন চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে সুরু করে থাকে তাহ'লে তার পেছনে আছে যুগের হাওয়া, আমি নই।

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে অটলবিহারী বললেন, যুগের হাওয়া না অন্য কিছু, সে আমি বুঝব। আমি তোমাকে শুধু বলছি, তুমি একটু দূরে দূরে থেকো। আমার এই সামান্য অনুরোধটাও যদি রাখতে না পার তাহ'লে আমাকে অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হবে।

তাঁর এই শেষ কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ভয় প্রদর্শন।

প্রদীপ হেসে বলল, আপনার অনুরোধ পালন করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কাকাবাবু ! কিন্তু বন্দনার সঙ্গে একবারটি দেখা করতেই হবে, তার দিদিমার ঠিকানাটা বলুন—

কঠিন হ'লেও অটলবিহারী কঠোর নন। তাছাড়া মাতাপিতা আত্মীয়-স্বজনবিহীন এই ছেলেটার জন্য তাঁর মন মাঝে মাঝে রসসিক্ত হয় বই কি।— বন্দনার দিদিমার ঠিকানাটা তিনি দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একবারটি মাত্র, মনে থাকে যেন !

সাত

তার নিজের মেসে ফিরে যেতে প্রদীপের সাহস হ'ল না। অথচ সে এখন কোথায় যায়?

অটলবিহারী বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে চলতে সুরু করল রাসবিহারী এভিন্যুর ফুটপাত ধরে। রাত যদিও তখন মাত্র আটটা, তবু পথচারীদের সংখ্যা কমে এসেছে, দোকানীরাও তাদের দোকানপাট বন্ধ ক'রে ফেলছে। কারণ এই স্বল্পালোকিত রাতে ক্রেতার দল ঘরের বাইরে আস্‌তে চায় না কিছুতেই।

হঠাৎ তার পাশে একটা মোটর গাড়ী এসে দাঁড়াল। হর্ণ শুনে সে তাকাল, দেখল নবকিশোর গাড়ী চালাচ্ছে, সে একা।

—এই যে প্রদীপদা'! তুমি কোত্থেকে? আমি অনেক দূর থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছিলাম, প্রথমে বিশ্বাসই হয় নি যে তুমি! তারপর তোমার চলার ভঙ্গী দেখে সন্দেহ আর রইল না, ভাবলাম তোমাকে একটু সারপ্রাইজ করি। তা' যাচ্ছ কোথায়? যদি বল তোমাকে নামিয়ে দিতে পারি।—এক নিঃশ্বাসে নবকিশোর ব'লে গেল।

প্রদীপ জবাব দিল, তোমাদের ওখানেই গিয়েছিলাম, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল!

কৌতুক-চটুল চোখে নবকিশোর বলল, বন্দনা যে বেলুড়ে বন্দিনী, শুনেছ বোধ হয়?

—শুনেছি, তবে সে যে বন্দিনী, সেকথা ত শুনিনি!

—ওটা রূপক করে বললাম, প্রদীপদা! বন্দিনী সে দিদিমার বাড়ীতে। বাবা বোধ হয় তোমার ভয়ে ওকে বেলুড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন!

—ভয়? আমাকে ভয়? বিস্ময়াকুল স্বরে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—ভয় মানুষের কখন কি ভাবে আসে কে বলতে পারে? বাবার ভয়

নানাজাতীয়, তবে তার মধ্যে তোমার অংশটাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।

—কি যে তুমি বলছ, নবু! তিরস্কারের সুরে প্রদীপ বলল।

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তোমার ভাল লাগছে প্রদীপদা'? আমার ত ভাল লাগছে না। যদি তোমার তেমন কোন তাড়া না থেকে থাকে তাহলে উঠে পড়ো না গাড়ীতে!

যাক্‌, খানিকক্ষণের জন্য অন্ততঃ বিশ্রাম মিলবে। দ্বিরুক্তি না করে প্রদীপ নবকিশোরের পাশে উঠে বসল। বিপুলবেগে ছুটল গাড়ী। প্রদীপ দেখল, অটলবিহারী বাবু এতটুকু অত্যুক্তি করেন নি। নবকিশোর গাড়ী চালায় সত্যি বেপরোয়া ভাবে।

—তারপর, কোথায় যাবে? নবকিশোর আবার প্রশ্ন করল।

—জানিনে, কারণ যাবার কোন জায়গা নেই।

—সে কি? তোমার সেই মেস কি উঠে গেছে?

—উঠে নিশ্চয়ই যায়নি, কিন্তু সেখানে যাওয়া চলবে না। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে আমি মেদিনীপুর ফেরতা। আজই কলকাতায় এসেছি।

—ওঃ হোঃ, আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। অনেক গল্প শুনতে হবে তোমার কাছে। তোমরাই দেশের উপযুক্ত সন্তান, প্রদীপদা', আমরা কিছুই করতে পারলাম না। বলে সে সপ্রশংস-দৃষ্টিতে প্রদীপের দিকে তাকাল।

—আমরা কিছুই করতে পারিনি, নবু! হেরে এসেছি।

—হেরে এসেছ না ছাই! আমি ভেতরের অনেক খবর রাখি। দু'তিন সপ্তাহ তোমরা বৃটিশসিংহকে ভয়াকুল করে তুলেছিলে তা আমরা এখানে বসেই শুনেছি।

—তুমি ভুল খবর শুনেছ। মেদিনীপুরে যাঁরা যথার্থ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের দলে আমি ছিলাম না। আমি ছিলাম অন্য এক দলে, আমরা কিছুই করতে পারিনি। যাক্‌ সে কথা, কিন্তু এতসব খবর তুমি পাও কোথেকে?

—ভয় নেই, প্রদীপদা', আমি পুলিশের টিকটিকি নই। আমাকে খবর জোগায় সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর লোক। সে পরে বলব। কিন্তু এখন কি করবে? কোথায় যাবে? শোবে কোথায়?

—আজকের রাতের মত একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার? পরে না হয় কোন বন্দোবস্ত করে নেব।

নবকিশোর খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, ব্যবস্থা ত করে দিতে পারি অনায়াসে, কিন্তু তোমার সেখানে ভাল লাগবে না। জায়গাটা বড্ড নোংরা।

—নোংরা জায়গায় থাকার খুব অভ্যেস আছে। একটা রাত কোন কষ্ট হবে না।

—এ হচ্ছে অন্য রকমের নোংরা। তুমি বুঝবে না।

গাড়ী তখনও উদ্দাম বেগে চলেছে চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়ে। এস্‌প্লেনেড ক্রস করে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুএ গাড়ী পড়ল।

—শোন, এক কাজ করা যাক। ওখানে এক হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, একটা ঘর যদি খালি থাকে তাহ'লে সেখানেই রাতটা কাটিয়ে দিতে পারবে। তাছাড়া তোমার ক্ষিদেও পেয়েছে নিশ্চয়, খাওয়াও পাবে সেখানে।

—কিন্তু আমার কাছে খুবই সামান্য পয়সা আছে, নবু!

—সে ভাবনা আমার। তোমার কাছ থেকে কত স্নেহ পেয়েছি, তার একটু প্রতিদান করবার সুযোগ আমাকে দাও।

ছেলেটা সত্যি পাগল! প্রদীপ আর কোন আপত্তি করল না। গাড়ী এসে দাঁড়াল দ্বিতীয় শ্রেণীর একটা হোটেলের সামনে। প্রদীপকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে নবকিশোর চলে গেল ভেতরে।

মিনিট দশেক পরে বেরিয়ে এসে বলল, সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমার কপাল ভাল, একটি মাত্র ঘর খালি ছিল। আমি বলেছি যে তুমি এখানে দিন তিনেক থাকবে এবং যা বিল হবে আমার জন্যে রেখে দেওয়া হবে। তুমি কিন্তু আবার পেমেণ্ট করতে যেয়ো না।

—তিন দিনের জন্যে ঘর ভাড়া করলে কেন, নবু ?

—তুমি বোঝ না, প্রদীপদা'। তুমি তো বললে কালকেই অন্য একটা ব্যবস্থা করে নেবে, কিন্তু যদি কোন ব্যবস্থা না হয় ? হাতে একটু সময় রাখা ভাল। সত্যি সত্যি যদি তোমার প্রয়োজন না থাকে, যে-কোন মুহূর্তে তুমি ম্যানেজারকে ব'লে ঘর ছেড়ে দিতে পার। ওঃ হো, তোমার সঙ্গে জিনিষপত্র কিছু ছিল না ?

—ছোট একটা ব্যাগ ছিল, সেটা এক দোকানে রেখে বেরিয়েছিলাম।

—দোকান নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে গেছে এতক্ষণে ?

—খুবই সম্ভব।

—একবার চেষ্টা ক'রে দেখব আমরা ? গাড়ীতে আর কতটুকু সময়ই বা লাগবে ?

—আবার গাড়ীতে করে ভবানীপুর পর্য্যন্ত যাবে ? দোকানটা হরিশ মুখার্জ্জি রোডএর ওপর।

—চলো না, দেখে আসি।

নবকিশোর সত্যি নাছোড়বান্দা। কোন কাজে সে ত্রুটি রাখতে চায় না। প্রদীপদা'র থাকবার এমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল, সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে জামা-কাপড়ের অভাবে ?

প্রদীপের সৌভাগ্য দোকান এখনও বন্ধ হয়নি। দোকান থেকে ব্যাগটি আহরণ করে প্রদীপকে 'টাওয়ার হোটেল'-এর ২৪ নং কামরায় বসিয়ে দিয়ে নবকিশোর বিদায় নিল।

পরের দিন প্রদীপ উপলব্ধি করল নবকিশোরের দূরদর্শিতার মূল্য। তাকে প্রথমে যেতে হবে বেলুড়ে, বন্দনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। নিজের মাথা গুঁজবার স্থানের সন্ধানে সে বেরুবে পরে, আজ যদি সম্ভব না হয়, তবে কাল। এই অবস্থায় আরও দু'রাত হোটেলে থাকতে পাবে নিঃসঙ্কোচে, এই অনুভূতিটা আরামদায়ক বই কি !

বেলুড়ে বন্দনার দিদিমার বাড়ী খুঁজে বার করতে প্রদীপের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। শুনল বন্দনা বাড়ীতে নেই, সে গেছে মঠে। অপেক্ষা না ক'রে প্রদীপ হাঁটতে সুরু করল সোজা মঠের দিকে।

মঠের কাছাকাছি এসে বন্দনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রদীপকে দেখে বন্দনা প্রায় নেচে উঠল।

—প্রদীপ, তুমি ফিরে এসেছ? কবে? আমার ঠিকানা কোত্থেকে পেলে? না, এমনি বেলুড়ে বেড়াতে এসেছিলে? এক নিঃশ্বাসে প্রশ্নগুলো করল বন্দনা।

—ধীরে, বন্দনা, ধীরে। এতগুলো প্রশ্নের এক সঙ্গে জবাব দিই কি ক'রে বলত? আচ্ছা চলো, কোথাও বসা যাক।

বন্দনা প্রদীপকে নিয়ে এল গঙ্গার ধারে, ওপারে কলকাতা, অদূরে উইলিংটন ব্রিজে মেশিনগান এবং মিলিটারি সেপাইকে বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল। তারা দু'জনে বসল।

—এবার তোমার প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করি। আমি বেলুড়ে বেড়াতে আসিনি, এসেছি কাজে। কাজটা হচ্ছে তোমাকে কেন্দ্র ক'রে। ঠিকানা পেয়েছি কাকাবাবুর, তোমার বাবার কাছ থেকে। মেদিনীপুর থেকে কলকাতায় ফিরেছি গতকাল। আর কোন প্রশ্নের উত্তর বাকী রইল না ত?

—আমাকে কেন্দ্র ক'রে তোমার আবার কি কাজ? আমার ত ধারণা, আমি তোমার কাজের পরিমণ্ডলের সম্পূর্ণ বাইরে!

—বলতে একটু ভুল হয়েছে। তোমাকে কেন্দ্র ক'রে নয়, তোমার সঙ্গে কাজ।

—ওঃ, তাই বলো।

—ভণিতা না ক'রে সোজাসুজিই ব'লে ফেলি। তোমার বাবা বললেন, আমি নাকি বিপদের মধ্যে টেনে আনছি তোমাদের, কাজেই তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি যেন তোমাদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকি।

—তারপর ?

—তারপর আর কি ? তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তোমার বাবার মাথার ওপর বিপদ টেনে আনবার কোনই অধিকার নেই আমার।

—তুমি কি বলতে চাও, প্রদীপ ? বন্দনা বেশ একটু তিক্ত কণ্ঠেই বলল।

—রাগ করো না, বন্দনা ! আরও একটা কথা তোমার বাবা বলেছেন, তুমি নাকি আমার প্রভাবে এসে বিগড়ে যাচ্ছ, বাবার কথা আদৌ শুনছ না।

—এবার তোমার বক্তব্য শেষ হয়েছে ত ?

—আপাতত—

—তাহ'লে আমার কথাটাও তোমাকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিই। আমি বিগড়ে গেছি কি না জানি না, তবে এটা ঠিক যে আমার মনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রসার হয়েছে বললেই বোধ হয় সুষ্ঠু হ'ত, কিন্তু নিজের সম্পর্কে এতখানি দম্ভ আমি প্রকাশ করতে চাইনা। আর, এর পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী তোমরা কেউ নও, দায়ী আমি সম্পূর্ণ নিজে।

—কিন্তু তোমার বাবা সেটা বিশ্বাস করেন না।

—বিশ্বাস যদি না করেন, আমি নাচার।

—তুমি যা বললে সেটা কি সম্পূর্ণ সত্যি বন্দনা ?

—দেখ, ব্যারিষ্টারি জেরার বিষয়বস্তু এটা নয়, এটা হচ্ছে অনুভূতির কথা। হয়ত আমার অজ্ঞাতে অবচেতন মনে এসে লেগেছে তোমার ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং তা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছে আমার কর্ম্মপদ্ধতি, কিন্তু কারো দৃষ্টান্ত অনুকরণ বা অনুসরণ করবার সক্রিয় প্রয়াস আমি করিনি। তুমি হয়ত একথা শুনে দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি যা অনুভব করছি তাই বললাম।

—দুঃখ পাব কেন ? বরং সুখীই বোধ করছি। তোমার বাবার কথাবার্ত্তা শুনে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হয়েছিল, এখন অপরাধের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামল।

—অপরাধের বোঝাটা এখনও নামেনি। বাবা যে বিপদের কথা বলেছেন, সেটা আমার সম্বন্ধে নয়, তাঁর নিজের সম্বন্ধে, হয়ত আমার দাদার সম্বন্ধে।

—কিন্তু কি বিপদ তাঁর? তিনি ত সরকারের চাকুরী করেন না যে, আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে জানতে পারলেই সরকার তাঁকে ধ'রে জেলে নিয়ে যাবেন?

—তুমি ভেতরের সব খবর রাখনা। অনেক গোলমাল আছে, যার জন্যে বাবাকে আর দাদাকে সর্ব্বদা সামলে চলতে হয়। পুলিশকে তাঁরা ভয় করেন অন্য কারণে, তাই এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে দিতে চান না, যাতে পুলিশের সংস্পর্শে আসতে হয়।

—ঠিক না জানলেও খানিকটা অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এর মধ্যে তোমার দাদার স্থান কোথায়? তার ভাবভঙ্গী দেখে ত মনে হ'ল না সে আমাকে এড়াতে চায়।

ব'লে সে বন্দনাকে জানাল, নবকিশোরের তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গিয়ে হোটেলে প্রতিষ্ঠা করার কাহিনী।

—দাদা এখনও বাবার মত চালাক হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া, সে তোমাকে সত্যিই পছন্দ করে। তার আত্মবোধও বোধ হয় খানিকটা তৃপ্ত হয় যখন সে অনুভব করে দুঃস্থ বা বিপন্ন কাউকে সে সাহায্য করতে পেরেছে। কিন্তু সেও বদলে যাচ্ছে।

—তুমি এই কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বেশী বুদ্ধিমতী হয়ে উঠেছ, বন্দনা। আমিও যেন তোমার নাগাল পাচ্ছি না!

—তাই নাকি?—বন্দনা হাসল।

—হাসির কথা নয়, সত্যি বলছি।—গভীরভাবে প্রদীপ বলল।—আমিও পরিচয় পাচ্ছি অসুন্দর, রূঢ় এক পৃথিবীর। এতকাল বিচরণ করছিলাম কল্পলোকের রাজ্যে, মহাত্মাজীর বর্ণিত পৃথিবীর প্রাঙ্গণে। আমার দৃষ্টি ছিল একচক্ষু হরিণের মত।—সংসার যে কত জটিল, মানুষের মন যে কত দুর্ব্বোধ্য তা বুঝিনি' ততদিন।

—সেজন্ত ক্ষোভ ক'রো না। তোমার মত সবুজ স্বচ্ছ মন ক'জনের আছে? এর সংস্পর্শে এসে আমরা, যারা cynic হয়ে উঠেছি, আনন্দ পাই। এ যেন কৃত্রিম শীতলবায়ু-দ্বারা-ঠাণ্ডা-করা ঘর থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির দক্ষিণা বাতাস উপভোগ করা। তোমার চোখের মায়া-অঞ্জন যতদিন অক্ষুণ্ণ রাখতে পার থাকতে দাও।

—বড় বড় ফিলসফি ত অনেক শুনলাম। এখন আমার কি কর্ত্তব্য বল ত?

—তোমার কর্ত্তব্য? আমাকে বলে দিতে হবে? হাসালে তুমি।

—হাসির কথা নয়, বন্দনা! পলাতক আসামীর মত আমি আর কতদিন ঘুরে বেড়াব? তাছাড়া এই কর্ম্মহীন অলসতা আর সহ্য হচ্ছে না, একটা কিছু করা দরকার।

—অধীর হয়ো না। কর্ম্মব্যস্ত এই পৃথিবীতে তোমার উপযুক্ত কাজ মিলবেই।

—কিন্তু যতদিন কাজের সুযোগ না আসে, ততদিন সময় কাটাই কি ক'রে বল ত? আচ্ছা, তোমার সময় কাটছে কি ভাবে? এখানে ত তোমাকে তোমার বাবার সংসার দেখতে হয় না, তাছাড়া বন্ধুবান্ধবও বিশেষ কেউ আছে বলে ত মনে হয় না!

—প্রথমে আমারও কষ্ট হয়েছিল। তারপর [illegible]লাম, মনের মধ্যে কষ্ট পোষণ করে রাখলে তার লাঘব ত হয়ই না, বরং বেড়ে ওঠে চতুর্গুণ। তাই আমি রোজ আসি মঠে, যাঁরা গৃহত্যাগী অথচ গৃহকে যাঁরা উপহাস করেন না, তাঁদের কথা শুনি। লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়ি, আর মাঝে মাঝে চুপ ক'রে [illegible] ভাবি।

—আমার উচিত তোমার সাহচর্য্যে আমার মনটাকে ডিসিপ্লিন্‌ড ক'রে নেওয়া। কিন্তু তুমি ত তা' হ'তে দেবে না!

তন্দ্রাজড়িত স্বরে বন্দনা বলল, বাধা আমার দিক থেকে নেই, প্রদীপ, বাধা হচ্ছে তোমার অবচেতন মনে। তুমি খুব ভালভাবেই জান, তোমাকে কাছে

পেলে আমি খুশী হই, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেও আমার প্রাণে জাগে পুলকের শিহরণ। কিন্তু তোমার মন এখনও অন্তরথের চাকায় বাঁধা।

প্রদীপ বলল, অনেক দেরী হয়ে গেল, আজ আমি আসি।

—কলকাতায় ফিরে যাবার আদেশ বাবা কখন পাঠাবেন জানি না; তুমি কিন্তু বেলুড়ে আসতে এতটুকু সঙ্কোচ করো না। আর থাকবার কোন ব্যবস্থা যদি করতে না পার, তাহ'লে সোজা এখানে চলে এসো, এখানে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবেই।

আট
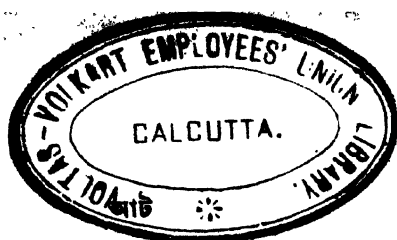
সন্ধ্যার একটু আগেই প্রদীপ ফিরে এল কলকাতায়। হোটেলে না গিয়ে সে সোজা চলে গেল আলিপুরের সেই চা-এর ক্যাবিন-এ।

দেখল, সত্য-সত্যই সন্তোষ সেখানে আছে। আজও তার সামনের চেয়ারটা খালি ছিল, প্রদীপ সেখানেই বসল।

—এই যে যতীন বাবু, আসুন, আসুন। সন্তোষ বলল। তারপর কি খবর? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যে আপনার দেখা পাবো, এ আশা অবশ্য করিনি। সব খবর ভাল ত?

প্রদীপ জানাল তার খবর। আজ আর সে অম্‌লেট্‌-এর অর্ডার দিল না, শুধু এক পেয়ালা চা নিল।

—ক্ষিদে নেই বুঝি?

—বিশেষ না। সংক্ষেপে প্রদীপ জবাব দিল।

—আপনাকে কেমন যেন মনমরা দেখাচ্ছে আজ। বান্ধবীর কাছ থেকে আঘাত পেয়েছেন বুঝি? সকৌতুকে সন্তোষ প্রশ্ন করল।

—সন্তোষ বাবু, আপনার কল্পনাশক্তি খুব প্রখর স্বীকার করছি, কিন্তু সব-সময় নিজের ক্ষমতার উপর এতখানি আস্থা-স্থাপন করবেন না।

—ওরে বাবা, আজ যে আপনি মারমুখো হয়ে এসেছেন! তবে, জানেন কি, সন্তোষ মুখুজ্যে ওতে এতটুকুও বিচলিত হয় না। মানুষ নিয়েই তার কারবার। মানুষকে সে ভালবাসে।

প্রদীপ কোন জবাব দিল না, নীরবে চা পান করতে লাগল।

তারপর হঠাৎ বলল, দেখুন সন্তোষ বাবু, আমার আসল পরিচয়টা আপনাকে দেওয়া দরকার।

চোখ টিপে সন্তোষ ঈশারা করল, খবরদার. এখানে কিছু বলবেন না। চলুন, বাইরে চলুন।

বাইরে এসে বলল, এখন বলুন আপনার বক্তব্য।

—আমার নাম প্রদীপ গুহ, আমি কংগ্রেসের লোক, মেদিনীপুর থেকে এসেছি। এক নিঃশ্বাসে এই স্বীকারোক্তি করে প্রদীপ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

—তা বেশ ত, প্রদীপ বাবু, এর মধ্যে লজ্জিত হবার কি আছে?

—লজ্জার কথা বলছি না, সন্তোষ বাবু! আপনাকে শুধু বলতে চাই যে, আমার পেছনে পুলিশ আছে, আমার সঙ্গে ঘোরাফেরা করলে আপনার বিপদ হতে পারে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে সন্তোষ বলল, বিপদ হবে, না, ছাই! সন্তোষ মুখুজ্যেকে আপনি এখনও চিনতে পারেন নি, এই শর্ম্মা বিপদকে ভয় করে না। তবে, হ্যাঁ, আপনার হয়ত মনে হতে পারে যে আপনাকে ধরিয়ে দেব। একটা কথা বলছি, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি আপনাকে বড্ড ভাল লেগেছে। আপনার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করব না।

প্রদীপ কোন জবাব দিল না।

সন্তোষ ব'লে চলল, আপনাকে একটা কথা বল্‌ব, প্রদীপবাবু?

—বলুন।

—সেদিন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে বল্‌ছি। আপনি খুবই শক্ পেয়েছিলেন মেয়েদের স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণের কাহিনী শুনে! হয়ত বিশ্বাসও করেন নি' আমার কথা। আজ নিজে চোখ-কাণের বিবাদ ভঞ্জন কর্‌বেন?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আর কিছু নয়, আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব একটি মেয়ের সঙ্গে, যার নিজের মুখে আপনি শুনতে পাবেন তার ইতিবৃত্ত। তারপর, আপনিই বিচার করবেন দায়িত্ব বা অপরাধটা কার এবং কতটুকু।

প্রদীপ চুপ করে রইল। সন্তোষের এই অদ্ভুত প্রস্তাব তার মোটেই ভাল লাগছিল না, অথচ মাঝে মাঝে একটা ঔৎসুক্য, তার অপরিজ্ঞাত একটা

জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ, তাকে যেন বল্‌ছিল, এতে কোনই দোষ নেই, তুমি অনায়াসে রাজী হতে পার, প্রদীপ।

সন্তোষ বোধ হয় বুঝতে পারছিল প্রদীপের দুর্ব্বলতা। বল্‌ল, আপনাকে যদিও খুব সামান্যই জানি, প্রদীপবাবু, তবু এ বিশ্বাস আমার আছে যে, আমার প্রস্তাবে যদি আপনি রাজী হন তা হ'বে শুধু নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্যে, কোন অসাধু উদ্দেশ্যে নয়।

—কিন্তু কি ভাবে ব্যবস্থা কর্‌বেন?

—সে ভার আমার। আপনার সম্মতি পেলেই হয়।

—রাজী হবে কি সে? কি লাভ এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করায়? তাছাড়া, সব জ্ঞানই কি অর্জ্জন করতে হবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কষ্টি-পাথরে? একি ছেলেমানুষি করছে সে? না, না, সন্তোষের সংসর্গে আসাটাই ভুল হয়েছে!

—লোকে জান্‌লে কি বলবে তাই ভেবে বুঝি ইতঃস্তত করছেন?

—লোকনিন্দার ভয়? না, সে ভয় প্রদীপের নেই। তবে, তার রুচিবোধে বাধছে।

—এর মধ্যে রুচিবোধের কথা কেন উঠ্‌ছে প্রদীপবাবু? আপনি ত কাউকে শয্যাসঙ্গিনী করতে যাচ্ছেন না, আপনি যাবেন শুধু কয়েকটা কথা বল্‌তে। রোগগ্রস্ত ভিখিরিকে দুটো পয়সা দিতে যদি আপনার রুচিতে না বাধে, তাহ'লে সমাজে কোণঠাসা একটি মেয়ের সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ কর্‌তেই আপনার এত দ্বিধা?

উপস্থিত কোনই কাজ নেই তার হাতে, সন্তোষের বিবৃতিটা যাচাই করে দেখাই যাক্ না কতদূর সত্যি।

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে জানল, তার আপত্তি নেই।

—আপনি তাহ'লে বাইরে অপেক্ষা করুন, আমি রসময়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করে আসি।

সন্তোষ প্রদীপকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল।

পরে এসে বলল, সব ঠিক আছে। আরও ঘণ্টা দুই অপেক্ষা করতে হবে। আসুন, কোথাও খেয়ে নেওয়া যাক্। আমি কিন্তু আপনাকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিয়েই খালাস, আজ রাতে আমার আবার ডিউটি আছে।

রাত আন্দাজ ন'টার সময় সন্তোষ এবং প্রদীপ মোমিনপুরগামী একটা বাস-এ উঠে বসল এবং মিনিট কুড়ি বাদে একটা ষ্টপ-এ নেমে পড়ল।

—এখান থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। ফ্ল্যাটটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আপনার অপছন্দ হবে না।

গ্যাসলাইটের স্তিমিত আলো অনুসরণ ক'রে তারা দুজনে এসে দাঁড়াল দোতলা ছোট একটি দালানের সামনে। নীচে রসময় দাঁড়িয়েছিল, তাদেরই প্রতীক্ষায়।

—রসময় বাবু, এই আমার বন্ধু। আপনি এঁকে ওপরে নিয়ে যান। আমাকে চলে যেতে হবে, ডিপোয় রিপোর্ট করবার সময় হ'ল।

রসময় বলল, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, যতীন বাবু।

প্রদীপ বুঝল, সন্তোষ তার আসল পরিচয় গোপন করে গেছে রসময়ের কাছ থেকে। সে এখন যতীন মজুমদার, প্রদীপ গুহ নয়।

চাবি দিয়ে একটি ঘর খুলে রসময় প্রদীপকে বসতে বলল।—আপনি একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি আসছে।

প্রদীপ বসল। ঘরের এক কোণে টেবিল, গোটা দুই চেয়ার। টেবিলের উপর একটা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প। ওদিকে দেওয়ালের কাছ ঘেঁষে একটা ডিভ্যান্, তার ওপর গোটা দুই-তিন কুশন্। রসময়ের রুচি প্রশংসা করবার মত বটে!

প্রদীপের বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। হঠাৎ খেয়ালের বশে এ কি করছে সে? যদিও সে জানে যে তার উদ্দেশ্য অসাধু নয়, তবু অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের কোন পথ কি খোলা ছিল না?

সে চুপ করে তাকিয়ে রইল দেয়ালে টাঙান স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটার দিকে।

দরজাটা সন্তর্পণে খুলে ঢুকল ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে। পাতলা দোহারা চেহারা, গায়ের রংটা একটু ময়লা। সস্তা প্রসাধন সামগ্রীর সাহায্যে সে চেষ্টা করছে রংটাকে একটু উজ্জ্বল করে তুলতে, খানিকটা সফলও হয়েছে। যুঁই ফুলের মালায় খোপা জড়ানো। মুখে জোর করে টেনে আনা হাসি, তাকে বলা হয়েছে হাসতে হবে, তাই সে হাসছে।

প্রদীপ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে। কি যে বলবে ভাষা খুঁজে পেল না সে। কি বলতে হয় ওদের? সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করা বোধ হয় উচিত ছিল।

—আপনি উঠলেন যে? বসুন। মেয়েটি বলল।

প্রদীপ বসল তার উল্টোদিকে, দ্বিতীয় চেয়ারটিতে।

পাখা বন্ বন্ করে ঘুরছে, কিন্তু প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম। অবশেষে সে প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি?

—ছবি। মৃদুস্বরে মেয়েটি বলল।

—ছবি? দেশ কোথায়?

—বহরমপুরে।

—তোমার বয়স কত? প্রদীপ আবার প্রশ্ন করল।

—ঠিক জানিনে, ষোল সতেরো হবে—

—এখানে কেন এসেছ? প্রদীপ ভর্ৎসনার সুরে বলল।

ভয়াকুল চোখে ছবি প্রদীপের দিকে তাকাল। এ প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে?

নির্ম্মম ভাবে প্রদীপ বলে চলল, কত দিন ধরে এ ব্যবসা চালাচ্ছ? কেন? পয়সার অভাব? হাসপাতালে নার্স এর কাজ করতে পার না অথবা

বাড়ীতে ঝি-এর কাজ? লজ্জা করে না এই ভাবে রাতের পর রাত সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষদের কাছে আসতে, তাদের কাছে তুলে ধরতে তোমায় দেহের সম্ভার?

ছবির চোখ ছলছল করে উঠল। বলল, আপনার বুঝি আমাকে পছন্দ হচ্ছে না?

প্রদীপ আরও রেগে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বলল, পছন্দ হচ্ছে খুবই, কিন্তু যখন মনে করি গতকাল এই প্রশ্ন করেছ আরেক জনকে এবং আগামীকাল করবে সম্পূর্ণ নতুন আর কাউকে, তখন আমার পছন্দ অপছন্দের মূল্য কোথায়, বুঝতে পারিনে।

ছবি কাতর কণ্ঠে বলল, সখ করে আমরা এ পথে আসিনি।

—নাঃ, সখ করে আসোনি। প্রদীপের কথায় তীব্র ব্যঙ্গ। তোমাদের জোর করে আনা হয়েছে, না?

—জোর করে নয়, তবে সখ করেও আসিনি। এসেছি নিতান্তই প্রাণের দায়ে। বলে ছবি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

প্রদীপ লজ্জিত বোধ করল। একটু নরম সুরে বলল, কান্নার কি আছে, ছবি? আমি তোমার বন্ধু, তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে ছবি তার দিকে তাকাল।

—বাড়ীতে তোমার কে আছে?

—বাবা, তিনি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। দুটি ছোট ভাই, বিধবা দিদি, স্কুলে চাকুরী করেন।

—মা নেই?

—মা অনেক দিন মারা গেছেন।

—হুঁ, তাই বুঝি রসময় বাবুর কাছে আত্মসমর্পণ করেছ?

ছবি নীরব।

—দিদি কি জানেন এখানে কি হয়?

ছবি তবু নীরব।

—প্রশ্নের জবাব দাও ছবি ! প্রদীপ আদেশের সুরে বলল।

—ঠিক জানেন না বোধ হয়, তবে বোঝেন নিশ্চয়ই। ছবি এবার জবাব দিল।

—বাঃ, তাহ'লে ত বিবেকের কাছে কোনই জবাবদিহি করতে হয় না। প্রদীপের কণ্ঠে আবার শ্লেষের সুর।

—আপনি কেন বার বার একই কথা বলছেন ? আপনি কি বোঝেন না আমরা কত অসহায় ? তার কথার মধ্যে আর্ত্তনাদের একটা প্রচ্ছন্ন সুর।

—শোন ছবি, যা হবার হয়ে গেছে। এখন তোমাকে এ পথ ছাড়তে হবে, আমি তোমাকে সাহায্য করব।

অবিশ্বাসের চোখে ছবি প্রদীপের দিকে তাকাল।

গভীরভাবে প্রদীপ বলতে লাগল, আমি তোমার কাছ থেকে আর কিছুই চাইনে, চাই শুধু এই প্রতিশ্রুতি যে, রসময় বাবু বা তার লোক যদি ভবিষ্যতে তোমার কাছে আসে, তুমি সোজা বলে দেবে, তুমি আর এখানে আসতে পারবে না। বুঝেছ ?

—কিন্তু ওরা যে বাবার কাছে সব বেফাঁস করে দেবে। ছবির চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া।

—ওদের সে সাহস নেই। বলতে গেলে, ওদের জড়াতে হবে নিজেদের। তোমার ভীরুতার সুযোগ নিয়ে ওরা তোমাকে খেলাচ্ছে, তুমি ওদের কথায় ঘাবড়ে যেয়ো না।

ছবি ঘাড় নাড়ল, কিন্তু প্রদীপের আশ্বাসবাণী তার চেতনার অন্তস্তলে পৌঁছল কি না বোঝা গেল না।

—তোমার ঠিকানাটা আমায় বল, আমি কালই সেখানে যেয়ে সব ব্যবস্থা করে আসব।

ছবির ঠিকানা প্রদীপ একটা কাগজের টুকরোয় লিখে নিল। তারপর বলল, এবার তোমার নিজের কথা বল। আমি শুনতে রাজী আছি।

[illegible] বলবে সে নিজের কথা ? প্রদীপের প্রশ্নবাহিনীর উ[illegible]বা' বলেছে, [illegible]

থেকেই কি প্রদীপ বাকীটুকু বুঝে নিতে পারেনি, পূরণ করতে পারেনি অসম্পূর্ণ পদগুলো?—কাহিনী অতি সাধারণ, অত্যন্ত চিরন্তন। এর মধ্যে না আছে নতুনত্ব, না আছে বৈচিত্র্য।

চুপ ক'রে মুখোমুখি হ'য়ে দু'জনে বসে রইল। ছবি প্রদীপের দিকে ভাল ক'রে তাকাবার সাহসও পেল না।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রদীপ যখন বেরিয়ে এল, তখন সারাটা বাড়ী নিঝুম, আশে-পাশে জনমানবের চিহ্নও নেই।

নয়

হোটেলে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। ফলে পরের দিন প্রদীপের ঘুম ভাঙ্গল বেশ দেরীতে—আটটারও পরে।

প্রথমেই তার মনে পড়ল, হোটেলে মাত্র আর একটি রাত তার মেয়াদ, কাল বিকেলের মধ্যেই তাকে চলে যেতে হবে। অবশ্য ম্যানেজারকে বললে হয়ত সে আরও দু'-এক দিন থাকতে পারে, কিন্তু নবকিশোর কি ভাববে? যে প্রদীপ তিন দিনের ভাড়া গ্রহণ করতে ইতস্তত করেছিল, সে আজ নির্লজ্জের মত নবকিশোরকে বলবে যে, হোটেলে তার আরও কয়েক দিন থাকা দরকার? তা ছাড়া নবকিশোরের যে কোন পাত্তা নেই। প্রদীপ খুব আশা করেছিল যে নবকিশোর অন্তত টেলিফোনে তার খোঁজ নেবে, কিন্তু ম্যানেজার তাকে বলেছেন তার জন্যে কোনই মেসেজ আসেনি'।

ঘাড়ের উপর একটা প্রকাণ্ড দায়িত্ব নিয়েছে সে, ছবির একটা ব্যবস্থা করবেই। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বোধ হয় একটা মাদকতা আছে, তা' এনে দেয় আবেগের ঢেউ, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাজায় স্বপ্নের সঙ্গীত। কিন্তু দিনের রূঢ় আলোয় সে মন্দির রূপায়িত হয় ভগ্নস্তূপে, কল্পনাবিলাসী মন হয়ে ওঠে আহত, ক্লিষ্ট। ছবির দায়িত্ব গ্রহণ করবার কি প্রয়োজন ছিল তার? মুখে বলা সহজ, কাজে পর্য্যবসিত করা কত কঠিন। তার নিজেরই চালচুলো নেই, হাতে একটি পয়সা নেই, আর সে কি না জোগাবে ছবির পাথেয়?

না, লজ্জার মাথা খেয়ে নবকিশোরের কাছে হাত পাততেই হবে।

ম্যানেজারের অফিসে বসে সে নবকিশোরকে টেলিফোন করল।

—আমি প্রদীপ কথা বলছি।

—প্রদীপ দা'? কি খবর? কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত?

—কিছু না, নবু। তবে আমাকে বোধ হয় আরও দিন দুয়েক থাকতে

হবে। নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। ঘরের ব্যবস্থা এখনও করে নিতে পারি নি।

—তা বেশ ত', তুমি ম্যানেজারকে বলে রেখো। আমি গোটা দশেকের সময় ওখানে যাব, সব ঠিক করে দেব! তুমি থাকবে ত?

—থাকব। তোমার সঙ্গে আর একটা বিষয়েও আলোচনা দরকার। হাতে একটু সময় নিয়ে এসো।

নবকিশোর যথাসময়ে এসে হাজির হল।

প্রদীপের ঘরে ঢুকেই বলল, ম্যানেজারকে আমি ব'লে দিয়েছি যে তুমি যতদিন খুসী এখানে থাকবে, বিলটা হপ্তায় হপ্তায় আমার কাছে সে পাঠাবে।

কৃতজ্ঞভাবে প্রদীপ নবকিশোরের দিকে তাকাল। বলল, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য, নবু—

—কি যে বল তুমি, প্রদীপদা'! তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে নবকিশোর বলল। তারপর, কি একটা কথা বলবে বলেছিলে না?

—আমি একটি দুঃস্থ, বিপন্ন মেয়ের ভার নিয়েছি, নবু!

—তুমি? একটি মেয়ের ভার নিয়েছ? সবিস্ময়ে নবকিশোর প্রশ্ন করল। এ যে রীতিমত রোম্যান্স ব'লে মনে হচ্ছে প্রদীপদা'।

—রোম্যান্সই বটে, তবে তুমি যে জাতীয় রোম্যান্স কল্পনা করছ, তা নয়। এই মেয়েটির জীবনে নেমে এসেছে গাঢ় অন্ধকার, তার তপ্ত অশ্রুনীরে শুনতে পেয়েছি অভিশপ্ত করুণ ঝঙ্কার।

সংক্ষেপে সে ছবির কাহিনী বলল।

নবকিশোর খানিকক্ষণের জন্য গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বলল, কি ব্যবস্থা তুমি করতে চাও?

—সেটাই ত' ভাববার বিষয় এবং তোমাকে ডেকেছি সে সম্বন্ধে পরামর্শ করতে। বুঝতেই ত পারছ, ওকে বাঁচাতে হলে এক্ষুণি প্রয়োজন টাকার, তারপর ওর একটা চাকুরী বা লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন প্রদীপদা'? কলকাতার বুকে ও-রকম কত মেয়ে আছে, তুমি কি তাদের সবাকার গার্ডিয়ান্ এঞ্জেল হবে নাকি?

—যেখানে যত অন্যায় হচ্ছে সবটার প্রতিকার করব এ রকম দুরাশা রাখিনে। কিন্তু যে অন্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছে তার বিধান যে করা দরকার। তাছাড়া আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

—তুমি সংসারকে এখনও চেন না প্রদীপদা'। তুমি কি মনে কর তোমার এই মেয়েটি এক কথায় তার রচিত পথ ছেড়ে চলে আসবে? আজ তুমি না হয় টাকা দিলে, হয়ত তার চাকুরী বা লেখাপড়ার ব্যবস্থাও করে দিলে, কিন্তু তার স্বভাবের গতির মোড় সে ফেরাতে পারবে কি?

—কেন পারবে না? বেশ একটু জোরের সঙ্গেই প্রদীপ বলল। বয়স তার খুবই অল্প, মন এখনও কোমল। তাছাড়া, নিতান্ত অভাবের তাড়নায় সে এ পথে নেমেছে।

—এ গল্প ওদের সবাই করে থাকে।

—না, না, এ আমি কিছুতেই মানব না। তুমি আজকাল বড্ড cynic হয়ে গেছ, নবু! সংসারের নির্ম্মম আঘাতে চারিদিকে যে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন উঠছে তাকি তুমি শুন্‌তে পাও না এতটুকু?

নবকিশোর দেখল প্রদীপের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। বলল, বেশ, তোমার হয়ে আমিই এই কাজের ভার নিলাম। আমাকে ঠিকানাটা দাও, আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব।

—সত্যি, ছবির সব ব্যবস্থা করবে তুমি? তুমি মহান, তুমি প্রাণবন্ত, নবু! —গভীর কৃতজ্ঞতায় প্রদীপের স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

—আমি তোমাকে পরে জানাব কি করলাম।

যাক্, কঠিন একটা সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। এবার গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসা যেতে পারে।

তার নির্দ্দিষ্ট সময়ে, অর্থাৎ বেলা আড়াইটার পরে, সে আবার ছুটল

আলিপুরে। গায়ত্রীকে সে আগেই টেলিফোন ক'রে সাবধান ক'রে রেখেছিল যে ঐ সময়ে সে আসবে।

দেখল, গায়ত্রী একাই আছে, কিন্তু তার মুখ অত্যন্ত চিন্তাকুল, ভয়াতুর।

—কি হয়েছে দিদি ?

—খবর বড্ড খারাপ, প্রদীপ। উনি একটু আগে এসেছিলেন, বলে গেলেন দিল্লী থেকে তার এসেছে, মহাত্মাজী নাকি সরকারকে নোটিশ দিয়েছেন ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে অনশন সুরু করবেন, একদিন দু'দিনের জন্যে নয়, পুরো তিন হপ্তা! আজকেই সান্ধ্য কাগজে দেখতে পাবে খবর।

এ কি অসম্ভব কথা! এই বয়সে তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন—এ যে মৃত্যুকে ডেকে আনা।

—কি হবে প্রদীপ ভাই ?

—আমিও বুঝতে পারছিনে দিদি। মহাত্মাজী কেন এই সংকল্প করলেন ? মিঃ কর কিছু বললেন কি ?

—সংক্ষেপে যা বললেন তার চুম্বক এই : গান্ধীজি নাকি বড়লাটের কাছে চিঠি লিখেছিলেন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছে জানিয়ে, উদ্দেশ্য তাঁকে বলা যে সরকার যে কুৎসা রটাচ্ছে তাঁর এবং কংগ্রেসের নামে, সেটা তিনি খণ্ডন করবেন অকাট্য প্রমাণের সাহায্যে। বড়লাট তাতে রাজী হন নি। গান্ধীজি তার উত্তরে জানিয়েছেন যে, তিনি সত্যাগ্রহী, আলোচনার পথ যখন রুদ্ধ করে দেওয়া হ'ল, তখন সত্যকে উপলব্ধি করবেন অনশনের কৃচ্ছ্র-সাধনায়। সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে নির্দ্দেশ এসেছে, তারা যেন সতর্ক হয়ে থাকে, এবার সুরুতেই সব গোলমাল নির্ম্মমভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। শীগগিরই ১৪৪ ধারাও জারি হবে কলকাতার বিশিষ্ট বিশিষ্ট এলাকায়।

—মহাত্মাজী ঠিকই সংকল্প করেছেন দিদি। এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। যার এতটুকু সম্মানবোধ আছে সে নির্ব্বিচারে মেনে নিতে পারে না সরকারের মিথ্যাভাষণ, বিদ্রূপ—

—কিন্তু তিনি না দেবতা? এ যে অভিমান প্রকাশ করা হচ্ছে প্রদীপ। কার সঙ্গে অভিমান?

—তিনি দেবতা নন দিদি, তিনিও রক্তমাংসের মানুষ। তবে আমাদের বিচার বুদ্ধির অনেকে ওপরে তিনি। ক্ষুদ্র, নগণ্য আমরা, সাধারণের মাপ-কাঠিতে তাঁর কার্য্যপদ্ধতি বিচার করা আমাদের শোভা পায় না।

—ঐখানেই তোমরা ভুল কর। কাউকে একবার শীর্ষ স্থানে তুললে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে কোন ত্রুটি, কোন অসঙ্গতি দেখতে পাওনা, দেখলেও চোখ বুজে থাক। দেশের স্বাধীনতা যারা কামনা করে, তাদের প্রথম প্রয়োজন মনের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা।

—অস্বীকার করিনে, কিন্তু দেশের জীবনে এমন সব সঙ্কট মুহূর্ত্ত আসে যখন মনের স্বাধীনতাকেও দিতে হয় দ্বিতীয় স্থান। নেতৃত্বকে মানতে হয়, বন্ধনকে গ্রহণ করে নিতে হয়।

—কিন্তু গান্ধীজি আজ দু'মাসেরও বেশী কারাগারে বন্দী, বাইরের জগতের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ নেই তাঁর। দেশ আজ কি চায়, তা' কি করে বুঝবেন তিনি? তাছাড়া তিনি এটা উপলব্ধি করেন না যে আজ তাঁর মৃত্যু হলে দেশ হয়ে যাবে কর্ণধারহীন?

—আবার তোমাকে বলছি, দিদি, সাধারণের মাপকাঠিতে ওঁকে বিচার করবার মত দুঃসাহস আমাদের যেন না হয়। আর আমি এও বলছি যে, মনে-মনে উনি বিশ্বাস করেন যে এই অনশনও কাটিয়ে উঠবেন। তাঁর কাজ যে এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

—তাই যেন হয় প্রদীপ। আমরা, যারা দূর থেকে তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর লেখা পড়েছি, কিন্তু চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি, কতটুকু বুঝতে পারি তাঁকে?

তারপর বলল, এসব কথা এখন থাক। তোমার খবর ব'ল।

—আমার খবর বিশেষ নেই, তবে বন্দনা কলকাতা থেকে বেলুড়ে চলে গেছে।

—তুমি বেলুড়ে ঘুরে এসেছ নিশ্চয় ? গায়ত্রীর স্বরে কৌতুক।

—হ্যাঁ, গতকাল গিয়েছিলাম। তোমাকে বলতে এসেছি যে অটলবিহারী বাবুদের ওখানে টেলিফোন করলে বন্দনাকে পাবে না।

—সে ত দেখতেই পাচ্ছি। তুমি এখন আছ কোথায় ?

—আপাতত টাওয়ার হোটেলে।

—টাওয়ার হোটেলে ? তুমি ? টাকা পেলে কোত্থেকে ?

—আমার অদৃষ্ট ভাল, দিদি। সেদিন অটলবিহারী বাবুর ওখান থেকে বেরিয়ে ভাবছিলাম কোথায় যাই, এমন সময় তাঁর ছেলে নবকিশোর তার প্রকাণ্ড মোটর গাড়ী নিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। এককালে আমার পরম ভক্ত ছিল, এখনও প্রদীপদা' বলতে অজ্ঞান। সেই আমার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে টাওয়ার হোটেলে।

—বিলটা বুঝি সে পেমেণ্ট করছে ?

লজ্জিতভাবে প্রদীপ জবাব দিল, হ্যাঁ।

—আমার ভাল লাগছে না, প্রদীপ। আমি জানি, তুমি বলবে তোমারও ভাল লাগছে না, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। আমি ভাবছি অন্য কথা। আমি এ-জাতীয় লোকদের চিনি, এরা একটা পয়সাও খরচ করবে না যদি তার প্রতি-দানে কিছু না পায়।

প্রতিবাদের সুরে প্রদীপ বলল, তুমি নবকিশোরের প্রতি অবিচার করছ, দিদি। ওর কোনই অভিসন্ধি নেই—নেহাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল, তাই আমি টাওয়ার হোটেলে এলাম। তা ছাড়া আমার মত পথের ভিখিরির কাছ থেকে কি প্রতিদান সে আশা করতে পারে ?

—সেটা এখন বলা কঠিন, তবে একটু সাবধানে থেকো।

প্রদীপ একবার ভাবল গায়ত্রীর কাছে সে ছবির কথাও বলে, কিন্তু নবকিশোরের প্রতি দিদি বিশেষ প্রসন্ন নয়, কাজেই ছবির কাহিনী আর বলা হ'ল না।

গায়ত্রী বলল, শোন প্রদীপ, এই হোটেলে ত তোমার চিরকাল থাকা চলবে

না। যতদূর মনে হচ্ছে, থাকবার কোন জায়গাই তোমার ঠিক হয়নি। তোমার দিদি যদি একটা ব্যবস্থা করে দেয় তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি? কিছুমাত্র না। সে বেঁচে যায় যদি কেউ তার ভার গ্রহণ করে। কিন্তু দিদির বা মিঃ করের এতে বিপদ হবে না ত?

প্রদীপকে নিরুত্তর দেখে গায়ত্রী বুঝল কোথায় প্রদীপের বাধছে। বলল, তুমি ভেবো না, ওঁকে বাঁচিয়েই আমি তোমার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

তারপর একটু হেসে বলল, তুমি সেদিন বলেছিলে, আই-সি-এস-এর গিন্নীর সঙ্গে ভাব রাখায় লাভ আছে—এবার তার পরিচয় পাবে।

দশ

আলিপুর থেকে বেরিয়ে প্রদীপ সোজা এল কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছে। দেখল, লোকে লোকারণ্য। ব্যাপার কি? না, মহাত্মাজীর অনশন সুরু করবার বিজ্ঞপ্তিসহ খবরের কাগজের সান্ধ্য সংস্করণ বেরিয়েছে এবং লোকে তা কিনছে, পড়ছে আর আলোচনা করছে। একটু বাদেই পুলিশের একটা গাড়ী চলে গেল ট্রাম ডিপোর পাশ দিয়ে, মাইক্রোফোনে চেঁচিয়ে বলে গেল, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে আজ থেকে ১৪৪ ধারা জারী হ'ল, একসঙ্গে পাঁচজন বা তার বেশী যদি জনপথে মিলিত হয় তাহলে সেটা বে-আইনী হবে এবং সরকার প্রতিকারমূলক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ হবে না।

গায়ত্রী যা' যা' বলেছিল ঠিক তা'ই ঘটছে! স্বরাষ্ট্র বিভাগের বড় অফিসারের গৃহিণী ত!

কোথায় সে যাবে এখন? কোনখানে গিয়ে দু'দণ্ড কথা বলতে পারে এমন জায়গার সংখ্যা কত কম। গায়ত্রীর কাছে সে যায় অতি সন্তর্পণে, মিঃ কর যখন থাকেন না সেই সময়টুকুর মধ্যে। আর সেখানে গিয়েও কি সে শান্তি পায়? গায়ত্রীর স্নেহ সে অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। আর বন্দনা? বন্দনার সাহচর্য্য তাকে হয়ত খানিকটা আনন্দ, খানিকটা মুক্তি দিতে পারত, কিন্তু সে যে রয়েছে বহু দূরে। ইচ্ছে করলেই ত' আর বেলুড়ে চলে যাওয়া যায় না। তাছাড়া, বন্দনার আর তার সম্পর্কটা যে কোন্ পর্য্যায়ের তা' এখনও সে ভাল করে জানেনা, জানবার চেষ্টাও করে না!

বড় একা সে। কেন সে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে না এই বিশাল পৃথিবীতে? নবকিশোর, সন্তোষ, অটলবিহারী, এমনকি জ্যোতির্ময়বাবুও বোধ হয় তার মত এমন একা নয়। কেন তার এই একাকিত্ব? নিজেকে

অনন্যসাধারণ মনে করবার মত ধৃষ্টতা তার নেই, তবে এটুকু উপলব্ধি সে করেছে যে কারো সঙ্গে তার খাপ খায় না। এই যে বিরাট জনতা, এর মধ্যেও ত সে মিশে যেতে পারছে না। মেদিনীপুরে যখন সে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতারূপে গিয়েছিল, তখনও কি সে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পেরেছিল বিপ্লবের সমগ্রতার মধ্যে ?

দোষটা সম্পূর্ণ তারই। শৈশব থেকে সে বেড়ে উঠেছে অসীম একাকিত্বের মধ্যে। মা-বাবা বা আত্মীয়ের স্নেহ হয়ত একাকিত্বের এই শৃঙ্খল ভেঙে দিতে পারত, কিন্তু জ্ঞান হ'বার পর অবধি ওপর থেকে বর্ষণোন্মুখ কোন স্নেহই সে পায়নি'। তারপর সে যখন কংগ্রেসের কাজে নামল সেও কি এই একাকিত্বের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তিলাভের আশায়ই নয় ?

সাথীত্ব, সাহচর্য্য ছ'একজন তাকে দিতে চেয়েছে, বন্দনা ছাড়াও—যথা, সুমিত্রা। কিন্তু সেখানেও সে দুরন্ত পলাতক।…সুমিত্রাকে তার ভাল লাগে না, তার মনের খোরাক দিতে সুমিত্রা সম্পূর্ণ অক্ষম।

তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্। ছবির ওখানেই যাওয়া যাক্—নবকিশোর কি ব্যবস্থা করল তা' ছবির মুখ থেকেই শোনা যাক্।

ছবিদের খোলার ঘর খুঁজে বার করতে তার বেশ খানিকটা সময় লাগল রীতিমত বাস্তুহারাদের কলোনি, যদিও সেখানে শুধু বাস্তুহারাই থাকে না, থাকে তারাও, যাদের জীবনের অর্গল শিথিল হয়ে এসেছে। কি অসম্ভব দারিদ্র্যের মধ্যে থাকে এরা, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অথচ, এরাও মানুষ !

ছবিদের ঘর খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু সেখানে কেউ নেই, প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে দরজায়।

পাশের ঘরের দাওয়ায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে হুঁকো টানছিলেন। প্রদীপ তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, এরা গেলেন কোথায় ?

বৃদ্ধ সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে? কি প্রয়োজন আপনার?

—আমি এদের পরিচিত। বিদেশ থেকে এসেছি।

—বন্ধুর অভাব এদের নেই দেখছি। তা আপনি একটু দেরী ক'রে এসেছেন। এরা দেশে চলে গেছে।

—দেশে? কখন? প্রদীপ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

—আজই, এই কয়েক ঘণ্টা আগে। বড় গাড়ী হাঁকিয়ে জমিদার বাবু এসেছিলেন, মশায়, ফিসফিস ক'রে কি সব কথা বললেন, তারপর সবাইকে গাড়ীতে' তুলে নিয়ে চলে গেলেন, মালপত্র সমেত। ঘরের মধ্যে বোধ হয় পড়ে আছে একটা চৌকী আর খানকয়েক বাসন। আমার কাছে চাবিটা দিয়ে বলল যে, ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত আমি যেন একটু নজর রাখি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ? বলল, দেশে, বহরমপুরে। জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ? বলল, বিপদের খবর পেয়েছি, চলে যেতে হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ক'দিন বাদে ফিরবে? বলল, জানিনে, দেশ থেকে চিঠি লিখে জানাব। আমার জিনিষটা মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু আমি বলবার কে? তাছাড়া জমিদার বাবু যেভাবে এদের আগলে রেখেছিলেন তাতে শান্ত ভাবে কথা বলবার সময় পেলাম কোথায়! যাক্ গে, মশায়, পরের ভাবনা ভেবে ঘুম নষ্ট করায় আমার কি প্রয়োজন? চলে গেছে ভালই হয়েছে। যদি ফিরে না আসে তাহলে আমি ওখানেই গিয়ে থাকব। এখানে ত তিলার্দ্ধ জায়গা নেই, একটু পা ছড়িয়ে বসতে পারব!

প্রদীপ বুঝতে পারল, নবকিশোর এসে ছবি এবং তার পরিবারের সকলকে অন্যত্র নিয়ে গেছে, কিন্তু তাকে একবার জানানো উচিত ছিল না কি? বহরমপুরেই গিয়েছে কি না তা'ই বা কে জানে?

এখানে অপেক্ষা করে আর কোন লাভ নেই। চিন্তাকুলচিত্তে প্রদীপ ফিরল টাওয়ার হোটেলে।

হোটেলে ফিরে শুনল, নবকিশোর এসেছিল। তাকে না পেয়ে চলে

গেছে, বলে গেছে পরের দিন বেলা দশটার সময় আসবে, প্রদীপ যেন হোটেলেই থাকে।

প্রদীপ চেষ্টা করল নবকিশোরকে টেলিফোনে পেতে, কিন্তু অটলবিহারী বাবু জানালেন যে নবকিশোর সেই যে সকাল ন'টায় বেরিয়ে গেছে তারপর বাড়ী ফেরেনি। কখন সে ফিরবে বলতে পারেন না, তবে রাত এগারোটার আগে নয়।

সারাটা রাত কাটল দুর্ভাবনায়। পরের দিন যথাসময়ে নবকিশোর এসে হাজির। বলল, কাল সন্ধ্যার একটু পরে তোমার কাছে এসেছিলাম, তুমি ছিলে না, তাই চলে গেলাম।

—ছবিদের কি ব্যবস্থা করেছ তুমি ?—প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—সেই কথাই ত তোমাকে বলতে এলাম। ভেবে চিন্তে দেখলাম, ওদের এখানে রাখাটা সঙ্গত হবে না, কলকাতায় নানা রকমের প্রলোভন, তা ছাড়া রসময়ের লোক হয়ত পেছু নিতে পারে। তাই ওদের তুলে দিলাম ওদের বাড়ীর ট্রেনে। সঙ্গে একশ' টাকাও দিয়ে দিয়েছি এবং বলেছি, সামনের মাসে আবার টাকা পাঠাব, যত দিন না ছবির একটা ভাল ব্যবস্থা করতে পারি।

—ছবি ওদের সঙ্গে যায়নি ?

—নিশ্চয় গেছে ! তুমি আমাকে কি মনে কর প্রদীপদা' ? অভিভাবকহীনা একটি মেয়ের দায়িত্ব কি আমি নিতে পারি ? লোকনিন্দার ভয়ও ত আছে—আমার কথা বলছি না, ছবির কথাই বলছি।

—কিন্তু এ ব্যবস্থা কেমন ধারা হ'ল, নবু ?

—এ সাময়িক ব্যবস্থা, প্রদীপদা'। আমি ছবির নার্সিং ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছি, তবে জানই ত, সময় লাগবে। ব্যবস্থা হয়ে গেলেই ছবিকে চলে আসতে বলব। এখানে থাকবার ওর কোনই অসুবিধে হবে না, নার্সদের

হষ্টেলে অনায়াসে থাকতে পারবে। তা ছাড়া, সরকার অনেক স্কলারশিপ দিচ্ছে, ছবি যাতে তার একটা পায়, সে চেষ্টাও করছি।

—তুমি ওদের বহরমপুরের ঠিকানা লিখে নিয়েছ ত ?

—নিয়েছি বই কি! ঠিকানা না দিলে পরের মাসে টাকা পাঠাব কোথায় ?

তার পর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে সে প্রদীপের হাতে দিল। বল্‌ল, ছবি তোমার কাছে এই চিঠিটা দিয়েছে।

প্রদীপ কাগজের ভাঁজ খুলল। কাঁচা মেয়েলি হাতে লেখা :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার নাম জানি না, তবে নবকিশোর বাবুর কাছে আপনার কথা কিছু কিছু শুনলাম। আপনি যে দয়াপরবশ হয়ে ওঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন, সেজন্য আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম আপনার কাছে। এখন দেশে যাচ্ছি, নবকিশোর বাবু বললেন, আমার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হলে খবর দেবেন, তখন কলকাতায় ফিরে আসব। আশা করি, তখন আবার দেখা হবে।

প্রণতা—ছবি"

না, সে ভুল বুঝেছিল নবকিশোরকে। ভালই ব্যবস্থা করেছে নবকিশোর। সত্যি, ছবির এখন কিছু দিন বাইরে থাকা উচিত—কলকাতার এই বিষাক্ত হাওয়ার পরিবর্তে সে উপভোগ করুক খোলা মাঠের শীতল, নির্ম্মল বাতাস। তার শরীর এবং মন হয়ে উঠুক স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, মুছে যাক্‌ সব ক্লেদ, মালিন্য।

—তুমি যথার্থ মানুষের কাজ করেছ, নবু! গাঢ় ভাবে প্রদীপ বলল।

—কি যে তুমি বল, প্রদীপদা'! নবকিশোর জবাব দিল।

তারপর বলল, ছবি মেয়েটা কিন্তু সত্যি ভাল, প্রদীপদা'।

এগারো

তিন সপ্তাহ পরের কথা। দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। অনশনের অনুশাসন মহাত্মাজী কেটে উঠেছেন নিজের মনের জোরে। তাঁর এই অনশন নিরর্থক হয়নি কোন দিক থেকেই। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের তিন তিন জন ভারতীয় সভ্য পদত্যাগ করেছেন সরকারের নীতির প্রতিবাদ-স্বরূপ। লিন্‌লিথগোর বিরাগ বা অনুরোধ কিছুই তাঁদের বিচলিত করতে পারেনি। আর সুপ্ত ভারতে নতুন একটা সাড়া জেগেছে, যা' শুধু কংগ্রেসী-দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। কংগ্রেসের বাইরে যাঁরা আছেন তাঁরাও অনুভব করেছেন সরকারের হৃদয়হীন নীতির প্রহার।

শেষ মুহূর্তে লিন্‌লিথগোর ব্যঙ্গোক্তির প্রতিক্রিয়া জেগেছে প্রত্যেকটি মানুষের মনে। "আপনার অনশন হচ্ছে পলিটিক্যাল ব্ল্যাক মেল—মৃত্যুকে বরণ করে ভবিষ্যত ঐতিহাসিকের নির্ম্মম বিচার এড়াবার চেষ্টা করেছেন আপনি"—কত হৃদয়হীন, কত কঠোর হ'লে গান্ধীজির মত লোকের সম্বন্ধে এই অভিসন্ধি আরোপ করা সম্ভব!

বারবার প্রদীপ পড়ছিল খবরের কাগজের স্তম্ভে বিশেষ সংবাদদাতার পত্র: "আজ ৩রা মার্চ্চ, ৯-৩৪ মিনিটে মহাত্মাজী অনশন ভঙ্গ করেছেন। সে যে কি পবিত্র মুহূর্ত্ত তা' যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। প্রথমে মহাত্মাজীকে পড়ে শোনান হ'ল গীতা, কোরাণ এবং বাইবেল থেকে কয়েকটি বিশিষ্ট পংক্তি। তারপর নিমীলিত চোখে তিনি প্রার্থনা করলেন। তারপর তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কস্তুরবা তাঁর হাতে এনে দিলেন ছ' আউন্স কমলালেবুর রস—একটি কাঁচের আধারে। কুড়ি মিনিট ধরে মহাত্মাজী সেটা পান করলেন। তার আগে, দুর্ব্বলকণ্ঠে, তিনি ধন্যবাদ জানালেন তাঁর চিকিৎসকদের, যাঁরা এই তিন সপ্তাহ ধরে করেছেন তাঁর পরিচর্য্যা।—"মৃত্যুর

মুখ থেকে যে আমি ফিরে এসেছি তার পেছনে আছে আপনাদের স্নেহ বা প্রীতি। তবে এটাও আমার মনে হয় যে আপনাদের শক্তির চেয়েও বড় কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে ঘিরে ছিল অনুক্ষণ। হয়ত আমাকে দিয়ে দেশের প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। নইলে কেন আমি আবার ফিরে এলাম আপনাদের মাঝখানে?'—তারপর সরোজিনী দেবী ঢুকলেন ঘরে, অভ্যাগত প্রত্যেককে দিলেন কমলালেবুর রস।"

সহজ, স্বচ্ছ বর্ণনা। কিন্তু এর পেছনে আছে কত গভীর অনুভূতি! পড়তে পড়তে প্রদীপের চোখ সজল হয়ে উঠল।

সপ্তাহান্তে প্রদীপ টাওয়ার হোটেল ছেড়ে দিয়েছিল। গায়ত্রী তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তারই এক আত্মীয়ের বাসায়, বরানগরে। সেখানে কেউ তার সঠিক পরিচয় জানতে চায় নি', সে গায়ত্রীর এক জন আশ্রিত এই পরিচয়ই ছিল যথেষ্ট। তবে প্রদীপের আত্মসম্মানে যাতে আঘাত না লাগে সেজন্য গায়ত্রীই বলে দিয়েছিল যে খাওয়া এবং আশ্রয়ের বিনিময়ে সে যেন দিনে দু'ঘণ্টা করে নটবর বাবুর ছেলে দুটিকে পড়ায়। অলস জীবনে এই একটা কাজ পেয়ে প্রদীপও বেঁচে গিয়েছিল।

এর মধ্যে অটলবিহারীদের ওখানে বা বেলুড়ে সে যায় নি'। প্রধান কারণ, মহাত্মাজীর অনশনের মধ্যে তার অবনসরই হয় নি' নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতে। নবকিশোর, সন্তোষ বা সুমিত্রার সঙ্গেও তার দেখা হয়নি'।

যোগাযোগ ছিল শুধু গায়ত্রীর সঙ্গে। সপ্তাহে একদিন করে সে আলিপুরে যেত, তার নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে। ঘণ্টা দুই কথা বলে আবার ফিরে যেত বরানগরে।

মহাত্মাজীর অনশনের অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, এবার প্রদীপ স্থির করল তার বন্ধু এবং পরিচিতদের খোঁজ করবে। ওদিকে গায়ত্রীও তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে সরকারের ধরপাকড় নীতি একটু শিথিল হয়েছে, যতদূর সে জানে

প্রদীপের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগ চাপা পড়ে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে। কাজেই সে এখন খানিকটা সহজভাবে চলা ফেরা করতে পারে।

গায়ত্রীর ওখান থেকেই সে টেলিফোন করল অটলবিহারী বাবুর বাড়ীতে। টেলিফোন ধরল বন্দনা।

—ও কি, তুমি ফিরে এসেছ? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ, হপ্তাখানেক হয়ে গেল। তুমি ত আর বেলুড়ে এলে না, তাই ভাবলাম আমিই কলকাতায় যাই, যদি তোমার দর্শন মেলে। কিন্তু কোথায় তুমি আছ কেউ বলতে পারল না। একমাত্র দাদা বলল, তুমি বরানগরে না কোথায় আছ, তবে তোমার ঠিকানা সে জানে না।

—নবকিশোর ভাল আছে ত?

—খুব ভাল আছে। বন্দনা জবাব দিল। আর আমিও ভাল আছি, তোমার প্রশ্ন করবার আগেই বলে দিলাম।

—এই আবার আমাকে একটা খোঁচা দিলে!

—বাঃ রে, এর মধ্যে খোঁচা কোথায়? টেলিফোনে তুমি শুনছ আমার স্বর, আর কুশল প্রশ্ন করছ আরেকজনের। ভাবলাম, তোমার বোধ হয় সঙ্কোচ হচ্ছে, তাই আমার খবরটা আগে থেকেই জানিয়ে দিলাম।

—বেলুড় থেকে তুমি বেশ মুখরা হয়ে ফিরেছ দেখছি!

—কথা বললেও দোষ? বেশ, আর কথা বলব না। টেলিফোন রেখে দিচ্ছি।

—আমি তোমার ওখানে যাব, বন্দনা?

—স্বচ্ছন্দে, যখন তোমার অভিরুচি। আমি ত সব সময় বাড়ীতেই আছি!

—আজই যাব, বিকেলের দিকে, কেমন?

গায়ত্রী প্রশ্ন করল, বন্দনা ফিরে এসেছে বুঝি?

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।

তিন সপ্তাহ পরে বন্দনার সঙ্গে প্রদীপের এই প্রথম দেখা। অবাক্ হয়ে গেল তাকে দেখে। এই কয়দিনে বন্দনা রীতিমত স্বরূপা হয়ে ফিরে এসেছে, তার চোখে মুখে উজ্জ্বল লালিত্য, গালে এসেছে যৌবনের লালিমা। প্রসাধনের দিকেও যেন তার নজর পড়েছে আগের চেয়ে একটু বেশী।

প্রদীপ বলল তুমি ভারী সুন্দর হয়ে এসেছে কিন্তু—

বন্দনার কান এবং গাল লাল হয়ে উঠল। তারপর একটু হেসে বললে, গায়ে মাংস বসেছে এই ত? তা' শরীরের অপরাধ কি? কাজকর্ম্ম ছিল না, শুধু খাও দাও ঘুমোও। তার উপর দিদিমার সস্নেহ অত্যাচার এবং গঙ্গার হাওয়া। সুখী হচ্ছি একটা জিনিষ লক্ষ্য করে যে আমার শরীরের উন্নতি অবনতির দিকে তোমার নজর পড়েছে।

বন্দনার কথাবার্ত্তায় পরিহাসের সুর।

—তোমার সঙ্গে কথায় পারা যায় না, বন্দনা।

—ঐ দেখ, আবার ঝগড়া সুরু করলে! তোমার খবর বলত এখন?

—প্রথমে ক্ষমা চাইছি বেলুড়ে যেতে পারিনি বলে। মহাত্মাজীর অনশন নিয়ে আমরা সবাই ছিলাম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, এই তিন হপ্তা কোথাও যাইনি।

—আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। বন্দনা বলল।

—তবে হ্যাঁ, তোমার কাছে চিঠি লিখতে পারতাম হয়ত। কিন্তু চিঠি লেখাটা আমার একেবারেই আসে না, শিখে নিতে হবে।

—অজস্র ধন্যবাদ। আমার কাছে চিঠি লিখবার জন্যে নতুন ক'রে এই বিদ্যা আয়ত্ত করবার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, বরানগরে তোমাকে থাকবার ব্যবস্থা কে করে দিল?

প্রদীপ খুলে বলল সব কথা।

—গায়ত্রীদি' ত খুব ভাল লোক দেখছি। আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

—তুমি যাবে, বন্দনা? উনি খুব খুসী হবেন। তোমার কথা ওঁকে বলেছি। [illegible]-স্বরে প্রদীপ বলল।

সন্দিগ্ধভাবে বন্দনা প্রশ্ন করল, আমার কথা ওঁকে বলেছ? কি বলেছ?

—তোমার নিন্দে করিনি', বরং প্রশংসাই করেছি।

—কি রকম প্রশংসা, শুনি?

—সে কি দু'-এক কথায় বলা যায়?

—ওরে বাবা, আমার এত প্রশংসা করেছ যে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছ না।

—ঠাট্টা নয়, বন্দনা, সত্যি বলছি, গায়ত্রীদি' জানেন তোমার আমার সম্পর্কের খানিকটা।

—খানিকটা? তবু ভাল। কিন্তু আমি নিজেই জানিনে তোমার আমার সম্পর্কটা কি। তাই জানতে ইচ্ছে হয় তুমি কি বলেছ।

বিশদ ভাবে বন্দনার কথা গায়ত্রীর কাছে প্রদীপ সত্যি বলেনি। কিন্তু হাবভাব থেকে গায়ত্রী বুঝে নিয়েছিল যে যদি কাউকে ভালবেসে থাকে তাহ'লে সে হচ্ছে একমাত্র বন্দনা। আর বন্দনা যে প্রদীপকে ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে, এ বিষয়ে গায়ত্রীর কোনই সন্দেহ ছিল না।

প্রদীপ জবাব দিল, বড্ড কঠিন প্রশ্ন করলে তুমি। গায়ত্রীদি'র কাছে চল, ওঁর কাছেই শুনবে কি বলেছি।

স্থির হ'ল গায়ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এক দিন বন্দনাকে নিয়ে যাবে প্রদীপ।

একটু পরে অটলবিহারীবাবু এলেন। বললেন, এই যে প্রদীপ, ভাল আছ ত?

—বন্দনা এসেছে খবর পেয়ে দেখা করতে এলাম।

—বেশ, বেশ! তা তুমি এখন থাক কোথায়? নবু বলছিল বরানগরে কোথায় নাকি টুইশনি করছ, তারাই তোমাকে খেতে এবং থাকতে দেয়। তা' নেহাৎ মন্দ নয়, চুপ চাপ বসে থাকার চেয়ে ভাল। গান্ধীজি ত বেঁচে উঠলেন, এখন কি করবেন তিনি?

সবিনয়ে প্রদীপ বলল যে তার মত নগণ্য লোকের পক্ষে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন।

—কেন যে তিনি নিজের জেদ ধরে বসে রয়েছেন! বড়লাট বার বার করে বলছেন, একবারটি ব'লো যে আগষ্ট সেপ্টেম্বরের গোলমালের জন্য দায়ী তোমার কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন, কিন্তু এমন একগুঁয়ে তিনি যে কিছুতেই স্বীকার করবেন না। সমস্ত পৃথিবী বলছে দায়িত্ব সম্পূর্ণ কংগ্রেসের, অথচ উনি বলছেন, না, এর জন্য দায়ী বৃটিশ সরকার। এর চেয়ে হাস্যকর আর কিছু হ'তে পারে?

প্রদীপ কোন কথা বলল না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছিল যে অটলবিহারীবাবুর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, নিজের অভিমত সম্পর্কে তিনি সত্যি সত্যি অটল।

অটলবিহারীবাবু বলে চললেন, আর দেখ ত', এদিকে কি ব্যাপার হচ্ছে! কংগ্রেসী নেতাদের অনুপস্থিতির সুযোগে যত সব ভূঁইফোড় পার্টি তৈরী হচ্ছে রাতারাতি। এই বাংলা দেশে যে অরাজকতা চলেছে একি সম্ভবপর হ'ত যদি সরকারের সঙ্গে কংগ্রেস সহযোগিতা করত?

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ভেতরের খবর রাখ?

—কোন্ খবরের কথা বলছেন?

—কোন্ খবরের কথা আর বলব? দুর্ভিক্ষের খবর। ফাল্গুন মাস চলছে, ফসলের অবস্থা খুবই খারাপ। যা হয়েছে তা'ও কোথায় যেন উবে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত জানি এবার দুর্ভিক্ষ লাগবে বাংলা দেশে। তোমরা, কংগ্রেসের যারা কর্ম্মী, তোমাদের উচিত এর একটা বিহিত করা।

অটলবিহারীবাবুর যুক্তি অকাট্য। কংগ্রেসের যারা নেতৃস্থানীয় তাঁরা পড়ে রইলেন জেলে, অথচ বিহিত করতে হবে তাদেরই, সরকারকে নয়! কিন্তু প্রদীপ সত্যই চিন্তিত বোধ করল। যদি এরকম কিছু হবার সম্ভাবনা থেকে থাকে তার প্রতিবিধান করা দরকার বই কি! সে স্থির করল গায়ত্রীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবে।

বারো

গায়ত্রীর ওখানে গিয়ে দেখে, যেন এক মহোৎসবের আয়োজন চলেছে। বয় বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে, বাংলোর বিশাল লন্‌এ অন্ততঃ দশ বারোখানা টেবিল পাতা হয়েছে, তার ওপর সাজানো হচ্ছে সুদৃশ্য প্লেট, চায়ের পেয়ালা-পিরিচ, আর রকমারী খাদ্যসামগ্রী। গায়ত্রী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে—ফুলদানিগুলোতে মৌসুমি ফুল সাজান হয়নি কেন? প্রত্যেক টেবিলে কাগজের ন্যাপ্‌কিন্‌ রাখতে হবে, ভুল যেন না হয়। আইসক্রীমের ব্যবস্থা ঠিক আছে ত?

—এই যে, প্রদীপ, আজ ভাই তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারব না। সাড়ে তিনটা বাজল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই উনি এসে পড়বেন, আর পাঁচটা থেকে অভ্যাগতেরা আসতে সুরু করবেন।

—ব্যাপার কি দিদি!

—টি-পার্টি হবে, কলকাতায় আসার পর অবধি কত জায়গায় খেয়ে বেড়িয়েছি, তার প্রতিদান দিতে হবে ত'! উনি আবার ককটেল পার্টি পছন্দ করেন না, তাই টি-পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ককটেল না রাখার ক্রটিটা অন্যদিক দিয়ে পুরিয়ে দিতে হবে কি না।

বেয়ারা বোধ হয় ভুল করে একটা টেবিলে খুব সাধারণ ফুলদানি রাখছিল। গায়ত্রী হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, কতবার তোমাকে বলেছি আবদুল, ওটা হচ্ছে বিশিষ্ট এবং সম্মানিত অতিথিদের টেবিল। ওখানে আমাদের ড্রইংরুমের রূপোর ফুলদানিটা রাখো, আর নার্স'রি থেকে গোলাপী আর হলুদ ডালিয়াগুলো দিয়ে গেছে, তা' সবই যাবে ঐ টেবিলে। প্লেট পেয়ালা পিরিচ, কাঁটা-চামচ সবই যেন আমাদের সেই স্পেশ্যাল সেট থেকে দেওয়া হয়।

তারপর একটু লজ্জিত ভাবে প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, চীফ সেক্রেটারী আসবেন কি না, তাই একটু বিশিষ্ট আয়োজন করতে হচ্ছে।

গায়ত্রীর এই রূপ এর আগে কখনও প্রদীপের চোখে পড়েনি'। সে বুঝতে পারল, গায়ত্রী যে পরিমণ্ডলে চলাফেরা করে, সেখানে দুর্ভিক্ষ কেন, যে-কোন অভাবও যেন দুঃস্বপ্ন।

তবু প্রদীপ কথাটা উত্থাপন না ক'রে পারল না। বলল, আমি শুনে এলাম দিদি, বাংলা দেশে নাকি দুর্ভিক্ষ আসছে।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে গায়ত্রী জবাব দিল, যতসব আজগুবি খবর। আজকাল-কার দিনে দুর্ভিক্ষ কখনও হ'তে পারে? বাংলা দেশে অজন্মা যদি হয়ে থাকে, অন্য জায়গা থেকে চাল আসবে। চালের জন্য ত আমাদের বিদেশ থেকে আমদানীর ওপর নির্ভর করতে হয় না। তবে, হাঁ, যুদ্ধের জন্যে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে এবং বাড়ছে তা' ত আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু একে দুর্ভিক্ষ বলা চলে না।

তা বটে! সাধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ চালের দাম দুগুণ-তিনগুণ বেড়েছে, আরও বাড়বে, একে দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞায় ফেলা শুধু অনুচিত নয়, অত্যন্ত অশোভন। এ হচ্ছে দুর্মূল্য, ডিম্যাণ্ড আর সাপ্লাইএর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া! সন্তোষও যেন এই জাতীয় কি একটা কথা বলেছিল না, ছবির কথা বলতে গিয়ে?

বলল, আজ তোমায় বিরক্ত করবনা, দিদি। চললাম।

—কোন কাজের কথা ছিল কি?

—না, এমনি এসেছিলাম।

—বরানগরে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত?

—কিছুমাত্র না। তুমি যে এই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছ সেজন্য তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছি।

—কি আর করেছি? আচ্ছা, এসো।

প্রদীপ চলে যাচ্ছিল, গায়ত্রী হঠাৎ তাকে ডাকল। বলল, একটু কিছু খেয়ে যাবে না? সবই প্রায় তৈরী হয়ে গেছে।

প্রদীপ হেসে বলল, আজ থাক দিদি। তাছাড়া তোমার বেয়ারারা মোটেই খুশী হবে না, যদি এই নানা ঝামেলার মধ্যে আমার জন্ম আলাদা ক'রে প্লেট সাজাতে হয় এখন।

অটলবিহারীবাবুর কথাগুলো তার মনের শক্তি অপহরণ করে নিয়েছিল। সে কেবলই ভাবছিল, দেশের এই পরিস্থিতির সঠিক আভাস কার কাছ থেকে পাওয়া যায়। জ্যোতির্ম্ময়বাবু এখনও জেলে, গায়ত্রীদি' বা মিঃ কর ত দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা কল্পনাই করতে পারেন না, নবকিশোরকে এ প্রশ্ন করার কোনই অর্থ হয় না।

বরানগরে ফেরবার পথে বাস-এ তার হাতে এসে পড়ল এক হ্যাণ্ডবিল। সরকারী ইস্তাহার। বাংলা সরকার লক্ষ্য করছেন যে, কিছুদিন ধরে একশ্রেণীর লোক রটিয়ে বেড়াচ্ছে যে দেশে চাল নেই, দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বাংলা দেশে এবার ফসল কিছু কম হয়েছে সরকার অস্বীকার করেন না, কিন্তু ঘাটতি পূরণ করবার জন্মে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরী করে রেখেছেন, প্রয়োজন হলেই তা' অবলম্বন করা হবে। তাছাড়া, সারা ভারতের ষ্ট্যাটিসটিক্স খতিয়ে দেখা গেছে যে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরে ধান বা গম এতটুকু কম হয়নি। কাজেই যারা মিথ্যা অথবা আজগুবি রটনা করছে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনসম্মত উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন।

ষ্ট্যাটিসটিক্স? ঘাটতিপূরণ করবার জন্মে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা? তাহ'লে অটলবিহারীবাবু কি জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছেন?

প্রদীপ স্থির করল সুমিত্রার কাছে যাবে, তার সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করবে।

সুমিত্রা বোধ হয় একরকম আশাই ছেড়ে দিয়েছিল যে প্রদীপ আসবে। তাই সে সত্যি অত্যন্ত পুলকিত হ'য়ে উঠল প্রদীপের আগমনে। স্থির করল, অভিমানসূচক কোন ব্যবহার সে করবে না। স্নেহ যেখানে নেই, সেখানে

অভিমানপ্রকাশ রুদ্ধ দুয়ারে বিফল আঘাত করা মাত্র। মেদিনীপুরে যাবার প্রাক্কালে প্রদীপের ব্যবহার সে ভোলেনি।

খুব শান্তভাবে প্রদীপকে সে অভ্যর্থনা করল।

—অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল, সুমিত্রা। কিন্তু নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অপরের চিন্তা করবার অবসরই হয় নি'।

এর উত্তরে সুমিত্রা হয়ত অনেক কিছুই বলতে পারত, কিন্তু সে শুধু বলল, তাতে আর কি হয়েছে? আমারও উচিত ছিল তোমার খবর নেওয়া, আমিও কর্ত্তব্য অবহেলা করেছি।

—না, না, তুমি হচ্ছ একা, মেয়ে। তাছাড়া, আমার চালচুলোর কোন স্থিরতা নেই, আমার খবর নেবে কি ক'রে?

—ওসব কথা থাক্। এবার তোমার কথা বল।

—আমি? আমি বেশ ভালই আছি। মেদিনীপুর থেকে এসেছি আজ মাস তিনেক হতে চলল। প্রথমটায় গা'ঢাকা দিয়েছিলাম, এখন দিবালোকে এবং প্রকাশ্যস্থানে একটু-আধটু বার হতে সুরু করেছি।—আচ্ছা, তোমার বাবার খবর পাও ত?

ম্লান মুখে সুমিত্রা জবাব দিল, হ্যাঁ, পাই, আজকাল মাসে একখানা ক'রে চিঠি লিখবার এবং পাবার অনুমতি পেয়েছি। এই ত পরশুদিন তাঁর চিঠি পেয়েছি, মোটের উপর ভালই আছেন লিখেছেন।

—কোন্ জেলে আছেন তিনি?

—সেটা জানবার উপায় নেই, কারণ, কর্ত্তৃপক্ষ সে খবরটা সেন্সর করেন। তবে যতদূর শুনেছি, তিনি আছেন দমদম সেন্ট্রাল জেলে।

—তার মানে বাইরের কারোর সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ?

—একরকম তাই বইকি!

—তুমি একাই বাড়ী দেখাশুনো করছ?

—সহায়ক কোথায় পাব? তবে নবকিশোরবাবু, বন্দনার দাদা, মাঝে মাঝে আসেন, খবর নেন।

—আমি যদি কোন বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারি জানিয়ো।' আমি আছি বরানগরে।—সুমিত্রাকে প্রদীপ তার ঠিকানাটা বলল।

—আমি জানি, নবকিশোরবাবুর কাছে শুনেছি।—ঠিকানাটা অবশ্য বলতে পারেন নি', তবে তুমি যে বরানগরে আছ সে কথা বলেছেন।

প্রদীপ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল।

সুমিত্রা প্রশ্ন করল, মহাত্মাজীর অনশনের আরম্ভে তুমিও অনশন করেছিলে ত প্রদীপ ?

লজ্জিত ভাবে প্রদীপ জবাব দিল, না ত !

—আমি করেছিলাম। মনে হল, এটুকুও যদি না করি, তবে মিথ্যাই আমরা তাঁকে করি শ্রদ্ধা, নিজেদের পরিচয় দেই সত্যাগ্রহী বলে। সুমিত্রার কথায় একটা তীক্ষ্ণ তিরস্কারের সুর প্রচ্ছন্ন।

আবার প্রশ্ন করল, তুমি কি আজকাল কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছ নাকি ?

—না, কেন ?

—এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

—কংগ্রেস ছেড়ে দেবার কোনই প্রশ্ন ওঠে না। আমরা যারা বাইরে আছি, আমাদের সমস্যা আরও জটিল। কি করব আমরা ? কে পথ দেখাবে ? তাছাড়া কিছু করবার সুযোগ কোথায় ?

আত্মসমর্থনে এই কথাগুলো প্রদীপ বলল বটে, কিন্তু নিজেরই কাছে সেগুলো অত্যন্ত প্রাণহীন, নিঃসাড় বলে মনে হল !

—সুযোগ যথেষ্ট আছে প্রদীপ। দেশে দুর্ভিক্ষ আসছে শোননি ? তোমরা কেন জনমত গড়ে তোল না, যাতে সরকার বাধ্য হন উপযুক্ত সতর্ক ব্যবস্থা করতে ? তাছাড়া, তোমাদের উচিত দেশদ্রোহী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিরাট ক্যাম্পেন চালানো।

—কিন্তু তুমি ঠিক জান দুর্ভিক্ষ আসছে ?

—হাসালে তুমি। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে এই প্রশ্ন আশা করিনি।

—আবার একটা তিরস্কার। প্রদীপ নীরবে হজম করল।

—কল্পনা বিলাস ছেড়ে বাস্তবের রাজ্যে ফিরে এসো প্রদীপ। কংগ্রেসকে বিশ্বাস করতে শেখো, কংগ্রেস মিথ্যে কথা বলে না।

—এর মধ্যে কংগ্রেস এল কোথায় ?

—এর মধ্যে কংগ্রেস এল কোথায় ? বেশ একটু তীব্র ভাবেই সুমিত্রা বলল। কংগ্রেসের শীর্ষস্থানে যাঁরা, তাঁদের মুখ হয়ত বন্ধ করে দিয়েছেন সরকার, কিন্তু জনসাধারণ কি বলছে ? জনসাধারণই এখন আমাদের কংগ্রেস।

তারপর একটু ধীরে সুমিত্রা বলল, তুমি যখন মেদিনীপুরে যাও তখন আমি আশা করেছিলাম তুমি জয়ী হবে। জয়ী না হতে পারলেও, পরাজয়ের কলঙ্ক-তিলক নিয়ে কলকাতায় ফিরবে না। আমি দুঃখিত হয়েছি বইকি !

—আমিও দুঃখিত সুমিত্রা।

—যাক্, এসব আলোচনা করে কোন লাভ নেই। আমার অনুরোধ শুধু এই যে, বাবার কাছে যে দীক্ষা তুমি নিয়েছো তার অমর্য্যাদা করো না। আপ্রাণ চেষ্টা করো কংগ্রেসের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে।

তেরো

প্রদীপ বরানগরে ফিরল ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। সুমিত্রা ঠিকই বলেছে, এ কি অলস অবহেলায় সে নষ্ট করছে অমূল্য মুহূর্ত্তগুলো? কাজ? কাজের কি কোন অভাব আছে? অভাব যদি থেকে থাকে সে হচ্ছে তার ইচ্ছার, তার উন্মাদনার। শৃঙ্খলিত দেশ প্রত্যেকটি নরনারীর কাছ থেকে আশা করে ত্যাগ, নিঃস্বার্থ এবং নিষ্কাম কর্ম্ম। নিজের কথা না ভেবে তার ভাবা উচিত দেশের কথা।

বন্দনাই কি অবশেষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে? সুমিত্রা মুখে কিছু বলেনি বটে, কিন্তু তার তিরস্কারের পেছনে এই ইঙ্গিতটাই কি বার বার দেখা দেয়নি? বন্দনা ত কোন বিষয়েই তার প্রতিবন্ধক হয়নি! প্রেরণা হয়ত জোগাতে সে পারেনি, কিন্তু, কিন্তু—

আরেকজনের কথা হয়ত উঠতে পারে, সে হচ্ছে তার গায়ত্রী দিদি। কিন্তু সে-ও ত কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। বরং তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছে নানা ভাবে। অথবা, এই সাহায্যটাই কি প্রকারান্তরে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেছে? আজ যদি বরানগরে এই ভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে না পেত, তাহলে কে জানে, নতুন এক অভিযানে সে ঝাঁপিয়ে পড়ত কি না!

হঠাৎ তার মনে পড়ল ছবির কথা। ছবিকে যে নতুন পথে তুলে দিতে পেরেছে—নবকিশোরের সাহায্য না পেলে হয়ত সেটা সম্ভব হতনা—এটাও কি একটা কাজ নয়? কাজ কি সবসময় হতে হবে নির্ব্যক্তিক? না, ভুল সে করেনি। তবে ভাববার, চিন্তা করবার সময় এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে সে এল আলিপুরে, রসময়ের চা'-এর ক্যাবিনে সন্তোষ বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রদীপকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

—এই যে, প্রদীপ বাবু! সেই রাতের পর আর যে দেখাই নেই! কাজ হাঁসিল করে একেবারে পলায়ন! আপনার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি।

—আপনি ভুল বুঝবেন না, সন্তোষ বাবু! নানা জঞ্জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আপনাকে এড়িয়ে চলবার মতলবই যদি আমার থাকবে আজ আবার এদিকে আসব কেন?

কথাটা অযৌক্তিক নয়, সন্তোষ একটু শান্ত হল। তারপর বলল, আপনার পেটে পেটে যে এমন বুদ্ধি আছে তা ভাবিনি, আপনার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে!

—তার মানে?

—মানে আর কি? ছবিকে কোথায় সরিয়েছেন বলুন ত? রসময় ত আমার উপর রেগেই টং! বলল, তোমার সেই বন্ধুকে ছবির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ফলে তাকে চিরদিনের মত হারালাম! দুদিন পরে ছবির বাড়ীতে গিয়ে শোনে, কোন্ এক ভদ্রলোক নাকি তাদের অন্যত্র নিয়ে চলে গেছেন। আমি তখনই আন্দাজ করলাম কে এই ভদ্রলোক!

প্রদীপ মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসল। রসময়ের হাত থেকে ছবি মুক্তি পেয়েছে, এবং এই মুক্তি পাওয়ার মধ্যে তার অবদানই সবচেয়ে বেশী, এটা আনন্দের বিষয় বই কি।

বলল, আপনি ভুল করছেন, সন্তোষ বাবু। সেই রাতের পর ছবির সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি এ পর্য্যন্ত। আমি ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গেও ছবির পরিচয় ছিল সেটা ভুলে যাবেন না। তাঁদেরই কেউ হয়ত রসময়বাবুর প্রসারিত বাহুবন্ধন থেকে ছবিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন।

তারপর বলল, আপনাকে আরেকটা গোপনীয় কথা বলি! পরের দিন আমি নিজে ছবির ওখানে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি, পাখী আমি পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টা আগেই উড়ে গেছে।

—বলেন কি?

—সত্যি বলছি।

—ডুবে ডুবে বেশ জল খেতে পারেন ত আপনি? কিন্তু এই ভদ্রলোককেও প্রশংসা না করে পারছি না। এক ঢিলে কেমন তিন পাখী মারলেন, ছবিকেও পেলেন, রসময় এবং আপনাকে কদলী প্রদর্শন করালেন।

মুখখানা কালো ক'রে প্রদীপ জবাব দিল, অদৃষ্ট মন্দ, সন্তোষবাবু, নইলে এমন হবে কেন?

—ছবি মেয়েটা বেশ ছিল, কি বলেন? সন্তোষের কথার মধ্যে উদ্দাম লালসার প্রকাশ।

রাগে প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল, কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সম্বরণ করে সে জবাব দিল, সে আর বলতে হয়?

দুদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে নবকিশোরের সঙ্গে প্রদীপের দেখা, চৌরঙ্গীর মোড়ে। নবকিশোর প্রথমে তাকে দেখতেই পায়নি, প্রদীপই তাকে ডাকল।

—আরে, এই যে প্রদীপদা'। সেই বরানগরে যাবার পর অবধি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে রয়েছ দেখছি, দেখাই পাওয়া যায় না।

—বরানগর কলকাতার বাইরে, নবু! খুসী হ'লেই ত আসা যায় না।

—জানো, আমি নতুন গাড়ী কিনেছি? আমার এই গাড়ীতে তোমাকে চড়তেই হবে। নবকিশোর বলল।

—কেন, তোমার সেই গাড়ীটার কি হল? সেটাও ত বেশ নতুন ছিল!

—আরে ছোঃ, সেটা ছিল সেভরোলে, তা'-ও তিন বছরের পুরানো। এবার কিনেছি বুইক, লেটেষ্ট মডেল। ওঃ, যা' স্পীড নেয়, যেন তুফানের মত চলে!

—তোমার গাড়ী চালান দেখে আমার ভয় করে।

—পাগল! গাড়ী একটু তাড়াতাড়ি চালাই বটে, কিন্তু ষ্টিয়ারিংএর ওপর কণ্ট্রোল আছে পুরোমাত্রায়। তুমি খানিকক্ষণ দেখলেই বুঝতে পারবে।

—আজ থাক্।

নবকিশোর যেন একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল। বলল, তোমার এক কথা, আজ থাক্। —আজ থাক্ ত কবে হবে? কোথায় তোমার দেখা পাব?

—কেন, তোমাদের বাড়ীতে আসতে পারি। আর যদি বল, তুমি যেখানে কাজ কর সেখানেও যেতে পারি।

নাকটা সিঁটকে নবকিশোর জবাব দিল, বাড়ী? আমাদের বাড়ীকে আমি ঘৃণা করি। নোংরা, সেকেলে, কোন ভদ্রলোক সেখানে থাকতে পারে? তাছাড়া, সব সময় জবাবদিহি করতে হয় বাবার কাছে, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন দেরী হ'ল।—কেন, আমি কি কচি খোকা নাকি?

তারপর বলল, বোঝার উপর আবার শাকের আঁটি। আজকাল তোমার বন্দনাও বাবার সঙ্গে সমান ওজনে গলা মিলিয়ে গতিবিধির বিশদ বিবরণ চায়।

'তোমার' এই কথাটার উপর নবকিশোর যেন ইচ্ছে করেই একটু জোর দিল। প্রদীপ ভাণ করল যেন সে শোনেনি।

—তাহ'লে তোমার অফিসেই যাব না হয়।

—সেখানেও আমাকে পাবে না, আমার সময়ের কোন স্থিরতা নেই, কখন আসি, কখন যাই। আমার বেশীর ভাগ কাজই বাইরে।

—কি কাজ তুমি কর, নবু?

—হরেক রকমের কাজ। কনট্রাক্ট নেওয়া, জিনিস কেনাবেচা করা, সরকারী গুদামে মাল চালান দেওয়া।—আমার দু'জন মোটা মাইনের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট আছে, তাছাড়া একজন এংলোইণ্ডিয়ান মেয়ে রিসেপসনিস্টও রেখেছি। জানই ত, আজকাল ইংরেজ আর আমেরিকানদের নিয়ে কারবার—সুন্দরী মেয়ে রিসেপসনিস্ট রাখলে কাজের সুবিধে হয়।

-আমাকে তোমার ওখানে একটা চাকুরী দাও না, নবু।—প্রদীপ হঠাৎ বলল

নবকিশোর যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, চাকুরী করবে তুমি? না, প্রদীপদা, চাকুরী তোমাকে দিয়ে হবে না। চোখ-কান বুজে মনিবের হুকুম তামিল করতে তুমি পারবে না।—চাকুরী মানে গোলামি, নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে প্রভুর ইষ্ট কিসে হয় তার আরাধনা করা!

চাকুরীর এই সংজ্ঞায় প্রদীপ না হেসে পারল না।

—হাসছ তুমি, কিন্তু যা' বললাম তা' একবিন্দু মিথ্যে নয়। সরকারী ক্ষেত্রে দেখছ না, আমাদেরই দেশের লোকগুলো কি নিঃসঙ্কোচে বিদেশী সরকারের হুকুম মেনে যাচ্ছে! অর্ডার এল, গুলী চালাও—অমনি চলল গুলী। উপরওয়ালা বললেন, সার্চ্চ কর, গ্রেপ্তার কর।—অমনি সুরু হ'ল সার্চ্চ, গ্রেপ্তার।—কেউ একবার ভাবছে না, চিন্তা করছে না।—মনিবের হুকুম তামিল করা চাকুরীর একটা প্রধান অঙ্গ, কিন্তু তাই বলে এমন নির্ব্বিচারে!

—কিন্তু তুমিই না বললে, চোখ-কান বুজে মনিবের হুকুম তামিল করাটা চাকুরীর প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য?

—দুটো ক্ষেত্রে তফাৎ আছে প্রদীপদা'। বিদেশী সরকারের হুকুম বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়াটা কিছুতেই আমাদের উচিত নয়, বিশেষ করে হুকুম তামিল করতে গিয়ে যদি দেশের লোকের উপর অত্যাচার করতে হয়। কিন্তু ধর, আমার অফিসে যারা চাকুরী করছে তারা ত আর বিদেশীর হুকুম মানছে না। তাদের হুকুম দিচ্ছে তাদেরই একজন, শ্রীনবকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কর্ম্মচারীদের এবং আমার স্বার্থ অভিন্ন।

—তোমার যুক্তিটা আমি মেনে নিতে পারলাম না নবু!

—সেইজন্তেই ত বলেছি প্রদীপদা, চাকুরী করা তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি হচ্ছ বড্ড স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তোমার উচিত বনে গিয়ে ভগবানের আরাধনা করা। আচ্ছা, এতদিন কংগ্রেসের চাকুরী তুমি কি করে করলে?

—কংগ্রেসের চাকুরী ?

—চাকুরী ছাড়া আর কি ? তোমার নেতারা যা বলেছেন তা' নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া এবং প্রাণপণ করে তা পালন করা চাকুরী নয়ত কি ?

—আমার ধারণা ছিল কংগ্রেসের প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে।

—সহানুভূতি নেই কে বলল তোমাকে ? অসহিষ্ণুভাবে নবকিশোর জবাব দিল। আমি শুধু প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি যে সবই চাকুরী।

—তুমি আজকাল বেশ ভাবতে শিখেছ দেখছি !

—ঠেকে শিখেছি, প্রদীপদা'। থাক এসব আবোল-তাবোল বক্তৃতা, সত্যি তুমি আজ আমার সঙ্গে আমার নতুন গাড়ীতে আসবে না ?

—আরেক দিন হবে। তোমার গাড়ী ত উড়ে যাবে না।

—তা' বলা যায় না, একটা মস্ত ডিল নিয়ে পড়েছি, যদি লেগে যায় তাহলে বুইকটা বিক্রী করে একটা ক্যাডিলাক কিনব। তা বেশ, তুমি ক্যাডিলাকই চড়ো—

প্রদীপ প্রশ্ন করল, ছবির কোন খবর পেয়েছ ?

—ছবি ? ওঃ, তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছিলাম। ও যে এখন কলকাতায়, গত হপ্তায় এসেছে।

—কোথায় আছে ? কি করছে ? প্রদীপের প্রশ্নে নিবিড় ঔৎসুক্য।

—ধীরে, প্রদীপদা, ধীরে। ওকে পি. জি. হাসপাতালে নার্স-এর ট্রেণিংএর ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ওখানে নার্সদের কোয়ার্টারে থাকে।

—স্কলারসিপ পেয়েছে ?

—এখনও পায়নি, তবে সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট আশা দিয়েছেন, খুব সম্ভব পাবে। যতদিন না পায়, আমিই খরচ জুগিয়ে যাব বলেছি। আর ওদিকে ওর বাড়ীতেও টাকা পাঠাচ্ছি।

—তোমার মনটা সত্যি বিশাল, নবু।

—বিশাল মোটেই নয়, অত্যন্ত সাধারণ আমার মন ! তোমাদের আশীর্ব্বাদে ব্যবসায়ে লাভ মন্দ হচ্ছে না, তার সামান্ত একটা অংশ যদি একটা

দুঃস্থ পরিবারের কল্যাণে খরচ করতে না পারি, তাহলে বৃথাই রোজগার করছি।

—সবাই কিন্তু তোমার মত ভাবে না, নবু।

নবকিশোর এবার একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

প্রদীপ বলল, আমি একবার ছবিকে দেখতে যাব। কখন গেলে ওর সঙ্গে দেখা পাওয়া যাবে বলত ?

—তুমি আর ওখানে গিয়ে কি করবে, প্রদীপদা' ? সে বেশ আছে, তাছাড়া আমিই ত দেখাশুনা করছি!

—তবু একবার দেখব, কেমন আছে, নতুন জীবন তার কেমন লাগছে।

—একটা অসুবিধে আছে। নার্সদের কোয়ার্টারে বড় কড়াকড়ি, আত্মীয় এবং বিশেষ বন্ধু ছাড়া ওখানে কাউকে ঢুকতেই দেয় না!

—তুমি কি ভাবে যাচ্ছ ?

—আমি ? কেন, আমি বলেছি যে আমি তার দাদা, স্থানীয় অভিভাবক।

—আমিও ঐ জাতীয় একটা পরিচয় দেব না হয়!

—বোকামি করো না, প্রদীপদা', ওতে কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হবে।

প্রদীপ চুপ করে রইল। খানিকক্ষণ চিন্তা ক'রে নবকিশোর বলল, এক কাজ করা যাক্, প্রদীপদা। একটু পরেই ছবির অফডিউটি, তুমি আমার গাড়ীতে চলো, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসব, তারপর আমার গাড়ীতে, নতুবা অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলবে! কেমন ?

অগত্যা প্রদীপ এই প্রস্তাবেই রাজী হ'ল।

নবকিশোরের বুইকখানা প্রশংসা করবারই মত বটে! সুন্দর ছাই-এর মত রং, ভেতরে গভীর লাল আস্তরণ, ড্যাসবোর্ড-এর প্যানেলে লেটেষ্ট মডেলের ঘড়ি। একটা রেডিয়োও বসান আছে। চলে ঘণ্টায় সত্তর আশী মাইল বেগে, অথচ এমনই মসৃণ তার গতি যে মনেও হয় না গাড়ী চলছে।

গাড়ীর উপর যে তার সম্পূর্ণ কন্‌ট্রোল আছে তার নিদর্শনও নবকিশোর প্রদীপকে দিল। দু'তিনবার সে বিপুল বেগে চালিয়ে শেষ মুহূর্ত্তে গাড়ীর গতি এনে ফেলল ঘণ্টায় পাঁচ মাইলের মধ্যে। প্রদীপের প্রশংসা পাবার আশায় নবকিশোর তার দিকে তাকাল।

পি. জি. হাসপাতালের বাইরে গাড়ীটা এসে থামল। নবকিশোর বলল, তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি।

মিনিট পনর পরে নবকিশোরের সঙ্গে ছবি এসে উপস্থিত হ'ল। নার্স-এর উনিফর্ম্ম ছেড়ে সে সাধারণ একখানা শাড়ী পরে এসেছে। প্রদীপকে সে নমস্কার করল।

প্রদীপ লক্ষ্য করল, এই কয়েক দিনেই ছবির বেশ খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মোমিনপুরের ফ্লাটএ যে লজ্জাবনতা ছবিকে দেখেছিল তার স্থানে উপস্থিত হয়েছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন এক তরুণী। চোখের কালিমা মিলিয়ে গেছে অনেকখানি, তাছাড়া কবরীবিন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার পর্য্যন্ত তার প্রত্যেকটি আচরণ ব্যবহারে ফুটে উঠেছে সপ্রতিভতা।

—তুমি ভাল আছ ত, ছবি? প্রদীপ প্রশ্ন করল।

ছবি ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে ভাল আছে।

তারপর দু'জনেই নীরব। প্রদীপের হয়ত আরও অনেক প্রশ্ন ছিল, কিন্তু নবকিশোর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, সে চুপ করে রইল।

নবকিশোর বোধ হয় সেটা বুঝল। বলল, ছবির হাতে আরও এক ঘণ্টা সময় আছে, চলো আমরা গঙ্গার ধারে যাই, সেখানে বসে গল্প করা যাবে।

প্রিন্সেপ ঘাটের অদূরে গাড়ীটা নবকিশোর থামাল। বলল, ওই সামনে বেশ খানিকটা ফাঁকা আছে, লোকজনও কেউ নেই, চলো, ওখানে গিয়ে বসি।

প্রদীপ এবং ছবি গঙ্গার উপকূলে বসল। নবকিশোর বসতে রাজী হ'ল না, বলল, আমি একটু ঘুরে আসচি, প্রদীপদা'। তোমাদের কথাবার্ত্তা এর মধ্যে শেষ করে নাও। আধ ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাদের।

অর্থসূচক এক হাসি হেসে সে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল।

প্রদীপই কথা শুরু করল, নবকিশোর বড় ভাল ছেলে, ছবি। ও যে এই ভাবে তোমাদের সব ভার গ্রহণ করবে আমি ভাবতেই পারিনি। এখানে, হাসপাতালে, তোমার কষ্ট হচ্ছে না ত ?

—না, কষ্ট আর কি ?

—শুনেছি নার্সদের নাকি খুব খাটতে হয়। তা' বছর দুই দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ডিপ্লোমা নিয়ে যখন বেরিয়ে আসবে, তখন দেখবে বাজারে তোমার দাম কত বেড়ে গেছে! চাকুরী পেতে কোনই অসুবিধে হবে না তোমার।

—চাকুরীই কি সব ? ছবি হঠাৎ প্রশ্ন করল।

প্রদীপ চমকে উঠল। এ কি প্রশ্ন ছবির মুখে ? তাহলে ছবি বুঝি তার বিগত জীবন ভুলতে পারেনি এখনও ? সে অস্বস্তিবোধ করল।

ছবি বলল, আপনাদের অনুগ্রহ কখনও ভুলতে পারব না। কিন্তু কেন আপনারা এই অনুগ্রহ করছেন ? এর বিনিময়ে কি দাম দিতে হবে আমাকে ?

সতেরো বছরের মেয়ের মুখে এ কি প্রশ্ন ?

প্রদীপ বলল, বিনিময়ে দাম দিতে হবে একথা তোমার কেন মনে হচ্ছে, ছবি ? দাম না দিয়ে কি কেউ কারো উপকার করতে পারে না ?

—পারে ? আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন ? ছবি প্রশ্ন করল। তার কণ্ঠস্বরে অপ্রত্যয়ের গভীর ছাপ।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ছবি !

—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না—ব'লে জিজ্ঞাসুনেত্রে সে প্রদীপের দিকে তাকাল।

—আমার নাম প্রদীপ, প্রদীপ গুহ।

—আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, প্রদীপ বাবু। আচ্ছা, আপনাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করছি, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কতটুকু ? আর কি সূত্রে সেই পরিচয় ? আমাকে দেখে হঠাৎ আপনার মহানুভবতা জেগে উঠল

কেন? সত্যি কি আপনি মহানুভব?—আর নবকিশোর বাবু, যিনি আমাকে আগে দেখেনওনি, আপনার সঙ্গে যে সামান্য পরিচয়টুকু হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে সেটুকুরও অভাব ছিল, সেদিন ঝড়ের মত এসে আমাদের তাঁর নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে এলেন ষ্টেশনে, টিকিট করে গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন সযত্নে, আমার হাতে একশ' টাকা গুঁজে দিলেন এবং বললেন, টাকা পয়সার যেন ভাবনা না করি। তারপর, আমার এই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা, বাড়ীতে মাসে মাসে টাকা পাঠানো, এসবই করছেন অকাতরে।—কিন্তু কেন? কেন?

ছবির প্রত্যেকটি কথায় নিবিড় সংশয়। সে যেন বলতে চায়, বেশ ছিল সে, জীবনের গতি চলছিল এক ভাবে, আলো-অন্ধকারময় পথে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল এক রকম করে। এখন তাকে নতুন পথে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু সত্যি কি এ পথ নতুন? না, শীগ্‌গিরই মহানুভবতার যবনিকা উঠে গিয়ে প্রকাশিত হবে লালসার ইঙ্গিত, তাকে আবার বইতে হবে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের শিলাস্তূপ? তাই যদি অভিপ্রায়, তাহ'লে আর দেরী না করে খুলে ফেলো তোমাদের অবগুণ্ঠন, সরিয়ে দাও তোমাদের আবরণ।

প্রদীপ বলল, তোমার মনটা এখনও সুস্থ হয়নি, ছবি, তাই কেবল ভূত দেখছ।

ছবি একটু হাসল।

প্রদীপ আবার বলল, তোমার কোন ভয় নেই, ছবি, আমার কোনই দুরভিসন্ধি নেই। আর নবকিশোর, সে যা করছে সবই আমার অনুরোধে। আমার অর্থবল নেই, তাই আমাকে তার সাহায্য নিতে হয়েছে।

ক্ষণিকের জন্য দীপশিখা জ্বলে উঠল যেন। ছবি বলল, অর্থবল যে আপনার নেই তা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন না? কোন্ অধিকারে আমাকে টেনে আনলেন এই পরিস্থিতির আবর্তে?

কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না, কারণ [illegible] এসে জানাল যে আধ ঘণ্টারও বেশী হয়ে গেছে, এবার ছবিকে হাসপাতালে ফিরে যেতে হবে।

ছবিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেবার পর নবকিশোর প্রশ্ন করল, এবার কোথায় যাবে প্রদীপদা' ?

—আমাকে এসপ্ল্যানেড-এর মোড়ে নামিয়ে দাও।

গাড়ী থেকে নামবার আগে নিষ্পলক ভাবে নবকিশোরের দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলল, একটা কথা বলবার আছে, নবু! ছবির জন্যে তুমি অনেক কিছু করেছ এবং করছ, কিন্তু তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এর পেছনে যদি কোন সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে এবং তার প্রকাশ আমি দেখতে পাই তাহ'লে তোমাকে জীবনে আমি ক্ষমা করব না।

ব'লে নবকিশোরের জবাবের কোন প্রতীক্ষা না করেই সে বেরিয়ে এল।

চৌদ্দ

অটলবিহারী বাবু আর সুমিত্রার ভবিষ্যদ্বাণীই ফলল। বাংলার বুকে পড়ল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, কলকাতার পথে বিপথে, অলিতে গলিতে শোনা গেল শীর্ণ দুঃস্থ নরনারী, বালক বালিকার করুণ আর্ত্তনাদ, দুটি ভাত দাও, মা,তোমার পায়ে পড়ি, একটি পয়সা ভিক্ষে দাও, বাবা। দু'মুঠো ভাতের অভাবে মরতে লাগল হাজার হাজার লোক।

সে এক বীভৎস দৃশ্য, যেমন মর্ম্মান্তিক, তেমনই হাস্যকর। ক্ষুধার তাড়নায় আশে-পাশের গ্রাম থেকে দলে দলে কলকাতার দিকে আসতে লাগল সেখানকার বাসিন্দারা, একা নয়, সপরিবারে। গ্রামে চাল নেই, থাকলেও যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাতে ক্ষুধা মেটে না অথবা যে দাম দোকানী চায় তা' তাদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। তাই তারা চলল মহানগরী কলকাতায়।

এসে চালের দোকানের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত্ত, ক্লিষ্ট তারা, কিন্তু শৃঙ্খলার শাসন অতিক্রম করল না। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা' যখন ধরে এল, তখন বসল। শেষে বসতেও পারল না। শুয়ে পড়ল। প্রথম দিন চাল পাওয়া যায়নি, পরের দিন পাওয়া যাবে নিশ্চয়। রৌদ্রে, বৃষ্টিতে পথের উপর পশুদের মত জীবন্মৃত নরনারীর ভিড় জমে গেল।

বেঁচে থাকবার সখ তাদের প্রবল, তাই ক্ষুধার্ত্ত রুগ্ন কুকুরের মত তারা ডাষ্টবিন-এর ড্রেণ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু কুকুরেরই মত আজ্ঞাবহ এই বাহিনী একবারও চেষ্টা করল না একটা চালের দোকান আক্রমণ করতে, না খেতে পেয়ে শুয়ে রইল, তবু একবারও চেষ্টা করল না খাবারের দোকানের কাচ ভাঙতে। শেষ পর্য্যন্ত যাদের এতটুকু সামর্থ্য ছিল তারা আবার ভিড়ল "কিউ" এর সারিতে, অথবা ঘুরতে লাগল ভিক্ষাপাত্র হাতে।

কিন্তু সামর্থ্য খুব কম লোকেরই ছিল। দীর্ঘদিনের অনশনে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে ফুটপাতে শুয়ে থাকার ফলে এবং নোংরা কদর্য্য জায়গা থেকে খাদ্যসংগ্রহ করে তা দিয়ে জঠরানল তৃপ্ত করবার চেষ্টায় একে একে তারা মরতে সুরু করল। মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদে কলকাতার হাওয়া বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠল। পথের পাশে মায়ের বুকের শুষ্ক স্তন টানতে টানতে কত শিশুর ক্ষীণ আয়ুশিখা নিবে গেল। মৃত শিশু বুকে নিয়েও মা কাঁদতে পারল না, কারণ সেও অভুক্ত, ক্ষুধা সম্পূর্ণভাবে লোপ করে দিয়েছে তার অন্যান্য বোধশক্তি। উঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর উঠল না। তাদের দলের যারা পুরুষ, স্বামী, ছেলে, ভাই বা গ্রামসুবাদে খুড়ো বা জ্যেঠা, তারা নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে দেখল এই দৃশ্য, কিন্তু তাদেরও খেয়াল হ'ল না এর প্রতিকারের চেষ্টা করে। জেলে যেতে পারলে হয়ত তাদের প্রাণ বাঁচত, কিন্তু আইনবিরুদ্ধ, সমাজবিরুদ্ধ কোন কাজই তারা করল না। মূক ভাষাহীন বিহ্বলতা তাদের এগিয়ে দিল চিরনিদ্রার অঙ্কে।

অথচ সরকার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কিছুতেই স্বীকার করলেন না যে সত্যি দুর্ভিক্ষ এসেছে। দলে দলে যখন লোক মরছে, তখনও বিলেতের লোকসভায়, দেশের এসেম্বলি এবং কাউন্সিলে, প্রশ্নের উত্তরে সরকারের মুখপাত্রগণ বললেন, বাংলা দেশে চালের বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের অভাব নেই, শুধু অজন্মার ফলে এবং কতিপয় লোলুপ ব্যবসায়ীর সমাজবিরুদ্ধ ব্যবহারে সাময়িক অভাবের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র।

প্রদীপ পাগলের মত এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল। গায়ত্রীর ওখানে গিয়ে তাকে জানাল তীব্র তিরস্কার।

—তিন মাস আগে তুমি আমাকে কি বলেছিলে মনে আছে? আমি যখন আমার আশঙ্কার কথা বলেছিলাম তুমি ত হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলে! আর এখন? আলিপুরের প্রাসাদোপম বাংলোর বাইরে এসে একবার চোখ খুলে দেখ কি হচ্ছে।

গায়ত্রী নতমুখে প্রদীপের তিরস্কার মেনে নিল।

প্রদীপ ছুটল অটলবিহারী বাবু এবং নবকিশোরের কাছে। তাঁদের অনুরোধ জানাল, তাঁরা যেন খুলে দেন অন্নসত্র। টাকার অভাব নেই তাঁদের, সদ্‌ব্যবহার হোক্ তাঁদের অর্থের।

অটলবিহারী বাবু হেসে বললেন, কত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই টাকা রোজগার করেছি তা' তুমি জান না, প্রদীপ। এককালে আমিও ছিলাম ওদের মত পথের ভিখিরি, সেই শ্রেণীর উর্দ্ধে যদি আজ আমি উঠতে পেরে থাকি তাহলে সেটা সম্ভব হয়েছে নিতান্তই নিজের পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে। ওরা কাজ করে না কেন? কাজের ত অভাব নেই!

—কি করে কাজ করবে, কাকাবাবু? ওদের শরীরের অবস্থা দেখছেন না, দীর্ঘ দিনের অনশনে এতটুকু শক্তি যে অবশিষ্ট নেই। আগে ওদের বাঁচিয়ে তুলুন, তার পর কাজ করবে।

—তোমারও যেমন কথা! পেট ভরে খেতে পেলে ওরা কখনও কাজ করবে? কোঁচড় ভর্ত্তি করে চাল নিয়ে পালিয়ে যাবে ওদের গ্রামে, যেখান থেকে এসেছে!

—কিন্তু ওদের মধ্যে যারা মেয়ে, যারা বৃদ্ধ, যারা শিশু, তাদের কথা ভাবুন। কি অপরাধ করেছে তারা?

—অপরাধ? অপরাধ এই যে ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে কলকাতায়। কি প্রয়োজন ছিল এখানকার সহজ জীবন-ধারার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করায়? মরতেই যদি হয়, তাহলে গ্রামে নিজেদের ভিটেয় মরলেও ত পারত।

—আপনি বড় হৃদয়হীনের মত কথা বলছেন, কাকাবাবু। সখ করে কি কেউ মরতে চায়? ওরা এসেছে ক্ষুধার তাড়নায়। গ্রামে চাল নেই—আশা, কলকাতায় চাল মিলবে হয়ত বা!

—হৃদয়হীন আমি নই, হৃদয়হীন হচ্ছে তোমাদের সরকার। দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করবেন সরকার, আমরা নয়।

—সরকার যদি কর্ত্তব্য করতেন তাহ'লে আপনাদের দ্বারস্থ হ'তাম না, কাকাবাবু। সরকারের কর্ম্মচারীরা বলেন, সরকার দানসত্র খুলে বসেননি,

যতটুকু তাঁদের সাধ্য তাঁরা করছেন। আর আপনারা বলেন, দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের, আপনাদের নয়। দায়িত্ব আমাদের সবার, কাকাবাবু! এরা আমাদেরই দেশের লোক, এরাও মানুষ।

এতক্ষণ চুপ করে নবকিশোর এদের কথোপকথন শুনছিল। বলল, বাবা হিন্দু মহাসভা রিলিফ ফাণ্ড-এ দু'হাজর টাকা দিয়েছেন, প্রদীপদা।'

—মাত্র দু'হাজার টাকা? দু'হাজার টাকায় কি হবে নবু?

অটলবিহারী বাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আমি কি লক্ষপতি প্রদীপ? দু'হাজারেও যদি তোমরা সন্তুষ্ট না হ'ও তাহ'লে আমি নাচার।

তাঁর সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল। অটলবিহারী বাবু তুলে ধরলেন রিসিভারটা।

—হ্যালো: হ্যাঁ, আমি অটলবাবু বলছি। ওঃ, শেঠজী, আপনি? বলুন। দাম পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠেছে? এখন ছাড়বেন কি না জিজ্ঞাসা করছেন? না, এখনও না। পুরো পঞ্চাশ পর্য্যন্ত উঠতে দিন, তারপর ছাড়বেন। আপনারই লাভ, কমিশন বেশী পাবেন।—হ্যাঁ, আপনাকে অথরিটি দিচ্ছি, পঞ্চাশে উঠলেই ছেড়ে দিতে পারেন।

নবকিশোর বলল, এ লাভটা কিন্তু আমার পরামর্শ মত হ'ল বাবা। আমার বুইকটা বদলে ক্যাডিলাক কেনবার টাকাটা যেন পাই।

ভগ্ন হৃদয় নিয়ে প্রদীপ এল সুমিত্রার কাছে। দেখল সুমিত্রার ওখানে লোকের ভিড়। খুব জোর আলোচনা চলছে।

—প্রদীপ, তুমি পাশের ঘরে একটু বসো। আমি এখখুনি আসছি, সুমিত্রা বলল।

পাশের ঘরে বসে প্রদীপ শুনতে লাগল এদের কথাবার্তা। কে একজন বলছে, আমাদের ফাণ্ডএ মোটেই টাকা উঠছে না সুমিত্রা দেবি। সরকারের ভয়ে কংগ্রেস ফাণ্ডে অনেকে টাকা দিতে চায় না। অথচ হিন্দুমহাসভা, রামকৃষ্ণ

মিশন, অলপার্টি রিলিফ ফাণ্ড-এ কত টাকা উঠেছে। ওরা সবশুদ্ধ গোটা দশেক অন্নসত্র খুলেছে, আর আমরা একটার বেশী এপর্য্যন্ত খুলতে পারলাম না। এ ভাবে চললে আমরা যে হটে যাব, সুমিত্রা দেবি!

সুমিত্রা বলছিল, দোষ ত আপনাদেরই। যারা শাঁসালো, তাদের কাছে কি দাবী নিয়ে যেতে হয় তা' আপনারা জানেন না। আজ যদি বাবা জেলে আটক না থাকতেন, তাহলে দেখতেন তিনি কি করতেন। অনুরোধ উপরোধে কাজ যদি না হয় তাহলে ভয় দেখাতে পারেন না? বলতে পারেন না, আমাদের হাতে ক্ষমতা একদিন আসবে, তখন মনে রাখবে তাদের, যারা অসহযোগিতা করছে কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে।

আরেক জন বলল, আমি ঐভাবে প্রায় এক লাখ টাকা তুলেছি সুমিত্রা দেবি। বলেছি যে কংগ্রেস অকৃতজ্ঞ নয়, যারা কংগ্রেসকে সাহায্য করবে, তারা উপযুক্ত পুরস্কার পাবে যথাসময়ে।

সুমিত্রা বলল, এই ত চাই। শুনুন, আজ পর্য্যন্ত আমাদের ফাণ্ডে উঠেছে দু'লক্ষ বাইশ হাজার টাকা। এমাসের শেষে এটা পাঁচ লক্ষে তুলতে হবে। আপনাদের প্রত্যেককে সেক্টর ভাগ করে দিয়েছি, টার্গেট-এ পৌঁছান চাই-ই।

তৃতীয় একজন বলল, সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে বামপন্থীদের নিয়ে। ওরা বলছে যে, কংগ্রেস যুদ্ধে অসহযোগিতা করার ফলে সরকার ক্ষমতা তাদের হাতে দেবে না, দেবে বামপন্থীদের হাতে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে লোকে যেন কংগ্রেসের ফাণ্ডএ চাঁদা না দেয়। ওদের ফাণ্ড-এ নাকি দু'লক্ষ টাকা উঠেছে।

সুমিত্রা বলল, ওরাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু! গান্ধীজি জেল থেকে বেরিয়ে আসুন না, আমরা ওদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরব দেশের লোকের সামনে। সরকারের সহায়তা দেশের রোষের হাত থেকে ওদের কি ভাবে রক্ষা করে দেখে নেব।

মিটিং ভাঙ্গল। সুমিত্রা এল প্রদীপের কাছে।

—কি প্রদীপ? কি খবর? দেখছ ত দেশের অবস্থা! মাসকয়েক আগে

আমি যখন দুর্ভিক্ষের আভাস দিয়েছিলাম, আমার কথায় তখন তোমার প্রত্যয় হয়নি। আর এখন?

—আমার ভুল হয়েছিল সুমিত্রা।

—তুমি আমার কমিটিতে এস না কেন? তোমাদের বরানগর অঞ্চলে আমাদের কোন ভাল কর্ম্মী নেই, তুমি যদি ঐ অঞ্চলটার ভার নাও তাহলে বেশ হয়।

—আমি যে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা অন্নসত্রে কাজ করছি।

—ওঃ, তুমি এরই মধ্যে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে ভিড়েছ? চমৎকার!

—এর মধ্যে দল কোথায় সুমিত্রা? মিশন ত কোন দলাদলির মধ্যে যায় না, যেখানে দুঃস্থ, আর্ত্ত দেখতে পায় সেখানেই ছোটেন মিশনের সেবাব্রতীরা। ওঁরা যা করছেন তা অতুলনীয়।

—হুঁ, আর সরকারের খাতায় তাদের কর্ম্মীদের নাম উঠছে বোধ হয়! ভবিষ্যতে মেডেলও মিলতে পারে।

—একি বলছ তুমি? ওঁরা যে সংসারত্যাগী, কোনপ্রকার পুরস্কার বা লাভের আশা রেখে তাঁরা কাজ করেন না।

সুমিত্রা অবজ্ঞাসূচক ভ্রূভঙ্গী করল। বলল, ভাল কথা। তবে আমাদের পুরানো কর্ম্মী তুমি, আমাদের সঙ্গে কাজ করলেই শোভন হত বেশী।

—মিশনই যে প্রথমে নামল কর্ম্মক্ষেত্রে। কিছু করতে না পেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি যোগ দিলাম ওদের সঙ্গে।

—তাহলে তুমি আজ এসেছ কি উপলক্ষ্য নিয়ে?

প্রদীপ আহত বোধ করল। বলল, উপলক্ষ্য কিছুই নেই, সুমিত্রা। চার দিকের অবজ্ঞা, নীচতা, স্বার্থান্ধতা দেখে পীড়িত বোধ করছিলাম, তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে, এই আশায় যে এখানে খানিকটা সান্ত্বনা, খানিকটা মনের খোরাক পাব। এখন দেখছি ভুল করেছি।

—ভুল নিশ্চয়ই করেছ। ভুল করেছ আমাদের পরিত্যাগ ক'রে।

—মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না। কংগ্রেসকে আমি ছাড়িনি। কংগ্রেসই আমাকে ছেড়েছে।

পনেরো

আরও এক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটল। লিন্‌লিথগো বড়লাটের মসনদ পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁর স্থানে এলেন যুদ্ধ-বিজয়ী লর্ড ওয়াভেল। বাংলার গভর্ণমেণ্ট হাউসে এলেন অষ্ট্রেলিয়া থেকে মিঃ কেসী, দুর্ভিক্ষোত্তর বাংলাকে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আন্‌তে।

আরও অনেক কিছু ঘটল, যথা প্রকাশ্য দিবালোকে জাপানী বোমারুর কলকাতায় বোমাবর্ষণ, গান্ধীজির সহধর্ম্মিণী কস্তুরবাঈ-এর দেহত্যাগ, এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক পুস্তিকা প্রকাশ—বিয়াল্লিশ সালের গোলমালের পেছনে কংগ্রেস এবং গান্ধীজির কতখানি সহযোগিতা ছিল তার প্রমাণসহ। গান্ধীজি প্রতিবাদ জানালেন নতুন বড়লাটের কাছে। জবাব এল সংক্ষিপ্ত এবং সুস্পষ্ট, সরকার মনে করেন না গান্ধীজির এই প্রতিবাদের কোন মূল্য আছে।

ওদিকে বিলেতে লোকসভায় মিঃ এমেরি অবশেষে স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন যে, বাংলা দেশে সত্যি সত্যি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এবং তাতে লোক মারা গেছে অন্যূন পঁয়ত্রিশ লক্ষ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ-ও বললেন যে, সরকারের দিক থেকে উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি হয়নি।

ইউরোপে জার্ম্মানী এবং ইটালির অবস্থা সঙ্গীন, পদে পদে তারা হটে যাচ্ছে বৃটেন, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তির সম্মুখে। প্রশান্ত মহাসাগরেও জাপানীরা হটছে, কিন্তু তারা একবার শেষ চেষ্টা করছে বৃটেনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হয়েছে, নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ চলে এসেছে মণিপুর সীমান্তে।

তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে সরকার গান্ধীজিকে মুক্তি দিলেন। ইস্তাহারে তাঁর অসুস্থতার কারণটা খুব প্রকট করে বলা হ'ল, যাতে দেশের লোক মনে না করে যে কংগ্রেসের প্রতি সরকারের নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তার

প্রমাণও এল মাস দুয়েকের মধ্যে। গান্ধীজি যখন লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন জবাব এল, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, যত দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস অপরাধ স্বীকার না করছে, কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে তিনি প্রস্তুত নন।

ঘটনার এই ঘাত-প্রতিঘাতে প্রদীপ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সে অনুভব করছিল, দেশ যেন একটা নিঃসাড় অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছেচে। সরকারের প্রহারে, দুর্ভিক্ষের নির্ম্মম আঘাতে সকলেই যেন হয়ে পড়েছে কেমন প্রাণহীন, নিস্তব্ধ। দুর্ভিক্ষের সময়ে বেদনার যে তীব্রতা, যে নিষ্ঠুরতা, যে সুগভীর মনস্তাপ সমসাময়িক নর-নারীর অনেককে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তাও যেন তারা ভুলে যেতে বসেছে কালের অতল প্রবাহে।

কেন এমন হয়? এই কি মনের ধর্ম্ম? ব্যাপক সর্ব্বনাশের দৃশ্য খুব বেশী দেখলে, খুব বেশী আলোচনা করলে মনের বেদনার তীক্ষ্ণতা কি সত্যি কমে আসে?—অথবা ভুলে যাওয়াই কি মনের স্বাভাবিক রীতি?

সুমিত্রার সঙ্গে তার বিশেষ দেখা হয়নি, এই একটি বছরে। সে বুঝতে পেরেছিল, সুমিত্রার জগতে বিচরণ করতে সে অসমর্থ, সুমিত্রা তাকে তাদের দলের একজন বলে মেনে নিতে অনিচ্ছুক। সুমিত্রার সান্নিধ্য সে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগল।

বন্দনার সঙ্গে তার মাঝে মাঝে দেখা হত, কিন্তু সে অনুভব করতে সুরু করেছিল যে সেখানেও সে অপাংক্তেয়। দুর্ভিক্ষের সময় অন্নসত্র খোলা নিয়ে অটলবিহারী বাবু এবং নবকিশোরের সঙ্গে বাদানুবাদের পর অবধি তাঁরা তার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রদীপ যে তাঁদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করেছে, এটা প্রকাশ পেত তাঁদের প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণে, তাঁদের সুস্পষ্ট অবহেলায়। বন্দনাও যেন তার বাবা এবং দাদার পক্ষ সমর্থন করছিল।

তার একমাত্র স্থান ছিল গায়ত্রীর গৃহে। সেই তিরস্কারের গায়ত্রী যেন একটু কোমল, একটু সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। আজকাল সে প্রদীপের উক্তি, প্রদীপের অভিমত শুনতে আরম্ভ করেছিল একটু বেশী অভিনিবেশে। এমন কি, মিঃ করও তাঁর অফিসিয়াল মুখোশটা মাঝে মাঝে খুলে ফেলতেন তার সম্মুখে, তাকে প্রশ্ন করতেন নানা বিষয়ে। তবে প্রদীপের মনে হত, এটা হয়ত সাময়িক ক্লান্তির প্রতিক্রিয়া।

সেদিন আলোচনা হচ্ছিল কংগ্রেসকে নিয়ে। গায়ত্রীই প্রসঙ্গটা তুলেছিল, মিঃ কর ছিলেন শ্রোতা।

—আচ্ছা, প্রদীপ, তোমার কি মনে হয় না গান্ধীজির তখন উচিত ছিল এই নিঃসাড় অবস্থাটার অবসান করে ফেলা, অন্ততঃ একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা? কি লাভ হচ্ছে এই তুচ্ছ আত্মশ্লাঘায়? ধরেই নিলাম না হয় বিয়াল্লিশ সালের গোলমালের জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়, কিন্তু এখন, এই চুয়াল্লিশ সালের শেষার্দ্ধে, ঐ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করায় কোন সার্থকতা আছে কি?

—কিন্তু পুনরাবৃত্তি ত গান্ধীজি করছেন না। পুনরাবৃত্তি করছেন সরকার।

—না, প্রদীপ, সরকার করছেন না। সরকার গান্ধীজির মুখ থেকে শুধু এইটুকু শুনতে চান যে তাঁর ভুল হয়েছিল।

—গান্ধীজি ত সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন, দিদি! এই সেদিন তিনি বলেছেন, তিনি সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে রাজী আছেন, যদি সরকার বলেন যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে অবিলম্বে।

মিঃ কর বললেন, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন তিনি। যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, শত্রু আমাদের ঘরের দরজায়, এখন কি ক'রে বৃটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে, প্রদীপবাবু?

—কেন, গান্ধীজি ত সে পথও খোলা রেখেছেন। তিনি বলেছেন যে যুদ্ধ চালাবার জন্য বৃটিশ সৈন্যদের যদি ভারতবর্ষে থাকতে হয়, এক-দুই-বা-তিন বৎসর, তিনি আপত্তি করবেন না। তবে তারা থাকবে স্বাধীন ভারতের রক্ষক হিসাবে, পরাধীন ভারতের ভক্ষকরূপে নয়।

—এ শুধু পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি। যুদ্ধের অবসানে স্বাধীনতা আসবে, এ প্রতিশ্রুতি ত সরকার পক্ষ থেকে অনেকবার দেওয়া হয়েছে। মিঃ কর বললেন।

—আপনি ত জানেন, বৃটেনের প্রতিশ্রুতির দাম কতটুকু। গান্ধীজি মনে করেন, বৃটেন এখন যদি স্বাধীনতা না দেয়, তাহ'লে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, বিপদের অবসানে, কিছুতেই স্বাধীনতা দেবে না।

—কিন্তু এ যে রীতিমত ব্ল্যাক্‌মেল, প্রদীপ বাবু! গান্ধীজির কাছ থেকে আমরা এটা আশা করিনি'।

—যা খাঁটি কথা তা অস্বীকার করলে চলবে কেন, মিঃ কর? একে ব্ল্যাকমেলই বলুন আর যাই বলুন, এ ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।

—আপনি নিশ্চিত জানবেন, প্রদীপবাবু, এভাবে স্বাধীনতা আপনারা পাবেন না। একদিকে গান্ধীজি করছেন ব্ল্যাকমেল আর অপর দিকে নেতাজী দিচ্ছেন হুমকি। সরকার এখনও এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়েননি যে, ব্ল্যাকমেল বা হুমকিতে ভয় পাবেন। বেশ জোরের সঙ্গেই মিঃ কর বললেন এবং আবার তাঁর খবরের কাগজে মনঃসংযোগ করলেন।

গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে প্রদীপ বলল, আচ্ছা, তুমিই বল না, দিদি, স্বেচ্ছায় অন্যের হাতে ক্ষমতা কেউ দিতে চায় কি? ক্ষমতা কেড়ে নিতে হয়, ছলে, বলে, কৌশলে। গান্ধীজি এই অত্যন্ত সোজা কথাটা বুঝেছেন।

—আমি মেয়েমানুষ, তোমাদের পলিটিক্স বুঝিনে, প্রদীপ! তবে এটুকু বুঝি যে, কংগ্রেস আজ গভর্ণমেণ্টের বাইরে আছে বলে দেশেরই সমূহ ক্ষতি হচ্ছে। পাকিস্তান, আকালিস্থান, তপশীলস্থানের জন্য যে কলরব হচ্ছে সেটা কি দেশের পক্ষে কল্যাণকর?

—নিশ্চয়ই নয়, দিদি! কিন্তু এদের উস্কে দিচ্ছে কে? বৃটেন। আজ বৃটেন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দূরে সরে যাক, দেখবে, দু'দিনের মধ্যেই আমাদের এই ঘরোয়া ঝগড়া মিটে যাবে।

—আপনি পরিস্থিতিটাকে যতখানি সহজ আর সরল ভাবছেন, ততখানি সহজ সরল তা নয়। মিঃ কর আবার বললেন।

—হয়ত নয়, কিন্তু তাতে বৃটেনের এত মাথাব্যথা কেন? যদি আমরা মারামারি কাটাকাটি করি, তাহ'লে ক্ষতি ত হবে আমাদেরই, বৃটেনের নয়।

যদিও প্রদীপ জোর গলায় মিঃ কর আর গায়ত্রীর সঙ্গে তর্ক করল তবু তার মনেও সংশয় জাগতে সুরু করেছিল। সত্যিই ত, স্বাধীনতার কি মূল্য থাকবে যদি স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয় কলহ? কেন লোকে ভাবছে না যে স্বাধীনতা হচ্ছে একটা নিবিড় অনুভূতি, সর্ব্বতোভাবে বিকশিত হবার একটা সুযোগ। স্বাধীনতা দেশবাসীকে করবে মহৎ, উদার। ক্ষুদ্রতা, নীচতা যাবে মুছে, মহাত্মাজীর কথায়, স্বাধীনতা নিজেদের নতুন করে চেনবার জানবার সুযোগ দেবে।

গায়ত্রীদের ওখান থেকে বেরিয়ে প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে সুরু করল। খানিক পরে লক্ষ্য করল, নিজেরই অজ্ঞাতে সে এসে পড়েছে রসময়ের চায়ের ক্যাবিনের সম্মুখে।

একটু ইতস্তত করে সে ঢুকে পড়ল। দেখল, যারা সেখানে বসে আছে তাদের কাউকে সে চেনে না। সন্তোষ সেখানে নেই।

রসময়ের কাছে সে এগিয়ে গেল। প্রশ্ন করল, সন্তোষ বাবু আজকাল এখানে আসেন না?

রসময় তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল, আপনাকে যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে? কোথায় দেখেছি বলুন ত?

—কেন? এখানেই। অনেক দিন পরে এলাম।

—ওঃ, তা সন্তোষ বাবু আজকাল বিশেষ আসেন না। উনি এখন ওয়ার্ডেন হয়েছেন, গরীবের এই দোকানে তাঁর পদধূলি পড়ে না।

—ওর ঠিকানা জানেন?

—ঠিকানা? ঠিক জানিনে। আচ্ছা দাঁড়ান, জি[illegible] করে বলছি।

রসময় অভ্যাগত একটি ছেলেকে ডাকল। বলল, ওহে, সতীশ, সন্তোষ মুখুজ্যের ঠিকানা জান? এই ভদ্রলোক জানতে চাচ্ছেন।

সতীশ প্রদীপকে ঠিকানা বলল। সন্তোষ কোন্ ওয়ার্ডের ওয়ার্ডেন সেটাও প্রদীপ জেনে নিল, তারপর রসময়কে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে সে বার হয়ে এল।

স্থির করল সন্তোষের খোঁজটা সে একবার করে যাবে। সতীশের প্রদত্ত ঠিকানাটা খুলে পড়ল। এখান থেকে একটা বাস ধরতে হবে, তারপর খানিকটা হাঁটতে হবে।

বাস থেকে নামল। রাস্তাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। এখানেই সে সন্তোষের সঙ্গে এসেছিল, ছবির সঙ্গে তার পরিচয়ও এখানেই। সন্তোষ তাহ'লে কাছাকাছি থাকে দেখছি। আচ্ছা, ঐ বাড়ীটাতেই সন্তোষ তাকে নিয়ে এসেছিল না?

না, ভুল হয়নি। সেদিন সে এসেছিল রাত্রির অন্ধকারে, আজ দিনের আলোয় সে সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঐ ত সিঁড়ি, ওখান দিয়েই সে উঠে গিয়েছিল দো'তলায়।

সত্যি, কি নেশায়ই না সেদিন তাকে পেয়েছিল! কেন যে এসেছিল তার সঙ্গত কারণ আজও সে খুঁজে পায়নি। ছবির চেহারাটাও মনে আসছে না যেন। শেষ দেখা সেই প্রিনসেপ ঘাটের ওখানে। তারপর একটি বছর কেটে গেছে, কোন খোঁজ সে নেয়নি। মনেও হয়নি ছবির কথা। তার ট্রেনিংও ত প্রায় শেষ হতে চলল। কেমন আছে সে? ভালই নিশ্চয়। নবকিশোরকে জিজ্ঞাসা করবে অবসর মত।

বাড়ীটা পেরিয়ে সে এগিয়ে গেল আরও চল্লিশ পঞ্চাশ গজ। অবশেষে সন্তোষের ঠিকানা মিলল। কিন্তু সন্তোষ বাড়ীতে নেই, তার ওয়ার্ডেন পোষ্টএ চলে গেছে। হ্যাঁ, সেখানে গেলে নিশ্চয়ই দেখা হবে, সন্তোষের ছোট ভাই বলল।

ফেরবার পথে [illegible] বাড়ীটার পাশ দিয়েই আবার যেতে হবে। আচ্ছা,

প্রকাণ্ড একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল যেন! গাড়ীর ষ্টিয়ারিং হুইলে বসে কে ও? অনেকটা নবকিশোরের মত মনে হচ্ছে যেন।

না, কোনই সন্দেহ নেই। নবকিশোরই। পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বার করে লাইটার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর পাশের দরজাটা খুলে দিল।

গাড়ী থেকে নামল একটি মেয়ে। অ্যাঁ, ছবি? কিন্তু তাকে যে চেনাই যায় না এখন। সুন্দর জর্জ্জেটের শাড়ি, কণ্ট্রাষ্ট রংএর ব্লাউজ, পায়ে শান্তি-নিকেতনী চটি, হাতে মানানসই ব্যাগ, আর ঠোঁটও যেন একটু অস্বাভাবিক রকম লাল।

ছবির পেছনে পেছনে নবকিশোরও নামল। তারপর তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে।

একটু দূরে প্রদীপ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ষোলো

স্তম্ভিত ভাবটা একটু কেটে যাবার পর প্রদীপ ভাবতে লাগল, এখন কি করা উচিত? যদি সে নবকিশোর এবং ছবির পশ্চাদ্ধাবন করে তাহলে সেটা অত্যন্ত হাস্যকর হবে না কি? তাছাড়া, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করায় তার কি অধিকার? ছবি তার কে? ভাবতেই প্রদীপের চোখ-কান লাল হয়ে উঠল।

কিন্তু, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই খেলা দেখা, শুধু দেখা নয়, বেমালুম হজম করে যাওয়া, তার স্বভাব এবং নীতিবিরুদ্ধ। সে সোজা চলে যাবে ওপরে, প্রশ্ন করবে দু'জনকেই, এ-সব লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল তাদের? কিন্তু নবকিশোর যদি বলে, ছবি স্বেচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, তখন কি জবাব দেবে প্রদীপ?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে প্রদীপ আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর উঠে গেল ওপরে। যে কামরায় প্রথমে ছবির সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, সেখানেই তারা প্রবেশ করেছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

সে দরজায় আঘাত করল। প্রথমে কোনই সাড়া এল না, তারপর শোনা গেল নবকিশোরের গলা, প্রশ্ন করছে, কে?

—দরজা খোলো, অত্যন্ত জরুরী। প্রদীপ বলল।

মিনিট দুই পরে দরজাটা একটুখানি খুলে মুখ বাড়াল নবকিশোর। দণ্ডায়মান প্রদীপকে দেখে সে প্রথমে হতভম্ব। আকস্মিকতার আঘাত খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, কি চাও তুমি প্রদীপদা'?

—দরজাটা ভালো করে খোলো, একটু শান্তভাবে বসতে দাও, বলছি।

—আমি বাইরে আসছি, তুমি একটু অপেক্ষা কর।

অসহিষ্ণুভাবে প্রদীপ জবাব দিল, বাইরে অপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত নই, আমাকে ভেতরে যেতে হবে।

এবার নবকিশোর স্বমূর্ত্তি ধারণ করল। বলল, লাটসাহেব এসেছেন আর কি! এরকম জুলুম করবার কি অধিকার তোমার আছে? আমি তোমাকে ভেতরে আসতে দেব না।

—দিতেই হবে। দৃঢ়স্বরে প্রদীপ জবাব দিল।

নবকিশোর স্বর একটু নরম করে অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, কেন একটা সীন করছ, প্রদীপদা'? তুমি যা সন্দেহ করছ তা নয়। কোন অসদুদ্দেশ্যে ছবিকে আমি এখানে নিয়ে আসিনি, নিয়ে এসেছি নিরিবিলিতে ওর সঙ্গে কয়েকটা বিষয় আলোচনা করতে।

—সেটা ছবির মুখ থেকেই শুনতে চাই। বলে নবকিশোরের আপত্তির অপেক্ষা না রেখেই তাকে ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল। নবকিশোরও এল তার পেছনে পেছনে, দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল।

প্রদীপ চোখ বুলিয়ে নিল ঘরটার চারদিকে। আসবাবপত্র ঠিক একই আছে, এমন কি স্বামী বিবেকানন্দের ছবিটিও। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেখল ডিভ্যানের আবরণী বদলান হয়েছে। আর টেবিলের বাতিটা জ্বলছে না।

ছবি বসে আছে ডিভ্যানের উপর। এক পাশে তার হ্যাণ্ডব্যাগ। পা নগ্ন, শান্তিনিকেতনী চটিটা পড়ে আছে টেবিলের নীচে।

স্থির অচঞ্চল চোখে ছবি প্রদীপের দিকে তাকাল।

প্রদীপ প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গেল। সে আশা করেছিল, ছবিকে দেখবে নতমুখী, অশ্রুসজল। এই উদ্ধত রূপ সে প্রত্যাশা করেনি।

প্রশ্ন করল, নবকিশোর এখানে কি উদ্দেশ্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে ছবি?

—যে উদ্দেশ্যে আপনি এখানে এসেছিলেন এক বছর আগে। ছবি জবাব দিল। তীক্ষ্ণ জবাব, দ্বিধা বা জড়তার চিহ্নমাত্র নেই।

—কতদিন এ-সব চলছে?

—তাতে আপনার প্রয়োজন? ছবি পালটা প্রশ্ন করল।

—প্রয়োজন আছে। আমি চেষ্টা করেছিলাম এ পথ থেকে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে। নবকিশোরকে ভার দিয়েছিলাম, সে আশ্বাসও দিয়েছিল আমাকে।

—সে প্রশ্নটা আমাকে না ক'রে আপনার বন্ধুকেই করুন না?

প্রদীপ এবার অন্য প্রশ্ন করল।—আমি জানতে চাই, তুমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ কি না?

—সেটা কি আমার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা থেকে বুঝতে পারছেন না? আজ-কাল জোর ক'রে কেউ কাউকে নিয়ে আসতে পারে? ছবি জবাব দিল।

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

নবকিশোর এবার কথা বলল।—তুমি খুসী হয়েছ আশা করি, প্রদীপদা'! যাক্, মুখোমুখি কথা হয়ে গেল, এক হিসেবে ভালই হ'ল। এরপর তোমার কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

—তুমি থাম, নবু! তিক্তকণ্ঠে প্রদীপ্ত বলল। তারপর ছবির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার ভুল হয়েছে, ছবি, আমাকে ক্ষমা করো।

ছবির ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল, সে যেন চেষ্টা করল কিছু বলতে। প্রদীপ অপেক্ষা করল আরও মিনিট দুই, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল।

বাইরের ক্যাডিলাকটার দিকে আর একবার তাকাল, তারপর হন-হন করে সে ছুটল বাসষ্টপের দিকে।

কল্পনার আর একটা প্রতিমা আজ ভাঙ্গল, নির্ম্মমভাবে, অকরুণ প্রহারে। কেন এমন হয়? মানুষকে বিশ্বাস করতে সে চায়, কিন্তু মানুষ কেন এমন ব্যবহার করে, যাতে বিশ্বাসের ভিত্তি গোড়া থেকে নড়ে ওঠে? নবকিশোরকে সে মনে করেছিল মহান্, উদার, কিন্তু এখন সে দেখতে পেল তার বাইরের

মহানুভবতার পেছনে লুকিয়ে আছে কুটিল পঙ্কিলতা, পরোপকারবৃত্তির স্থান অধিকার করে আছে নগ্ন লুব্ধতা! অবশ্য এর আগে—যখন ছবির সঙ্গে তার শেষ দেখা হয় প্রিন্সেপ ঘাটে—তার সন্দেহ একটু হয়েছিল, কিন্তু স্বভাবসুলভ প্রত্যয়ে সন্দেহকে সে বেশী দিন মনে স্থান দেয়নি।

নবকিশোরের অপরাধ কি খুবই গুরুতর? ছবির সম্পূর্ণ সম্মতি না পেলে সে কি সাহস করত তার নবার্জ্জিত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে? প্রদীপ শুনেছে, পড়েছে, যে বিলেত দেশে এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটে থাকে, তা নিয়ে বাইরের লোকে মাথা ঘামায় না কখনও। দুটি ছেলে-মেয়ে পরস্পরকে যদি পছন্দ করে, তাহলে বিয়ের অনুষ্ঠান নাকি তাদের কাছে নিতান্তই গৌণ!

কিন্তু ছবিকে কি বিলেতের স্বাধীনা নারীদের পর্য্যায়ে ফেলা যায়? তার স্বাধীনতা কি অধীনতারই নতুন সংস্করণ নয়? কৈশোরের প্রারম্ভ থেকে যে ঝড়ঝাপটার মধ্য দিয়ে ছবির দিন কেটেছে, তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ? তার কাছ থেকেও ছবি কতটুকু সাহায্যই বা পেয়েছে? নবকিশোরের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েই সে খালাস হয়েছিল, তার কি উচিত ছিল না নিজে ছবির তত্ত্বাবধান করে? ওদিকে যে তার ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছে, তার প্রতি সাধারণ একটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশও যে করা দরকার। ছবি যদি তার যৌবনের উপঢৌকন দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকে, তাতে প্রদীপের প্রতিবাদ করবার কি অধিকার আছে?

তবু, তবু—প্রদীপ কেবলই ভাবতে লাগল, তবু এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। নবকিশোরকে সে ক্ষমা করতে পারবে, কিন্তু ছবিকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে ছবি, ধুলোকাদায় টেনে এনেছে কল্পনার বিগ্রহ। সে ত ছবির কোন ক্ষতি করেনি, তবে?

সপ্তাহখানেক পরে সে আবার গেল গায়ত্রীর কাছে। এর মধ্যে নিজেকে সে খানিক সামলে নিয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মস্থ হ'তে পারেনি।

প্রখর দৃষ্টিতে গায়ত্রী বুঝল, এমন একটা কিছু ঘটেছে, যাতে প্রদীপের মন হয়ে পড়েছে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত।

—বন্দনার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়নি ত? গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

সুপ্তোত্থিতের মত প্রদীপ জবাব দিল, বন্দনা? না ত! একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ দিদি?

—তোমার মনটা যেন তোমার শরীরের ভেতর নেই!

—মনটা সত্যি ভাল নেই, দিদি!

—বন্দনাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আসবে বলেছিলে, আনলে না ত?

—ওদের ওখানে যাওয়া হয়ে ওঠেনি', এর পর যেদিন যাব ওকে জিজ্ঞাসা করব।

—ওর ভাই-এর সঙ্গে তোমার খুব ভাব, না?

—এককালে ভাব ছিল, এখন সে ক্যাডিলাক্ গাড়ী হাঁকিয়ে বেড়ায়।

—হুঁ, বুঝেছি।

—তারপর গায়ত্রী প্রশ্ন করল, বন্দনাকে দেখবার জন্য তোমার মন ব্যাকুল হয় না প্রদীপ?

—হয়ত হয়, হয়ত বা হয় না।

—এ আবার কি ধরণের জবাব?

—মনস্তত্ত্ব একটু-আধটু তুমি নিশ্চয়ই বোঝ দিদি! নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ করলে ও-পক্ষ একটু কম ব্যাকুল হবে, তাই দর বাড়াবার চেষ্টা করছি!

—যত সব বাজে কথা। তিরস্কারের সুরে গায়ত্রী বলল। যত শীগগির সম্ভব বন্দনাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি ওর সঙ্গে কতকগুলো কথা আলোচনা করতে চাই।

—অর্থাৎ তুমি জানতে চাও, বন্দনা আমাকে সত্যি ভালবাসে কি না। অথবা, কতটুকু ভালবাসে?

—যদি তাই আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাতে দোষ আছে কি? আমি তোমার দিদি, আমাকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে যদি তুমি এগোতে রাজী না থাক।

—দোহাই তোমার দিদি, ঘটকালী করতে যেয়ো না। বিয়ের কথা আমি এখন ভাবতেই পারিনে, তা' সে বন্দনাই হোক আর সুমিত্রাই হোক।

প্রদীপের বলার ভঙ্গীতে গায়ত্রী না হেসে পারল না।

গায়ত্রীর নির্দ্দেশমত পরের দিন সে গেল অটলবিহারীর ওখানে। প্রদীপের ভাগ্য ভাল, অটলবিহারী বা নবকিশোর দু'জনের কেউই সেদিন বাড়ীতে উপস্থিত ছিল না।

প্রদীপ সোজাসুজি বলল, গায়ত্রীদি' তোমাকে দেখতে চান, বন্দনা।

বন্দনা কাতরকণ্ঠে বলল, কেন আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ? কারো সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।

—কিন্তু আমি যে কথা দিয়েছি বন্দনা! তাছাড়া, এত দিন তুমিও ত তেমন গভীরভাবে অমত জানাওনি?

বন্দনা চুপ করে রইল। প্রদীপ বলল, শুধু একটি দিনের জন্য চলো। তারপর তোমার ইচ্ছে না হয় আর যেয়ো না।

—তোমার মুখে তোমার দিদির কথা যা শুনেছি, তাতে ঐ একটি দিনও তাঁর সম্মুখীন হতে আমার ভয় হয়। তিনি বড় বুদ্ধিমতী।

—তাতে ভয়ের কি আছে? বুদ্ধি ব্যবহার ক'রে তিনি ত তোমাকে খেয়ে ফেলবেন না!

বন্দনা অবশেষে রাজী হ'ল যে এক দিন প্রদীপের সঙ্গে গায়ত্রীর ওখানে যাবে।

তারপর সে বলল, তোমার সঙ্গে দু'-একটা বিষয়ে পরামর্শ করার আছে প্রদীপ! তুমি ছাড়া আর কা'কেই বা বলব? তুমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আর কাউকে জানতে দিও না, তোমার দিদিকেও নয়।

—বলো।

—আমার বাবা এবং দাদা ছু'জনকে নিয়েই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছি আমি। প্রথমে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে এসেছে ওদের কর্ম্মপদ্ধতি।

—খুলেই বলো না!

—বাবা অনেক দিন থেকেই ব্ল্যাকমার্কেটিং করছেন, কিন্তু এখন যেন সেটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লাভের পর লাভ ক'রে তাঁর ক্ষিদে যেন ক্রমশঃ বাড়ছে, আগে যে সঙ্কোচ, সহিষ্ণুতাটুকু ছিল, তাও যেন দিন দিন লোপ পেয়ে আসছে। এই সেদিন শুনলাম, কোথাকার মাল কোথায় সরিয়ে তা বিক্রী করলেন প্রায় দশ গুণ দামে। অধিকাংশ কারবার করেন টেলিফোনে, কেবল টাকাটা নেন স্বহস্তে। তাও পার্টির কাছ থেকে নয়, ছু'একজন লোকের মাধ্যমে। আমার কেবলই ভয় হয়, এক দিন যদি ধরা পড়ে যান তাহ'লে কি উপায় হবে? যারা মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে, তারাই যদি এক দিন ধরিয়ে দেয় বাবাকে?

—তোমার বাবাকে বলো না, যথেষ্ট টাকা ত উপার্জ্জন করেছেন, এখন একটু বিরতি দিলে ক্ষতি কি?

—আমি ঐ রকম একটা কথা এক দিন বলেছিলাম। বাবা এমন রেগে গেলেন যে, আমাকে চুপ করে যেতে হ'ল। বললেন, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে টাকা রোজগার করছেন, কাউকে ভয় করেন না তিনি। কিন্তু আমি ত জানি, উপার্জ্জনটা মোটেই ন্যায়সঙ্গত নয়।

—আর তোমার দাদা?

—দাদা বেশ আছেন। বাবাকে নানা রকম ফন্দী বাৎলে দেন। মাঝে মাঝে বিজিনেস্‌ও এনে দেন, বাবা বক্‌শিস হিসেবে মুঠো মুঠো টাকা তুলে দেন দাদার পকেটে। আমার ধারণা, দাদা বাইরেও বেশ কিছু রোজগার করেন, যার খবর বাবা রাখেন না!

—তোমার দাদা যদি সাধুভাবে উপার্জ্জন করেন, তাহ'লে ভয়ের কি আছে?

—ঐখানেই ত আমার ঘোরতর সন্দেহ! যে লোক রাত বারোটা একটার আগে বাড়ীতে ফেরে না, যদিও বা ফেরে তাও মদে চুর হয়ে, তার সাধুতায় আস্থা স্থাপন করা যায় কি? তা ছাড়া, অন্যান্য বদখেয়ালও যে দাদার হয়েছে, তার পরিচয়ও পেয়েছি।

—তুমি এ সম্বন্ধে ভেবে কি করতে পারবে বন্দনা? ওদের যা' হবার হবে।

—আমি ত ততটা নির্লিপ্তভাবে থাকতে পারি না, প্রদীপ! ওদের অপমানে যে আমারও অসম্মান।

—তুমি ভেবো না বন্দনা! ওরা তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে, সহজে ধরা দেবে না।

সতেরো

দেখতে দেখতে আরও কয়েক মাস কেটে গেল। এসে পড়ল ১৯৪৫ সাল। চারদিকে যুক্তশক্তির জয়জয়কার, ইউরোপের নানা প্রাঙ্গণে হঠছে মুসোলিনি এবং হিটলার, জাপান হঠছে এশিয়ায়। "আজাদ হিন্দ ফৌজ" মণিপুর থেকে নিয়ে গেছে তাদের ঘাঁটি। বৃটেন পুনরধিকার করেছে সমস্ত বর্ম্মাদেশ।

ওদিকে বিলেতে নতুন নির্ব্বাচনের জোর আয়োজন চলেছে। নির্ব্বাচনে ভোট দেবে জনসাধারণ, যারা দেখতে চায় সর্ব্বত্র সাম্য এবং স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। তাই বৃটেনের রক্ষণশীল দলও হয়ে উঠল সচেষ্ট, যাতে তাদের অপবাদ না দেওয়া হয় যে তারা অত্যাচারী, শোষক। এই পরিস্থিতিতে মুক্তি দেওয়া হ'ল অধিকাংশ কংগ্রেস-নেতাকে, যাঁদের আটক ক'রে রাখা হয়েছিল বিয়াল্লিশ সাল অবধি। জ্যোতির্ম্ময়বাবুও ছাড়া পেলেন।

তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই এল জার্ম্মাণীর আত্মসমর্পণ। ওদিকে বৃটেনের নির্দ্দেশে লর্ড ওয়াভেল নিমন্ত্রণ করলেন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু সিমলা কনফারেন্স হ'ল ব্যর্থ।

জুলাই মাসে বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলকে নিদারুণভাবে হারিয়ে দিয়ে শ্রমিক দল গঠন করল নতুন গভর্ণমেণ্ট। ভারতবর্ষের হাওয়াও যেন একটু বদলাতে সুরু করল। তারপর হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে পড়ল আণবিক বোমা, জাপানও পরাজয় স্বীকার করল।

ঘটনাবলীর দ্রুত ছন্দের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না প্রদীপ। জ্যোতির্ম্ময়বাবু মুক্তি লাভ করার হপ্তা খানেকের মধ্যেই সে তাঁর কাছে গিয়েছিল। সে লক্ষ্য করল, আগের মত সস্নেহে জ্যোতির্ম্ময়বাবু তাকে অভ্যর্থনা করলেন না। কুশলসূচক দু'-একটা কথা বলেই তিনি তাকে বিদায়

দিলেন। প্রদীপ বুঝল, সুমিত্রা তার বিরুদ্ধে ইন্ধন জোগাতে ত্রুটি করেনি। ক্ষুণ্ণ অভিমান নিয়ে প্রদীপ ফিরে এল বরানগরে।

অটলবিহারী বাবু এবং নবকিশোর এর আগে থেকেই তার প্রতি বিরূপ ছিলেন, তাঁদের বৈরিতার পরিবর্ত্তন ঘটল না একটুও। তবে, অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে প্রদীপ লক্ষ্য করল, কারাপ্রত্যাগত জ্যোতির্ম্ময়বাবুর সঙ্গে অটলবিহারীর সৌহার্দ্দ্য যেন বেড়ে চলেছে।

একটা দিনের কথা প্রদীপের খুবই মনে আছে। কলকাতায় সে এসেছিল —জ্যোতির্ম্ময়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁকে বলতে যে, কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাকে দেওয়া হোক্। সৌভাগ্যক্রমে জ্যোতির্ম্ময়বাবুর বসবার ঘরে অভ্যাগতদের ভিড় সেদিন অনেক কম ছিল।

প্রদীপের অনুরোধ তিনি নীরবে শুনলেন। তারপর বললেন, আমার ত মনে হয় না তুমি কোন কাজ করতে পারবে। তুমি যে কাজের বাইরে চলে গেছ!

প্রদীপ অত্যন্ত আহত বোধ করল। তবু শান্তভাবে সে বলল, আপনি একথা কেন বলছেন বুঝতে পারলাম না।

অসহিষ্ণুভাবে জ্যোতির্ম্ময়বাবু জবাব দিলেন, নিজের ত্রুটি বা অক্ষমতা অনেকে বুঝতেই পারে না, পারলেও বুঝতে চায় না। মেদিনীপুরে তুমি নিশ্চয়ই গৌরব অর্জ্জন ক'রে আসোনি! মেদিনীপুরের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারপর এত দিন বাইরে ছিলে, কংগ্রেসের কি কাজ করেছ তুমি? দুর্ভিক্ষের সময় পর্য্যন্ত তুমি যোগ দিলে অন্য দলে, সুমিত্রা তোমাকে বলল, কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করতে, তুমি তার অনুরোধও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলে।

—কিন্তু কোন দলে ত আমি যোগ দিইনি, জ্যোতির্ম্ময় বাবু! সুমিত্রা বলবার আগেই আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে কাজ করেছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা কি শোভন হ'ত? মিশন যে সব দলাদলির বাইরে!

তিক্তস্বরে জ্যোতির্ম্ময়বাবু বললেন, অপরাধ স্খালন করবার জন্য নজিরের

অভাব হয় না তোমাদের কোন দিনই। স্পষ্ট কথা তোমাকে বলছি, আমাদের কাজ করতে হ'লে যে নিষ্ঠা, যে ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা উচিত, তা' তোমার নেই। তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তোমার নিজের রাজ্যে বিচরণ করতে পার, আমার কাছে এসো না।

প্রদীপ আর সহ্য করতে পারল না। ব'লে উঠল, তবু যদি না দেখতাম যে আপনাদের নিষ্ঠা রূপায়িত হচ্ছে কালোবাজারের মহারথীদের সঙ্গে নতুন-পাওয়া বন্ধুত্বে!

—তার মানে? একটু সমঝে কথা বলো, প্রদীপ! জ্যোতির্ময়বাবু রাগে লাল হয়ে উঠলেন।

—মানে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনার মত বুদ্ধিমান—

প্রদীপের কথা শেষ হ'ল না। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সুমিত্রা—বাইরে যাবার পোষাকে সজ্জিতা, সুরুচিসম্পন্না খদ্দরের শাড়ী এবং ব্লাউজ, হাতে ছাপানো খদ্দরে তৈরী ব্যাগ। বলল, নবকিশোর বাবু গাড়ী নিয়ে এসেছেন, আমি ওঁর সঙ্গে যাচ্ছি আমাদের প্রগতিসংঘের অনুষ্ঠানে, সীনেমা দেখে বাড়ী ফিরব। তুমি আমার জন্যে বসে থেকো না যেন, বাবা!

তারপর প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল, আরেক দিন সময় ক'রে এলে খুশী হ'ব।

শ্লেষাত্মক হাসি হেসে প্রদীপ জবাব দিল, সে সুযোগ বা সুবিধে কোন দিন হবে বলে মনে হয় না। আমি এখন অপাংক্তেয়। বলে সুমিত্রা বা জ্যোতির্ময় বাবুকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল প্রদীপ।

সুমিত্রা অবাক-বিস্ময়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার বাবার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে নবকিশোরের ক্যাডিলাকে চড়ল।

বন্ধু বলতে রইল শুধু গায়ত্রী আর বন্দনা। কিন্তু গায়ত্রীর সাহচর্য্যও প্রদীপের কাছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। মিঃ কর বুঝতে পেরেছিলেন যে, হাওয়া

বদলে গেছে, পরিবর্ত্তিত এই পরিস্থিতিতে নিজেকে ঢালতে হবে নতুন ছাঁচে। তিনি সাহায্য চাইলেন গায়ত্রীর এবং গায়ত্রী তার সমস্ত বুদ্ধি এবং ক্ষমতা নিয়োগ করল এই পরিবর্ত্তনকে সহজ এবং সরল করে আনতে। তার ফল হল এই যে, প্রদীপ যখনই গায়ত্রীর কাছে আসত, দেখত সে অত্যন্ত ব্যস্ত, হয় কথা বলছে কোন এক মহিলা সমিতির সদস্যার সঙ্গে, নতুবা টেলিফোনে সম্ভাষণ জানাচ্ছে কংগ্রেসের কোন উপনেতাকে।

একদিন বিরক্ত হয়ে প্রদীপ বলল, আমি তোমার কাছে আর আসব না।

—কেন ভাই? গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

—আজ-কাল তোমার দেখা পাওয়াই ভার। সর্ব্বদা তুমি ব্যস্ত, আমাকে এতটুকু সময়ও তুমি দাও না! মুখ ভার করে প্রদীপ বলল।

—তুমি বুঝতে পারছ না, প্রদীপ, ওঁর জন্যে আমাকে অনেক কিছু করতে হচ্ছে। সবাই বলছে এবার ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবেই। স্বাধীনতা পাওয়া মানেই হচ্ছে কংগ্রেসের ক্ষমতা লাভ। এত কাল যিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছেন, কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে এটা প্রমাণ করা কি সহজ কথা? আমি না করলে এ কাজ কে করবে?

—তুমিও অবশেষে প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছ, দিদি? কি প্রয়োজন মিঃ করের কংগ্রেসের বন্ধু হবার? উনি যা ছিলেন, তাই থাকুন না কেন, আমরা যারা ওঁকে জানি, ওঁকে কম শ্রদ্ধা করব না!

—সে হয় না প্রদীপ! উনি এখনই বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে যেতে চান না। এত দিন ক্ষমতা ব্যবহার করে যে রক্তের আস্বাদ উনি পেয়েছেন, তা ভুলবেন কি করে? আজ যদি ওঁকে পেনসন নিয়ে কোথাও চলে যেতে হয়, তাহলে উনি বাঁচবেন না। আমি, তাঁর স্ত্রী, কি করে তা সহ্য করব? তাই আমাকে নামতে হচ্ছে কর্ম্মক্ষেত্রে, ওঁর আগামী জীবনটা সহজ করে তোলবার প্রয়াসে।

অকাট্য যুক্তি! তর্ক করা নিরর্থক। প্রদীপ চুপ করে রইল।

গায়ত্রী বলে চলল, আমি জানি তুমি বলবে এই প্রচেষ্টার কি প্রয়োজন? সরকারী চাকুরী না করে উনি বেসরকারী কোন চাকুরী ত অনায়াসেই করতে

পারেন, ওঁর যা অভিজ্ঞতা তাতে কোনই অসুবিধে হবে না। হয়ত সত্যি, কিন্তু কি জানো, প্রদীপ, যারা একবার সরকারী, বিশেষ ক'রে ওঁর সার্ভিসের, চাকুরীর স্বাদ পেয়েছে, তারা বাইরে যেতে চায় না সহজে, বেশী টাকা পেলেও। এখানে আছে নিরাপত্তা, সম্মান, ক্ষমতা। তাছাড়া inertia ব'লে একটা কথা অভিধানে আছে জানো বোধ হয়? যারা পনেরো কুড়ি বছর সরকারী চাকুরী করেছে তারা এই inertiaর দাস। এই inertia কাটিয়া উঠতে যাঁরা পারেন তাঁরা অসাধারণ। মিঃ কর সেই শ্রেণীর লোক নন।

প্রদীপ বুঝল, তার আর গায়ত্রীর মধ্যে যে প্রাচীর গড়ে উঠেছে, তা' শুধু সময়াভাবের প্রাচীর নয়, সে হচ্ছে জীবনকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপে দেখবার প্রাচীর। তার হাসি পেল এই ভেবে যে, যখন সে ছিল বিদ্রোহীদলের অন্যতম এবং মিঃ কর ছিলেন তার প্রতিপক্ষ, তখন গায়ত্রীর সঙ্গে একটা স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠতে বাধার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এখন—যখন তারা বলতে গেলে নেমে এসেছে একই মঞ্চে, তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে বিরোধের সূচনা।

প্রদীপ স্থির করল, সে যথাসম্ভব চেষ্টা করবে গায়ত্রীকে এড়িয়ে চলতে। কিন্তু চেষ্টার প্রয়োজন হ'ল না, কারণ, মিঃ কর হঠাৎ বদলী হ'য়ে গেলেন মফঃস্বলে, এবং তাঁর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে চলে গেল গায়ত্রী।

বন্দনার কাছে প্রদীপ গেল খুবই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। চারদিক থেকে আঘাত খেয়ে তার ধারণা বদ্ধমূল হ'তে সুরু করেছিল যে, সে নিতান্ত একা, তাকে বুঝতে পারে না কেউ, চেষ্টা পর্য্যন্ত করে না। তাছাড়া সে দেখছিল যে, সাধারণ লোকে যে-সব নীতি বা পরিস্থিতি গ্রহণ করে সহজভাবে, অম্লানচিত্তে তা' তার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনে সম্পূর্ণ অন্যরকমের প্রতিক্রিয়া। সে খাপছাড়া, সংসারের মধ্যে বেসুর সৃষ্টি করাই তার স্বভাব, এই অনুভূতি তাকে পীড়িত করে তুলল।

সহানুভূতি পাবার যে একটিমাত্র জায়গা ছিল গায়ত্রী, সে-ও চলে গেল দূরে

—শুধু মনের দিক দিয়ে নয়, স্থূল নৈকট্যের দিক দিয়েও। এখন বাকী রইল বন্দনা।

দেখল, বন্দনার মুখ বর্ষণোন্মুখ মেঘে আচ্ছন্ন। সে প্রদীপকে অভ্যর্থনা করল সৌজন্যসূচক শীতল ব্যবহারে।

—গায়ত্রীদি'র স্বামী, মিঃ কর, কলকাতা থেকে বদলী হয়ে গেছেন, বন্দনা! ওঁরা পরশু দিন চলে গেলেন। প্রদীপ বলল।

বন্দনা কোন জবাব দিল না। প্রদীপের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে একবার গায়ত্রীর ওখানে গিয়েছিল—প্রদীপের সঙ্গে। সেখানে কোন একটা কাজের ছল করে প্রদীপ বাইরে চলে এসেছিল এবং ঘণ্টাখানেকের জন্য তারা দু'জনে, গায়ত্রী আর সে, ছিল একা। গায়ত্রীকে তার নেহাৎ খারাপ লাগেনি, কিন্তু আই-সি-এস-এর বাংলোতে এই তার প্রথম পদার্পণ; গায়ত্রীর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি আচরণ সে বিচার করেছিল তার স্বরচিত মাপকাঠিতে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়েছিল, গায়ত্রী যেন অহেতুক অনধিকার চর্চ্চা করছে। প্রদীপের সঙ্গে গায়ত্রীর স্নেহের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে গায়ত্রী কেন চেষ্টা করবে বন্দনার মনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতে? ফল হয়েছিল এই যে, গায়ত্রীর প্রশ্নের আলোক-সম্পাত থেকে বন্দনা নিজেকে গোপন করে রেখেছিল খানিকটা রূঢ়ভাবেই। এই এক ঘণ্টার পরিচয় দু'জনের কারো পক্ষেই সন্তোষজনক হয়নি। তাই গায়ত্রীর কলকাতা থেকে প্রস্থানের সংবাদ তার মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা আলোড়নের সৃষ্টি করল না।

প্রদীপ আবার বলল, একটা জায়গা ছিল, যেখানে গিয়ে কয়েক মিনিট কথা বলে আনন্দ এবং শান্তি পেতাম। সেটাও হারালাম।

এবার বন্দনা মুখ খুলল। বলল, কেন, ছবিও কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে না কি?

ছবি? এ কি প্রশ্ন করছে বন্দনা? ছবির কথা কে তাকে বলল? কি শুনেছে বন্দনা? বোকার মত তাকিয়ে রইল প্রদীপ।

বন্দনা বলল, একটু অবাক্ হয়ে যাচ্ছ, না? ভাবছ, বন্দনা কি করে তোমার জীবনের গোপনতম অধ্যায়টা জানতে পারল? দেখ, এসব ব্যাপার বেশী দিন চাপা থাকে না।

—তোমাকে নবকিশোর বলেছে বুঝি? এবার প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—যাক, সম্পূর্ণ অস্বীকার যে করোনি, এ-ও আমার পরম সৌভাগ্য! তা' দাদা যদি বলেই থাকেন তাতে অন্যায় হয়েছে কি? আমার ত মনে হয়, দাদা আমার উপকারই করেছেন।

—কিন্তু তুমি আমার দিক্‌টা একবারও শুনবে না, বন্দনা? তার স্বরে কাতর আকুলতা!

—শোনবার কি আছে বলো? বলবে যে ক্ষণিকের খেয়ালে তুমি গিয়েছিলে, দুর্ভিক্ষের আর একটা দিক ওর সঙ্গে পরিচিত হতে? অথবা বলবে যে, তোমার কোনই অসাধু উদ্দেশ্য ছিল না, তুমি গিয়েছিলে তাকে পঙ্কিলতার গহ্বর থেকে তুলে আনতে? দাদার আর যে দোষই থাকুক না কেন, তোমার এই সাময়িক দুর্ব্বলতার স্বপক্ষে ওকালতি করতে এতটুকু ত্রুটি করেনি! হাজার হোক, সে তোমার বন্ধু, তোমাকে শ্রদ্ধা করে!

প্রদীপ এক দিকে যেমন স্তম্ভিত, অপর দিকে তেমনি ঘর্ম্মাক্ত হয়ে উঠল। নবকিশোর অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সে এমন ভাবে বলেছে, বন্দনার যেন কিছুতেই মনে না হয় যে সে অকারণ কুৎসা করে বেড়াচ্ছে! আর এই অধ্যায়ে তার, নবকিশোরের, যে অংশ তা নিশ্চয়ই বেমালুম গোপন করে গেছে!

বন্দনা বলে চলল, দাদা কি সহজে বলতে চায়! কি কথায় কথায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল তোমার এই কীর্ত্তির কথা। আমি যতই পীড়াপীড়ি করি, ততই সে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। তারপর যখন বলতে বাধ্য হ'ল, তখনও চেষ্টা করল প্রমাণ করতে যে, তোমার কোনই দোষ ছিল না।

—প্রথম থেকেই ছবির কথা তোমাকে না বলে যে মূর্খতা করেছি তার প্রতিফল পাচ্ছি আজ। কিন্তু বিশ্বাস ক'রো, আমি এমন কোন কাজ করিনি যার জন্যে বিবেকের কাছে আমি লজ্জিত বোধ করতে পারি।

—প্রত্যেকের বিবেক স্বতন্ত্র, প্রদীপ! বিশেষ করে পুরুষ মানুষের বিবেক। কাজেই, তোমার বিবেকের কাছে তুমি সাফাই থাকতে পার স্বচ্ছন্দে। তুমি না আমাকে ভালবাস?

প্রদীপ চুপ ক'রে রইল।

তীব্র কণ্ঠে বন্দনা বলে চলল, তবু আমার একটা সান্ত্বনা থাকত, যদি শুনতাম, তুমি আসক্ত হয়েছ ভদ্রঘরের কোন মেয়ের প্রতি। কিন্তু এ কি তোমার রুচি? প্রেম নিবেদন করবার আর পাত্রী পেলে না? যে সকলের উপভোগের সামগ্রী, তার দিকেই ঝুঁকল তোমার কামনা? ঘৃণায়, অপমানে আমি মরে যাচ্ছি, প্রদীপ!

প্রদীপ আর একবার চেষ্টা করল তার প্রতিবাদ জানাতে, কিন্তু প্রতিবাদ ভাষা হয়ে প্রকাশ পেল না।

বন্দনা বলল, আমি তোমাকে সত্যি ভালবেসেছিলাম, প্রদীপ, খুবই গভীর-ভাবে ভালবেসেছিলাম। পৃথিবীতে তুমি যে নিতান্তই একা, সেটাও বুঝতে পেরেছিলাম। তুমি যদি নিজে এসে আমাকে বলতে যে একাকীত্বের বোঝা বইতে না পেরে তুমি সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়েছিলে ছবির আলিঙ্গনে, তাহ'লেও আমি সইতে পারতাম আমার এ অপমান। আমি যা তোমাকে দিতে পারছি না, তা' তুমি, পুরুষ মানুষ, খুঁজছ অন্যের কাছে, এটা অপ্রিয় হ'লেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তুমি সে পথও আমার জন্যে খোলা রাখলে না! বলতে বলতে বন্দনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সসঙ্কোচে প্রদীপ বন্দনার গায়ের উপর তার হাতখানা রাখল। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত বন্দনা ছিটকে দাঁড়াল প্রদীপের এবং নিজের মাঝখানে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। বলল, আমার গায়ে হাত দিয়ো না প্রদীপ! তোমার স্পর্শও আমার কাছে অশুচি। আমাদের বাড়ীতে তুমি আর এসো না, আমি যে প্রদীপকে জানতাম, ভালবাসতাম, সে মরে গেছে, মরে গেছে!

বন্দনার শেষ কথাগুলো ডানাহীন পাখীর মত ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের চারদিকে। মাথা হেঁট করে প্রদীপ বেরিয়ে এল।

যাক, শেষ বন্ধনও আলগা হয়ে এল ! প্রদীপ এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, কাজ অকাজ, বিলাস আলস্য কোন কিছুর জন্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে না, কারো কাছে।

কিন্তু এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ত তাকে আনন্দ বা তৃপ্তি দিচ্ছে না এতটুকু ! দেশ স্বাধীন হলে মানুষের মনে জাগে উল্লাস, আর মানুষ যখন স্নেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, তখন জীবন কেন মনে হয় দুর্ব্বহ ?

সে স্থির করল, ভারতবর্ষে আর থাকবে না। এখানকার প্রত্যেকটি পাতা, প্রত্যেকটি ফুল, প্রত্যেকটি মাটির কণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে বন্ধনের স্মৃতি। যত দিন সে এখানে থাকবে এই সব পুরানো চিহ্ন তাকে করবে উপহাস। তাকে চলে যেতে হবে দূরে, অনেক দূরে, যেখানে অতীতের তীক্ষ্ণ ফলক তাকে প্রতিনিয়ত আঘাত দেবে না।

কোথায় সে যাবে ? সে যাবে বৃটেনে, যে বৃটেন ভারতবর্ষকে করে রেখেছে পদানত। সেখানেই সে থাকবে, যত দিন দেশ স্বাধীন না হয়। এটা হবে তার এক প্রকারের শাস্তি। অপরাধের শাস্তি যদি সে গ্রহণ না করে তাহ'লে মনে শান্তি আসবে না কিছুতেই।

কিন্তু পাথেয় জোগাবে কে ? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সমুদ্রযাত্রা এখন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু জাহাজের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ভাড়াও ত কম নয় !

না, আত্মসম্মান সে বিসর্জ্জন দিয়েছে অনেক আগেই। আর একটু বেশী বিসর্জ্জন দিলে ক্ষতির অঙ্ক নিশ্চয়ই খুব বেশী বাড়বে না।

গায়ত্রীর কাছে চিঠি লিখল সে, তার অভিপ্রায় জানিয়ে। লিখল, আমার উচ্ছৃঙ্খল মনকে কিছুতেই এখানকার আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না, তাই বিলেতে যেতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন ভাড়ার টাকা, আর পাসপোর্টের দরখাস্তর উপর মিঃ করের স্বাক্ষর। যদি আমাকে সাহায্য করতে পার চির-ঋণী হয়ে থাকব।

গায়ত্রীর জবাব এল ফেরৎ ডাকে। লিখল, যদিও সে প্রদীপের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনুমোদন করছে না, তবু বাধার সৃষ্টি সে করবে না। তাই ইন্‌সিওর

করে হাজার টাকার ড্রাফ্‌ট তাকে পাঠান হল, সে যেন নিঃসঙ্কোচে ঋণ হিসাবে তা গ্রহণ করে। তাছাড়া পাসপোর্ট-এর জন্য তার দরখাস্ত যেন সে অবিলম্বে পাঠিয়ে দেয়। মিঃ কর তাতে স্বাক্ষর করতে রাজী হয়েছেন। আর বিলেতে পৌঁছে প্রদীপ যেন চিঠি লেখে এবং ভবিষ্যতে টাকার প্রয়োজন হলে তাকে যেন জানায়। কতদূর সে সাহায্য করতে পারবে এখন বলতে পারে না, তবে যথা-সাধ্য চেষ্টা সে করবে।

গায়ত্রীর চিঠি পেয়ে প্রদীপের চোখ ছল-ছল করে উঠল। পাসপোর্টের দরখাস্তের সঙ্গে যে চিঠি সে লিখল, তার মধ্যে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল : আই-সি-এস-এর গৃহিণীর ভাই হওয়াতে যে কত সুবিধে তা আজ আবার বুঝতে পারলাম, দিদি!

ছেচল্লিশ সালের মার্চ্চ মাসে প্রদীপ যখন কলকাতা থেকে একটা মালবাহী জাহাজে উঠল, তখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব নিয়ে বৃটিশ ক্যাবি-নেটের তিন জন মহারথী এসে পৌঁছেচেন দিল্লীতে। প্রদীপের কেবলই মনে হতে লাগল, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উৎসবে অংশ গ্রহণ করবার সৌভাগ্য তার হল না। দেশ যখন সত্যি স্বাধীন হবে, সে থাকবে অনেক দূরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে। এটা পরিহাস ছাড়া আর কি? ভবিষ্যতের গর্ভে তার জন্যে নিয়তির আরও কত বিচিত্র পরিহাস সঞ্চিত রয়েছে, কে জানে?

দ্বিতীয় পর্ব্ব

এক

প্রদীপের দেশ ত্যাগের খবর বন্দনা পেল হপ্তা দুই পরে। জাহাজে ব'সে কলম্বো থেকে প্রদীপ তার কাছে চিঠি লিখেছিল। সংক্ষিপ্ত চিঠি :

"বন্দনা,

চিঠির ওপরের ছাপ দেখেই বুঝতে পারবে, দেশ ছেড়ে আমি চলে এসেছি অনেক দূরে। আমার গন্তব্য স্থান বৃটেন, যাকে সচরাচর বলা হয় বিলেত। পাথেয় এবং মাস দুই থাকবার মত টাকা জোগাড় হয়েছে, ভবিষ্যতের ভাবনা পরে ভাবব।

দেশ ছেড়ে চলে আসায় আমি আনন্দ পেয়েছি এবং দুঃখও পেয়েছি। হেঁয়ালি না করে খুলে বলছি।

কিছুদিন থেকেই আমি অনুভব করছিলাম যে, দেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। যাঁদের এতদিন আপন ব'লে জানতাম, তাঁরা সবাই হয়েছেন আমার উপর বিরূপ। তার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী আমি, আর কেউ নয়। কিন্তু বাঁচতে হবে ত? তাই কাপুরুষের মত এই পলায়ন, এবং সেই পলায়নে সাময়িক আনন্দ।

যত দূর মনে হচ্ছে, দেশ বোধ হয় এবার সত্যি স্বাধীন হবে। দুঃখের কারণ এই যে, এই বিরাট পরিবর্ত্তনের মুহূর্ত্তে আমার থাকা হ'ল না, যে বিপুল উল্লাস তোমরা অনুভব করবে, তার অতি সামান্য একটি ঢেউ হয়ত গিয়ে পৌঁছবে বিলেতে। তবু দুঃখ করবার অধিকার আমার নেই, কারণ, স্বাধীনতার যুদ্ধে আমার অবদান কত সামান্য!

শেষ দিনে যে বিষয় নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে চিঠিতে কোন উল্লেখ করতে চাইনে, শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তুমি নবকিশোর বা অন্য কারো কাছ থেকে যা' শুনেছ তা' অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং পনেরো আনা মিথ্যে। আমি তোমার বা কারো প্রতি কোন অন্যায় করিনি।

ইতি

প্রদীপ।"

বন্দনা চিঠিখানা বার বার পড়ল, বিশেষ ক'রে শেষের লাইন কয়টি। কি বলতে চায় প্রদীপ? পনেরো আনা মিথ্যে? এক আনা তাহ'লে সত্যি, তার নিজেরই স্বীকৃতি অনুসারে। অভিযুক্ত হবার পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়?

তা ছাড়া, সত্যি যদি অন্যায় ক'রে না থাকে, তাহলে সে তার বক্তব্য খুলে বলছে না কেন? সেদিন না হয় বন্দনা তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছিল (করবার যথেষ্ট কারণ ছিল), কিন্তু এখন—দুস্তর সমুদ্র যেখানে তাদের মাঝখানে—চিঠিতে লিখবার মত সাহস কেন হ'ল না তার? এও আরেক ধরণের প্রবঞ্চনা, আলোছায়ার অন্তরালে বসে সহানুভূতি আকর্ষণের প্রয়াস।

বন্দনা নিজের মনকে আরও শক্ত, সুদৃঢ় করে রাখল।

সুমিত্রা খবরটা পেল নবকিশোরের মারফৎ। এটা একটা খবরের মত খবর বই কি! অবশেষে প্রদীপ, মেদিনীপুরের কংগ্রেসকর্ম্মী, বিয়াল্লিশ সালের একজন যোদ্ধা, চলল কিনা বিলেতে, তা'ও দেশ স্বাধীন হবার প্রাক্কালে!

জ্যোতির্ম্ময় বাবুও শুনলেন। বললেন, আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, ছেলেটার মতিস্থির নেই। এ তারই আর একটা নিদর্শন। আর আমি বুঝতেই পারছি না, এখন বিলেতে গিয়ে ও কি করবে? যুদ্ধ মাত্র শেষ হয়েছে, সারা ইংলণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে, চারদিকে অরাজকতা চলেছে শুনেছি, এই কি ওখানে যাবার সময়?

একটু পরেই অটলবিহারী বাবু এলেন সেখানে। তাঁর মুখেও সেই এক কথা, বিলেতে যাবার এ কি অদ্ভুত সময় নির্ব্বাচন করল প্রদীপ? সখ যদি হয়েছিল, তা' বছর দুই পরে গেলেই হ'ত। বিলেত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।

—আচ্ছা, ওকে টাকা দিল কে? জ্যোতির্ম্ময় বাবু প্রশ্ন করলেন।

—সেটাই একটা রহস্য রয়ে গেল। আজকালকার দিনে সহজে কেউ কাউকে একটা পয়সা দিতে চায় না, আর তার বিলেত যাবার খরচ যোগাচ্ছে। ছেলেটা ধুরন্ধর বটে!

—নবকিশোর দেয়নি ত? এক কালে প্রদীপের সঙ্গে ওর খুব ভাব ছিল।

—আরে নাঃ। আমারও একবার এই সন্দেহ হয়েছিল। নবকিশোরকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলল, তুমি পাগল হয়েছ বাবা? প্রদীপদা'র বিলেত যাবার খরচ দেব আমি?

—থাকগে ওসব প্রসঙ্গ। তারপর যে জন্যে আপনাকে ডেকেছি শুনুন। দেখছেন ত দেশের হাওয়ার গতি। বৃটিশসিংহকে অবশেষে লেজ গুটিয়ে প্রস্থান করতেই হবে। যত দূর মনে হচ্ছে, দেশকে দু' ভাগ করা হবে, এক ভাগে থাকবে মুসলমান, আরেক ভাগে থাকবে হিন্দু। অবশ্য গান্ধীজি এখনও রাজী হচ্ছেন না, কিন্তু তিনিও শেষ রক্ষা করতে পারবেন না। সে যাই হোক, কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না—এই মুসলমান-প্রধান বাংলা দেশেও। গঠনমূলক কাজের জন্য টাকার দরকার।

—আমি ত বরাবর আপনাদের ফাণ্ডে টাকা দিয়ে এসেছি, জ্যোতির্ম্ময় বাবু!

—অস্বীকার করছিনে, কিন্তু বিয়াল্লিশ সাল থেকে একেবারে বন্ধ রয়েছে। অবশ্য এজন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছিনে, কংগ্রেস যেখানে আসামীর কাঠগড়ায়, সেখানে তাকে সাহায্য করা একটু কঠিন। কিন্তু এই কয় বছরে ফাণ্ডের প্রাপ্যও কম হয়নি। তা ছাড়া, ঐ সামান্য টুটকো দানে চলবে না। এখন থেকে অঙ্কটায় আরেকটা শূন্য বসিয়ে দিন।

—তার মানে বছরে বিশ হাজার টাকা? অসম্ভব।

—অসম্ভব বললে কি করে চলবে অটলবাবু। আমরা যদিও জেলে ছিলাম, তবু বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার কিছু কিছু খবর রাখতাম। যুদ্ধের বাজারে আপনার কত মুনাফা হয়েছে তা' আমাদের অজানা নেই। তার সামান্য একটা অংশ সৎকাজে ব্যয় করতে বলছি। আরও বলছি, বিদেশী আমলে আপনারা যা' করেছেন, তা' আমরা ভুলে যাব, যদি এখন আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন।

—এ যে রীতিমত ব্ল্যাকমেল—

—ব্ল্যাকমেলই বলুন, আর স্পষ্ট ভাষণই বলুন, আপনাকে এখন থেকে বছরে বিশ হাজার টাকা দিতে হবেই—বকেয়াটা না হয় পুরোনো হারেই দেবেন, আমরা চশমখোর নই।

তারপর জ্যোতির্ম্ময়বাবু অন্য কথা পাড়লেন।

—আপনার ছেলের গতিবিধির দিকে নজর রাখছেন ত?

—কেন বলুন ত?

—আজকাল আমার বাড়ীতে বেশ ঘন ঘন যাতায়াত করছে। আমার অবশ্যি কোন আপত্তি নেই, যদি তার উদ্দেশ্য সাধু হয়ে থাকে। আমি আবার একটু সেকেলে লোক কি না! জেলে বসে গীতা আর মনুসংহিতা পড়ে কুসংস্কারগুলো বোধ হয় একটু বেড়েছে!

কি বলবেন অটলবিহারী ভেবে পেলেন না!

জ্যোতির্ম্ময়বাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, আমার মেয়ে নিজের তত্ত্বাবধান করতে জানে। তবু, বলা ত যায় না।—আপনি কোন সময় কথাপ্রসঙ্গে আপনার ছেলেকে আমার মতামত জানিয়ে দেবেন, কেমন?

বাড়ীতে ফিরে এসে অটলবিহারী ছেলেকে ডাকলেন। প্রথমে তাকে জানালেন কংগ্রেস ফাণ্ডের জন্য টাকা দাবী করার কথা।

নবকিশোর বেশ তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, এ আমি আগে থেকেই জানতাম।

অসহিষ্ণুভাবে অটলবিহারী বললেন, আগে থেকেই যদি জানতে তাহ'লে প্রস্তুত হওনি' কেন?—এখন প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা একসঙ্গে বার ক'রে দিতে হবে তা' বুঝতে পারছ?

—তাতে অসুবিধে কি? ব্যাঙ্কে ত অনেক টাকা আছে।

—টাকা যে আছে জানি, কিন্তু অদানে অব্রাহ্মণে নষ্ট করবার জন্যে এই টাকা আমি রোজগার করিনি'। কি কষ্ট ক'রে তিলে তিলে এই ব্যবসা গড়ে তুলতে হয়েছে তা তুমি কি বুঝবে?

নবকিশোর একটু হাসল। বলল, বাবা, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তুমি খুবই কষ্ট করে টাকা রোজগার করছিলে, এ আমি মান্‌তে রাজী আছি, কিন্তু গত সাত আট বছর তোমার যা' আয় হয়েছে, তা' প্রায় ঘরে বসে।—হ্যাঁ, বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে, অনেক রকম বিপদের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, কিন্তু পরিশ্রম বলতে সচরাচর যা' বোঝায়, তা' বিশেষ করতে হয়েছে কি?—শান্ত-ভাবে তুমি নিজেই ভেবে দেখ না!

অটলবিহারী চুপ করে রইলেন।

নবকিশোর বলতে লাগল, আসল কথা মনে হচ্ছে এই, যে-কারণে তুমি এর আগে কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা দিতে, সেই কারণেই এখনও আবার দেবে! এতে বিচলিত হবার কি আছে?—অবশ্য টাকার পরিমাণটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার লাভও ত কম হয়নি'!—এবং এঁরা যদি প্রসন্ন থাকেন, তাহ'লে ভবিষ্যতে লাভের পথও খোলা থাক্‌বে।—জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলে না, বাবা!

এবার অটলবিহারী একটু শান্ত হলেন। তারপর দ্বিতীয় কথাটা পাড়লেন।

—জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ওখানে তুমি আজকাল একটু বেশী যাতায়াত সুরু করেছ, সেটা তাঁর চোখ এড়ায়নি', নবু!

—আমি ত লুকিয়ে যাইনে!

—সে কথা বলছি না। উনি প্রকারান্তরে আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেই বসলেন, তোমার অভিপ্রায় কি। অর্থাৎ সুমিত্রাকে তুমি বিয়ে করতে চাও কি?

—এসব আলোচনা এক্ষুনি না করলে হয় না?

—শোন, নবু, আমি তোমার কাছ থেকে চূড়ান্ত কোন জবাব এক্ষুনি চাইছি না। তবে তোমাকে ব'লে রাখা উচিত যে, সুমিত্রাকে বিয়ে করবার এতটকু ইচ্ছে যদি তোমার না থেকে থাকে, তাহ'লে এখন থেকে কেটে পড়াই ভাল।—জ্যোতির্ম্ময়বাবু প্রতাপশালী লোক, একবার ওঁর বিরাগভাজন হ'লে চোখে-মুখে পথ দেখতে পাবে না।

—আমি সেটা জানি, বাবা। তুমি ভেবো না, আমি এমন কোন কাজ করব না, যাতে জ্যোতির্ম্ময়বাবু অসন্তুষ্ট হন।

নবকিশোরের এই আশ্বাসেই তখনকার মত অটলবিহারীকে চুপ করে থাকতে হ'ল।

সুমিত্রা নবকিশোরের কাছে শুনেছিল, প্রদীপ জাহাজ থেকে বন্দনার কাছে চিঠি লিখেছে।—বন্দনা সেটা সযত্নে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই নবকিশোরকে দেখতে দেয়নি'। শুধু বলেছে যে, প্রদীপ বিলেত রওনা হয়ে গেছে।

প্রদীপ কি লিখেছে তা জানতে সুমিত্রার খুবই কৌতূহল হচ্ছিল। প্রদীপ যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়, তখন বন্দনার প্রতি তার ঈর্ষ্যা হয়েছিল, কিন্তু এখন বন্দনাকেও বঞ্চনা ক'রে চলে যাওয়ায় তার আর কোন ঈর্ষ্যা ছিল না, বরং সে খানিকটা সহানুভূতিই অনুভব করছিল। তবে তার কাছে দুর্ব্বোধ্য লাগছিল এই যে, প্রদীপ শুধু বন্দনার কাছেই চিঠি লিখেছে।—বন্দনা যে তাদের কাছ থেকে কোন একটা বিষয় লুকিয়ে রেখেছে সে সম্বন্ধে তার কোনই সন্দেহ ছিল না।

নবকিশোর অবশ্য অনুমান করেছিল প্রদীপের সঙ্গে বন্দনার বিচ্ছেদের কারণ—একদা সে-ই বন্দনার কাছে প্রকাশ করেছিল ছবির কাহিনী। কিন্তু সুমিত্রাকে এসম্বন্ধে কিছু বলতে তার সাহস হয়নি', সুমিত্রার তীক্ষ্ণ জেরায় ছবির সঙ্গে তার সম্পর্কের দিকটাও হয়ত বেরিয়ে পড়বে, এই ভয় তার ছিল।

সুমিত্রা একদিন হঠাৎ এসে হাজির হ'ল বন্দনার কাছে।

খানিকক্ষণ অবান্তর কথাবার্ত্তার পর সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, বন্দনা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু গোপন না ক'রে জবাব দিস। প্রদীপের এই হঠাৎ বিলেত যাওয়ার কারণটা কি রে?

—আমি কি করে জানব? বন্দনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল সুমিত্রার প্রশ্ন।

—তুই ছাড়া কে জানবে? তোর সঙ্গেই ত ভাব ছিল তার।

—তোর সঙ্গেও ত ছিল। বন্দনা জবাব দিল।

—আমার সঙ্গে যে ভাব ছিল, সে হচ্ছে প্রাচীন কালের কথা। মেদিনীপুর থেকে ফিরে আসার পর ওকে কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলেছিলাম ব'লে তার কি রাগ! তারপর থেকে আমার কাছে আর আসে নি বললেই চলে। কিন্তু তোর সঙ্গে ত শেষ পর্য্যন্ত দেখা শুনো হয়েছে। আমি ত ভেবেছিলাম, তোকে বিয়েই করবে।

বন্দনা ক্লান্ত ও পীড়িত বোধ করল। বলল, এসব কথা তুলছিস কেন?

—সাধারণ কৌতূহল, বন্দনা। এই হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়ার পেছনে কি রহস্য আছে তা উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা।

—রহস্য কিছু আছে ব'লে ত জানি না। কিছুদিন থেকেই সে মনমরা হয়েছিল দেশের পরিস্থিতি দেখে। তারপর কি হয়েছিল জানি না, জাহাজ থেকে তার চিঠি পেলাম যে সে বিলেত চলেছে।

—কি লিখেছে সেই চিঠিতে? আমি অবশ্য চিঠিটা দেখতে চাচ্ছি না, মোটামুটি কি লিখেছে জানতে চাচ্ছি।

—যা বললাম তা'ই লিখেছে, সে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন, স্থান এবং হাওয়া পরিবর্তন দরকার, তাই সে চলল বিলেতে।

সুমিত্রা বুঝল, বন্দনা বেশ খানিকটা গোপন করে গেল।

বলল, এ যে লাটসাহেবিরও বাড়া, বন্দনা। স্থান এবং হাওয়া পরিবর্তনের জন্ত একেবারে বিলেত যাত্রা!
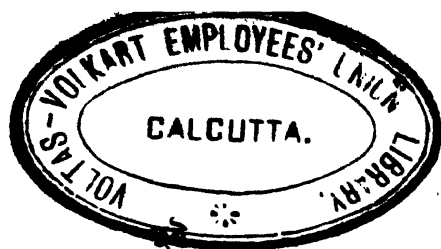
আরও তিন মাস কেটে গেছে। বৃটিশ ক্যাবিনেটের মহারথী তিন জন বৃটেনে ফিরে গেছেন। তাঁদের মিশন যদিও সফল হয়নি, তবু কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ-এর সঙ্গে একটা মিটমাট করবার আশা তাঁরা ছাড়েননি। তাঁদেরই নির্দ্দেশে লর্ড ওয়াভেল চেষ্টা করছেন, সব পার্টিকে নিয়ে একটা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে। কিন্তু কংগ্রেস আসতে রাজী হচ্ছে না।

এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়েছে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়। অনেকেই সন্দেহ করছে, এর পেছনে আছে ক্ষমতা পরিত্যাগে অনিচ্ছুক বৃটিশ কর্ম্মচারীদের নির্দ্দেশ। অবশেষে কংগ্রেস দেখল, যে ব্যাপক অরাজকতা চলেছে, তাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। ছেচল্লিশের আগষ্টে, অর্থাৎ বিয়াল্লিশের আগষ্টের ঠিক চার বছর পরে, পণ্ডিত নেহরু হলেন অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী।

সুদূর লণ্ডনে বসে প্রদীপ শুনল এই খবর। মালবাহী জাহাজ নানা বন্দরে আসতে আসতে সে বিলেতে এসে পৌঁছেছিল মে মাসে। কয়েক দিন ঘোরাঘুরির পর সে কাজ পেয়েছিল একটা Repairs and Demolition Unit এ। বোমা বা আগুন লেগে যে-সব জায়গা এবং দালান বিধ্বস্ত বা আধাবিধ্বস্ত হয়ে গেছে, সে সব আবর্জ্জনার স্তূপ পরিষ্কার করা, আংশিকভাবে ভাঙা দালানকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া, এই জাতীয় কাজ প্রদীপ সানন্দে সুরু করে দিল। আর সে অবাক হয়ে দেখল, কি সহিষ্ণু, কি শৃঙ্খলাবদ্ধ এই জাতটা। সহরতলীর পর সহরতলী ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, প্রায় প্রত্যেকে হারিয়েছে তার কোন না কোন আত্মীয় বা বন্ধু, কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তারা নীরবে করে যাচ্ছে পুনর্গঠনের কাজ। ক্লান্তির ছাপ তাদের মুখে, কিন্তু বাইরে কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ নেই।

প্রদীপের কাজ ছিল সাধারণ মজুরদের সামান্য একটু উর্দ্ধে, যাকে বলা

চলে semi-skilled, বাংলা দেশের খর রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে সমানভাবে কাজ করার অভ্যাস ছিল বলেই বোধ হয় বৃটেনের প্রতিকূল আবহাওয়ায় ও নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছিল। অন্যান্য মজুরদের সঙ্গে সেও থাকত ব্যারাকে, তাদের হাসি ঠাট্টা, আমোদ আহ্লাদে অংশ গ্রহণ করত। যে একাকিত্ব বোধটা তাকে দেশে সঙ্কুচিত এবং সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তা' ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল।

পণ্ডিত নেহরুর প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণের খবর তার ব্যারাকে বেশ একটা সোরগোলের সৃষ্টি করল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে তার সহকর্মীরা তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল। নেহরু গান্ধীজির ছেলে না কি? গান্ধীজি কেন প্রধান মন্ত্রী হলেন না? এবার আশা করি, নেহরু বৃটেনের রাজার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে রাজী হবেন?

কলম্বো থেকে প্রদীপ বন্দনাকে যে চিঠি দিয়েছিল, তারপর আর কোন চিঠি লেখেনি। কাজেই বন্দনার দিক থেকে চিঠি পাবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। নিয়মিতভাবে অর্থাৎ মাসে একখানা ক'রে চিঠি লিখে যাচ্ছিল একমাত্র গায়ত্রীর কাছে। গায়ত্রীই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দেশের সঙ্গে তার শিথিল-হওয়া বন্ধনের একমাত্র প্রতীক। গায়ত্রীর কাছ থেকে আর আর্থিক সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয়নি। সে যা রোজগার করছিল, তা' তার একার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। প্রতি সপ্তাহে সে কিছু কিছু সঞ্চয়ও করতে সুরু করেছিল।

তার ব্যারাকের বন্ধুরা তাকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল তাদের আমোদ আহ্লাদের জায়গায়, পাব্-এ অথবা নৃত্যশালায়। সে দু'-একবার গিয়েছিল, কিন্তু দেখল, সেখানে সে নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে দিতে পাচ্ছে না ওদেশের নর-নারীর মত। তাই সে অবসর মুহূর্ত কাটাতে সুরু করল অন্য উপায়ে। লণ্ডনের পথঘাট, নদীতট এবং উপকণ্ঠ পুনরাবিষ্কারের মধ্যে সে অনুভব করল নতুন এক আনন্দ, তৃপ্তি।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন তার পরিচয় হ'ল এমিলির সঙ্গে। সে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেন্টএ—টেম্‌সএর পাশে বাঁধানো ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পর্য্যবেক্ষণ করছিল একদিকে জার্মাণ বোমারুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ইট এবং পাথরের স্তূপ, আর অপরদিকে দেখছিল, নির্ব্বাক অবজ্ঞায় বয়ে চলেছে নদীর আদিহীন স্রোত।

এমিলিই এসে প্রথমে কথা বলেছিল, তোমাদের দেশের ওপর দিয়ে নিশ্চয়ই এরকম ঝড় বয়ে যায়নি?

প্রশ্নটা খুবই সাধারণ, কিন্তু প্রদীপ কখনও এদিকটা ভাবেনি। সে স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল যে, ছোটখাট ঝাপ্‌টার সম্মুখীন যদিও তার দেশবাসীকে হতে হয়েছে, লণ্ডনের প্রলয়ের তুলনায় তা' কিছুই নয়।

—অথচ যুদ্ধের মধ্যে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ [illegible]ছিলে, আমাদের এই জীবন-মরণ সঙ্কটকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছিলে।

লণ্ডনে যদি প্রদীপ না আসত, যুদ্ধের ছয় বছর বৃটেন কি আগুনের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে স্বচক্ষে যদি তার চিহ্ন না দেখত, তাহ'লে এমিলির এই প্রশ্নের জবাব সে দিত গতানুগতিক ছন্দে। কিন্তু সহজ এবং সুষ্ঠু কোন উত্তর আজ তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

শুধু বলল, আমরা তোমাদের বিপন্ন করতে চাইনি। তবে বিপন্ন যে তোমরা বোধ করেছিলে তা' অস্বীকার করছি না।

এমিলি বলল, তুমি জানো, বৃটেনের কত তরুণ প্রাণ দিয়েছে এই যুদ্ধে, তোমাদেরই দেশের সীমান্তে? তারা যদি সেখানে এগি[illegible]না যেত, তাহ'লে তোমাদের অবস্থা হ'[illegible] ইউরোপে বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেন্‌মার্ক, ফ্রান্স, নরওয়ের মত, এশিয়ায় ব[illegible] ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন-এর মত। অথচ তোমরা বাধা দিচ্ছিলে তা[illegible]ই, যারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিল জাপানীদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে। তোমাদের সাইকলজি সত্যি আমরা বুঝতে পারি না!

প্রদীপ বলল যে এম্‌ব্যাঙ্কমেন্ট-এ দাঁড়িয়ে দু'এক কথায় এসব প্রশ্নের জবাব

দেওয়া সম্ভব নয়। আগন্তুকার যদি আপত্তি না থাকে, তারা নিকটবর্ত্তী একটা কফির দোকানে বসে একটু শান্তভাবে আলোচনা করতে পারে।

প্রদীপ জানতে পারল যে, এমিলির দুই ভাই প্রাণ দিয়েছে বিগত মহাযুদ্ধে, তার মধ্যে একজন বর্ম্মা-সীমান্তে। তার বাবা এবং এক বোন মারা গেছে লণ্ডনে জার্ম্মান বোমার আঘাতে। পরিবারের মধ্যে বেঁচে আছে একমাত্র সে, তার মা এবং আট-নয় বছরের একটি ভাই। যুদ্ধের সময় সে কাজ করেছে এক এক্‌স্‌প্লোসিভ ফ্যাক্টরীতে, এখনও সেখানে কাজ করছে, আর সন্ধ্যার সময় যাচ্ছে পলিটেক্‌নিক্‌-এ, ফলিত রসায়নে ট্রেনিং নিচ্ছে।

কফির পেয়ালা সাম্‌নে রেখে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনার পর এমিলি বোধ হয় খানিকটা বুঝতে পারল, কেন সারা ভারতবর্ষ গান্ধীজির নেতৃত্বে মেতে উঠেছিল 'কুইট ইণ্ডিয়া' এই দাবী জানিয়ে। বলল, একটা বিষয় যে কতভাবে বিচার করা যায়, তা' তোমার সঙ্গে কথা বলে আজ উপলব্ধি করলাম।—আচ্ছা, তুমি হঠাৎ এদেশে চলে এলে কেন? অত্যন্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি, যদি তোমার আপত্তি থাকে, জবাব দিয়ো না।

—বলতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই, মিস বার্ক, কিন্তু কারণগুলো এত ঠুন্‌কো যে তোমার বিশ্বাস হবে না। বিশ্বাস হ'লেও তুমি হাসবে।

—আমার প্রশ্ন প্রত্যাহার করে নিচ্ছি, মিঃ গুহ। এবার যে প্রশ্ন করব সেটা খুবই সহজ এবং সরল। তুমি যেখানে কাজ করছ, সেখানে কি সুখী বোধ করছ?

একটু চিন্তা করে প্রদীপ জবাব দিল, সুখী বোধ করছি বললে হয় অতিশয়োক্তি হবে, তবে অসুখী বোধ করছি না। আমি বড়ে সন্তুষ্ট, মিস বার্ক!

—সে ত দেখতেই পাচ্ছি। নইলে এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট-এর উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হ'ত না!

—তাহ'লে তুমিও ত ঐ পর্য্যায়ে এসে পড়ছ, মিস বার্ক! তুমি এমব্যাঙ্ক-মেণ্ট-এ কেন এসেছিলে?

—তোমার সঙ্গে পরিচিত হ'তে।—পরিহাসের সুরে এমিলি জবাব দিল।

অল্প পরিচয়ে এই প্রকার প্রগল্‌ভতা প্রদীপের কাছে খুবই অভিনব। সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত, অজানতে যদি কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলে থাকি। আমি ঠাট্টা করছিলাম মাত্র।—এমিলি বলল।

মিস এমিলি বার্ক-এর এই ক্ষমা ভিক্ষায় প্রদীপ যেন আরও বিব্রত বোধ করল। সে কোন প্রকারে জানাল যে, সে অসন্তুষ্ট হয়নি' মোটেই, বরং খুসীই হয়েছে যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে আলাপ হ'ল।

—তাহ'লে আমরা পরস্পরকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করতে পারি? এমিলি প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়।—গাঢ় স্বরে প্রদীপ জবাব দিল।

সপ্তাহান্তের মধ্যেই প্রদীপ এবং এমিলি একে অন্যের নাম ধরে ডাকতে সুরু করল। প্রদীপের নামটা একটু দুরুচ্চার্য্য বলে এমিলি তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করল "দীপ"।

এমিলি বলল যে প্রদীপের উচিত সন্ধ্যাবেলায় পলিটেক্‌নিক্‌এ কোন একটা বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া, যেমন সে নিচ্ছে। নইলে কুলিমজুর শ্রেণীর ঊর্দ্ধে উঠতে তাকে বেশ বেগ পেতে হবে। সন্ধ্যাগুলো প্রদীপেরও দুর্ব্বহ হয়ে উঠছিল, সে সানন্দে এমিলির এই উপদেশ গ্রহণ করল। তার ফলে তাদের দেখাসাক্ষাতের সুযোগও একটু বাড়ল।

এমিলি প্রদীপকে তার বাড়ীতে নিয়ে যেতে রাজী হ'ল না। বেশ খোলাখুলি ভাবেই প্রদীপকে জানাল যে, তার দ্বিতীয় ভাই বর্ম্মা-সীমান্তে মারা যাবার পর অবধি তার মা ভারতীয়দের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস সৈন্যবাহিনীর পেছনে ভারতীয়রা যদি নানাপ্রকার sabotage না করত, তাহ'লে তাঁর পুত্র হয়ত অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত না। প্রদীপ বুঝল, কোন আপত্তি করল না।

প্রদীপ থাকত তার সহকর্মীদের ব্যারাকে, এমিলির পক্ষে সেখানে যাওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল। কাজেই পলিটেক্‌নিক্‌-এর করিডর, ক্যান্‌টিন এবং ক্লাশটাই হ'ল তাদের মিলিত হবার একমাত্র এবং সবচেয়ে প্রশস্ত স্থান।

প্রদীপ আর এমিলির মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠল, তাকে ঠিক বন্ধুত্বের পর্য্যায়ে বোধ হয় ফেলা যায় না। অথচ, ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, অন্ততঃ বন্দনার প্রতি প্রদীপ যা' অনুভব করেছিল (এবং এখনও করছিল) এমিলির প্রতি সেই জাতীয় অনুরাগও তার মনে জাগল না। আর এমিলিও জ্ঞাতসারে চেষ্টা করল না তাকে তার স্বরচিত ব্যূহের মাঝখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে। অথচ একটা অনাবিল আনন্দ, একটা তৃপ্তি তারা দু'জনেই পেতে আরম্ভ করেছিল পরস্পরের সাহচর্য্যে। প্রদীপ এর নাম দিল সাথীত্ব।

একদিন হাসতে হাসতে বলল, জানো, এমিলি, আমাদের দেশের লোক ভাবতেই পারে না দু'টি অবিবাহিত ছেলে এবং মেয়ে কি ক'রে এই ভাবে মিশছে, গল্প করছে, আনন্দ পাচ্ছে—প্রেমিক-প্রেমিকার পরিচ্ছদ না পরেও।

—তাই নাকি? তাই বুঝি তুমি প্রথম দু'তিন দিন আমাকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছিলে, দীপ? আমি তখন বুঝতে পারিনি', ভেবেছিলাম, বোধ হয় আমি বিদেশিনী ব'লে, অথবা আমার বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বাধা আছে ব'লে, তুমি আমার সঙ্গে মিশতে চাও না!

—এই দেখ, ভুল বোঝার সৃষ্টি কিভাবে হয়। ভাগ্যি কথাটা আজ উঠেছিল, নইলে ত তুমি এই ধারণা নিয়েই বসে থাকতে।

—বসে যে থাকিনি' তা'ত দেখতেই পাচ্ছ। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী লিবারেল দীপ!—এমিলি জোর দিল 'তোমাদের' এই কথাটার উপর, বলতে চাইল, ভারতীয়েরা বৃটিশদের মত লিবারেল নয়।

মাসখানেক আগে হ'লে প্রদীপ এই জাতীয় মন্তব্যে হয়ত দপ ক'রে জ্বলে উঠত, কিন্তু ইংলণ্ডে থেকে এবং এমিলির সংস্পর্শে এসে সে সব জিনিষেরই "ওপিঠ"টা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে দেখতে সুরু করেছিল। তাই আজ এমিলির কথার সে একটুও রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করল না, শুধু একটু হাসল।

তিন

লণ্ডনে প্রদীপের প্রায় সাত মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে সে ব্যারাক্ ছেড়ে চলে এসেছে এক বোর্ডিং-হাউসে। দেখতে দেখতে এল খৃষ্টমাস এবং নববর্ষের সূচনা।

বিলেতে তার এই প্রথম খৃষ্টমাস। যদিও যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন প্রকট রয়েছে পথে-ঘাটে, অট্টালিকায়, পার্কে, তবু উৎসবের নানা সজ্জায় এসব আচ্ছাদন করে ফেলতে লোকের কি প্রয়াস। চারদিকে আনন্দের কোলাহল, স্ফূর্তির প্রবাহ। প্রদীপের মত ntrospective মনও খানিকটা অভিভূত না হয়ে পারল না।

কিন্তু সে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত বোধ করছিল অন্য কারণে। গত তিন-চার মাস ধরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার যে দাবানল জ্বলে উঠেছে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, তায় যেন বিরাম নেই, বিস্মৃতি নেই। গান্ধীজি যাবেন নোয়াখালিতে, কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত দেশকে শান্ত করতে পারবেন কি তিনি?

গায়ত্রীর চিঠিও এসেছিল। তার চিঠিতেও সেই একই সুর—চারদিকে যে অরাজকতা সুরু হয়েছে তার সমাপ্তি যদি শীঘ্র না হয়, তাহ'লে দেশের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনুজ্জ্বল। মিঃ কর দিন-দিন আরও রুক্ষ, আরও কঠিন হয়ে উঠছেন, যেন মনে হচ্ছে, এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি তাল রাখতে পারছেন না। সবশেষে গায়ত্রী লিখেছে যে, প্রদীপের অভাব সে অনুভব করছে পদে পদে, প্রদীপ দেশে থাকলে অনেক বিষয়ে তার সঙ্গে পরামর্শ করত, তার উপদেশ গ্রহণ করত।

প্রদীপ গায়ত্রীর চিঠির জবাব লিখল নববর্ষের আগের দিন সন্ধ্যায়। অন্যান্য কথার পর লিখল যে, তার চারদিকে বাজছে উচ্ছল আনন্দের সঙ্গীত, বিলেতের নরনারী বন্ধনমুক্ত হয়ে ছুটে চলেছে প্রমত্ত দেবতার আহ্বানে। যদিও এই কয়

মাস এদেশে থাকার ফলে তার ভূতপূর্ব্ব পিউরিট্যানিজম্ অনেকখানি কেটে গেছে, তবু সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাসিয়ে দিতে পারছে না জীবনের বাধা-হীন স্রোতে। এ কি সঙ্কোচ, না ভীরুতা?

চিঠিটা খামে বন্ধ করে প্রদীপ উঠে দাঁড়াল। জানালার সামনে এসে দেখল, চারদিকে আলোর মেলা, রাস্তার দু'ধার দিয়ে কাতারে কাতারে যাচ্ছে নরনারী—যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার দল। হাতে হাত বেঁধে তারা যাচ্ছে, গান গাইছে, অকারণে হাসছে। পথের পাথরগুলোও যেন সজীব, মুখর হয়ে উঠেছে।

দরজায় টোকা মারল এমিলি। প্রদীপ তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

—দীপ, আজকের রাতে তুমি ঘরের এই বন্ধ হাওয়ায় বসে রয়েছ? চলে এসো, বাইরে এসো।

এমিলির মুখ-চোখ উজ্জ্বল, উৎসবের সজ্জায় সজ্জিত সে। তার আধা-সোনালি চুলের উপর রিবন্ বাঁধা, দেখাচ্ছে যেন ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরীর মত। প্রসাধন এবং মনের উৎফুল্লতা তার বয়সকে নামিয়ে নিয়ে এসেছে অন্ততঃ পাঁচ বছর।

—চিঠি লিখছিলাম। খানিকটা যেন লজ্জিতভাবে প্রদীপ বলল।

—চিঠি লিখবার সময় পরে যথেষ্ট পাবে, কিন্তু নতুন বছর আবাহনের সুযোগ পাবে না অনেক দিন পর্য্যন্ত। আজ তুমি লণ্ডনের চেহারা দেখলে চিন্‌তেই পারবে না। চলে এসো, বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। তোমার ওভার-কোটটা সঙ্গে নিয়ে এসো।

—কোথায় যাব আমরা? প্রদীপ তবু প্রশ্ন করল।

—কোথায়? সারা লণ্ডন আমাদের সাম্রাজ্য, যাবার জায়গার ভাবনা? আর দেরী ক'রো না, বেরিয়ে এসো।

ব'লে প্রদীপকে একরকম টান্‌তে টান্‌তেই এমিলি নিয়ে এল ঘরের বাইরে—রাস্তায়।

এমিলির এ এক নতুন রূপ। সেই শান্ত বুদ্ধিমতী এমিলিকে পেছনে রেখে এগিয়ে এসেছে উচ্ছল, উপচে-পড়া, প্রাণবন্ত এক এমিলি!

প্রদীপ বলল, হাওয়ার ছোঁয়াচ তোমার গায়েও লেগেছে, এমিলি!

—আজও যদি হাওয়ার ছোঁয়াচ তোমার-আমার গায়ে না লাগে তাহ'লে বুঝব আমরা নিতান্ত জড়, প্রাণহীন। ছোঁয়াচটা যাতে ভাল করে লাগে, সেই-জন্যেই ত তোমাকে ঘরের বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে নিয়ে এলাম! দেখত, আজ আকাশ কেমন পরিষ্কার, তারা জ্বলছে, অনেকটা তোমার দেশের মত, নয় কি?

ব'লে এমিলি প্রদীপের হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আরও জোরে চেপে ধরল। বলল, আজকের রাতে ভীড় কিন্তু প্রচণ্ড হবে, একবার যদি হারিয়ে যাও, তাহলে খুঁজে পাওয়া হবে মহা এক সমস্যা। কাজেই যতটা সম্ভব আমার কাছে কাছে থেকো।

তারপর একটু চটুল হাসি হেসে বলল, আর তোমার হাতে আমার গায়ের স্পর্শ যদি একটু-আধটু লেগে যায়, আজকের রাতটা অন্ততঃ তা' proper spirit-এ নিয়ো!

হাতে হাত ধরে দু'জনে চলল লণ্ডনের জনস্রোতের মধ্যে নিজেদের এলিয়ে দিয়ে। প্রদীপ প্রথমে সত্য সত্যই সঙ্কুচিত বোধ করছিল, কিন্তু যখন চারপাশ তাকিয়ে দেখল যে এই হচ্ছে রীতি, তখন কোন আপত্তি করল না। লোকের ভীড় এবং কোলাহল ক্রমশঃই বাড়ছিল এবং অন্যান্য দম্পতি বা যুগলের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য প্রদীপ এবং এমিলি বাধ্য হচ্ছিল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতে। পুরু আবরণীর মধ্য দিয়েও সে অনুভব করছিল এমিলির যৌবনের উত্তাপ, এমিলির উচ্ছল প্রগলভতা ধীরে ধীরে সংক্রামিত হচ্ছিল প্রদীপের রক্তে।

এমিলি প্রশ্ন করল, তোমাদের দেশে এরকম কোন্ উৎসব নেই, যখন বছরে অন্ততঃ একটি দিন ছেলেমেয়েরা বেপরোয়া হয়ে আনন্দ করে, কোনরকম বন্ধনের নির্দেশ মানে না?

—ঠিক এমন ধারা কোন উৎসব নেই, অন্ততঃ সভ্য শালীন সমাজে নয়। তবে তথাকথিত সভ্যতার বাইরে কতকগুলো জাত আছে যাদের ছেলেমেয়েরা বছরে এক বা দু'বার উৎসবের মত্ততায় নিজেদের আত্মসমর্পণ করে নিঃশেষে।

—মনে কর আমরা আজ তথাকথিত সভ্যতার বাইরে সেই একটা জাতের দুটি তরুণ-তরুণী। তোমার আপত্তি আছে ?

কি বলতে চায় এমিলি ? দারুণ শীতের মধ্যেও প্রদীপ ঘেমে উঠল।

—কথাটা ভাল লাগল না বুঝি ? বেশ, আমরা তাহ'লে সভ্য লণ্ডনের বাসিন্দাই না হয় থেকে যাই, কেমন ?

প্রদীপ তবু কোন জবাব দিল না, নীরবে হাঁটতে লাগল।

—আচ্ছা, দীপ, আজ তোমাকে বলতেই হবে তোমার হঠাৎ এদেশে চলে আসার কারণ ? বন্ধুত্বের দাবীতে এই প্রশ্ন করছি।

প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার প্রয়াসে প্রদীপ বলল, ওই দেখ, ওরা রাস্তার মাঝখানেই নাচতে সুরু করে দিয়েছে ! এটা বড্ড বাড়াবাড়ি নয় কি ?

—মোটেই নয়, দীপ। আজকের রাতে আইনকানুন যদি একটু না ভাঙ্গে তাহ'লে কবে আর ভাঙ্গবে ? এই রাত ত বছরে একবারের বেশী আসবে না ! কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর ত তুমি দিলে না ?

—খাঁটি কথা শুনতে চাও, এমিলি ? গম্ভীরভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—নিশ্চয়।

—আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। আমার ধারণা ছিল সেও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু দেখলাম, আমার ধারণা ভুল, সবই আমার কল্পনার মোহজাল। তাই—

—তাই তুমি পালিয়ে এলে ? আমাকে অবাক করলে, দীপ !

—কি লাভ হ'ত উঞ্ছবৃত্তি ক'রে, যেখানে আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম যে সে আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসতে পারে না।

—সে কি আর কাউকে ভালবেসেছিল ?

—যতদূর জানি, না।

—তবে? তবে তুমি পালিয়ে এলে কেন?

—ঐ ত তোমাকে বললাম, এমিলি, আমি অত্যন্ত sensitive, যখন বুঝতে পারি যে আমি অপ্রয়োজনীয়, তখন কাঙালের মত দাঁড়িয়ে থাকাটা পছন্দ করিনে।

—তুমি চিরকাল বড্ড বোকা, দীপ!

—প্রদীপ এমিলির চোখের দিকে স্থিরনেত্রে তাকাল। তারপর বলল, অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে তখনও আমি বোকামি করেছিলাম আমার ভালবাসার পাত্রীর কাছ থেকে পালিয়ে এসে, আর এখনও বোকামি করছি তোমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে?

এমিলি খিল-খিল করে হেসে উঠল। বলল, সাড়া যারা দিতে চায়, তারা কথার জালে নিজেদের এমন করে জড়িয়ে ফেলেনা। এসো না, নাচবে?

—আমি নাচতে জানিনে!

—আজ যে নাচ হচ্ছে তাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে না। বাজনার তালে তালে পা ফেলে চলতে পারবে ত? আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি, এসো।

ব'লে সে প্রদীপকে একরকম টেনে রাস্তায় নিয়ে এল। বলল, ওরা যেভাবে তাদের পার্টনারদের জড়িয়ে আছে, ঠিক সেই ভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরো, বাকীটা আপনি এসে যাবে।

যুগলনৃত্যের এই প্রথম প্রয়াস প্রদীপের। সে অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করল, সত্যসত্যই দূর থেকে যতটা কঠিন মনে হয়েছিল, কার্য্যক্ষেত্রে নেমে মোটেই তেমন দুঃসাধ্য ঠেকছে না।

—শুধু দেখো, আমার পাটা মাড়িয়ে দিয়োনা যেন! পরশু আবার কাজে বেরুতে হবে, তখন যদি খোঁড়াতে থাকি তাহলে লোকে বলবে কোন্ boorish পার্টনারের পাল্লায় পড়েছিলাম।

তারা দু'জনে নাচতে সুরু করল। প্রথমে খুব ধীরে, মন্দাক্রান্তা গতিতে। তারপর সঙ্গীত হতে লাগল আরও জোরালো, আরও দ্রুত, আর সঙ্গে সঙ্গে

নৃত্যরত যুগলদের গতিও উঠতে লাগল পঞ্চম, সপ্তম, নবম খাদে। প্রদীপ দেখল, এর সঙ্গে তাল রাখা তার পক্ষে অসম্ভব—সে হঠাৎ এমিলিকে মুক্ত করে দিল তার বাহুবন্ধন থেকে।

—ওকি, থামলে যে? এমিলি বলল।

—তাল রাখতে পারছিনা, অভ্যেস ত নেই!

একটু পরে সঙ্গীতও বন্ধ হয়ে গেল। হাতঘড়ির দিকে এমিলি তাকাল: বারটা বাজতে মিনিট কুড়ি বাকী।

—তাহলে চল, পিকাডিলি সার্কাসে যাওয়া যাক্। এমিলি বলল।

—সেখানে আবার কি হবে?

—চলোই না, দেখতে পাবে।

নীরবে প্রদীপ এমিলির হাত ধরে চলতে আরম্ভ করল।

—দীপ! এমিলি বলল।

—কি?

—তোমার দেশের প্রেয়সীকে মনে পড়ছে কি একটু?

—না ত! সরলভাবে প্রদীপ জবাব দিল।

—আমি যদি তুমি হ'তাম, তাহলে নিশ্চয় মনে করতাম।

—তুমি ত আর আমি নও, কাজেই ও প্রশ্ন উঠছেনা।

আবার দু'জনে নীরবে হাঁটতে লাগল।

পিকাডিলি সার্কাসে উভয়ে যখন পৌঁছল, তখন সমস্ত সার্কাসটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে, নড়বার চড়বার মত তিলার্দ্ধ জায়গা নেই। Eros-এর মূর্তি এবং ফোয়ারার চারদিকে উৎকণ্ঠ জনতা দাঁড়িয়ে আছে, ঘড়িতে কখন বারটা বাজবে তার প্রতীক্ষায়।

অবশেষে ঢং ঢং করে ঘড়িতে বারটা বাজল। জনতার সে কি উত্তেজনা, উল্লাস! যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাই সুরু করল পরস্পরকে সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, চুম্বন। সকলের মুখে এক কথা: নতুন বছর সুখময় হোক্, শান্তি আসুক।

প্রদীপ এমিলির দিকে তাকাল। দেখল, এমিলি নিষ্পলকনেত্রে তাকে লক্ষ্য করছে।—বাঁহাত দিয়ে এমিলিকে নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে প্রদীপ তার ঠোঁটের উপর বসিয়ে দিল ছোট্ট একটি চুম্বন। এমিলির ঠোঁটটা যেন একটু নড়ে উঠল, সে যেন কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কোলাহলের মধ্যে কিছুই শোনা গেলনা। প্রদীপ শুধু অনুভব করল, অদৃশ্য এক আলোর স্পর্শে এমিলির সমস্ত অবয়ব কেঁপে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন বেরিয়ে এল বহুকালের সুপ্তির অন্ধকার থেকে।

অনীকের ডায়েরী হইতে :

১৯৪৭ সাল, ১লা জানুয়ারী।

ডায়েরী লিখবার অভ্যাস আমার কোন দিনই ছিল না, আজও হয়ত লিখতাম না, কিন্তু এই নতুন অভ্যাসটা এসেছে দুই কারণে। প্রথম, আমায় এক গুণমুগ্ধ সতীর্থ আমাকে এই ডায়েরীটা উপহার দিয়েছে এবং উপহার-লিপিতে লিখেছে যে, ১৯৪৭ সাল হবে আমার পক্ষে অসাধারণ একটা বৎসর, এই বৎসরের ঘটনাগুলো পরে যাতে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে না যায়, সেজন্যে আমি অবসরমত সেগুলো এখন এই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করি। দ্বিতীয়তঃ, কাল, নতুন বছর উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে এবং তার পরে, যা ঘটল, তা আমার কল্পনারও অতীত। আমার মনের রুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করতেই হবে এই ডায়েরীর পাতায়।

আমার জীবনের প্রথম চুম্বন পেল এমিলি, যা পাওয়া উচিত ছিল বন্দনার, হয়ত বা ছবির। ছবির কথা হঠাৎ মনে আসছে কেন? সত্যি কি আমি তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম? এখন in retrospect বিশেষ ক'রে কাল এমিলির সঙ্গে থাকবার পর মনে হচ্ছে, বোধ হয় হয়েছিলাম, নিজেরই অজ্ঞাতে। নইলে এমিলিকে নিয়ে যখন আমার এই ঘরে এলাম, (তখন রাত বোধ হয় দুটো হবে) তখন বার বার ছবির কথাই মনে হচ্ছিল কেন? বন্দনার কথা ত তখন একবারও মনে হয়নি? তারপর এমিলির উষ্ণ আলিঙ্গনে যখন নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম, তখনও চোখের সামনে ফুটে উঠল ছবির আগ্রহোজ্জ্বল মুখ। শুধু মুখ নয়, নবকিশোরের সঙ্গে মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এ যে ছবিকে আমি দেখেছিলাম, সে যেন ভেসে এল আমার পাশে, তার নিঃসহ যৌবনের অকুণ্ঠ নগ্নতা নিয়ে।

সত্যি, আমরা নিজেদের কতটুকু জানি বা বুঝতে পারি? দু'দিন

আগেও যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করে আমাকে বলত যে, ১৯৪৭ সালের প্রথম রাত্রিতে লণ্ডনের এই অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে আমি হয়ে থাকব একটি বিদেশী তরুণীর বাহুলগ্ন, আমি বিশ্বাস ত করতামই না, বরং অকৃত্রিম ক্রোধ এবং ঘৃণার সঙ্গে তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম। আর আমার অবচেতন মনে ছবিকে পাবার লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা যে এভাবে লুকিয়েছিল, তা-ও স্বীকার করতাম না।

অথচ, বিস্ময়ের কথা এই যে, এমিলির সঙ্গে রাত্রিযাপন করে আমার এতটুকু অনুশোচনা আসছে না। বরং মনে হচ্ছে, এই হওয়া উচিত ছিল। এই পরিণতি না হ'লেই আমাদের সম্বন্ধটা হয়ে দাঁড়াত অস্বাভাবিক, জীবনধর্ম্ম-বহির্ভূত। তাই বাড়ীতে ফিরে যাবার আগে এমিলি যখন আমাকে প্রশ্ন করল, আশা করি তুমি কোন অনুতাপ বোধ করছ না। তখন আমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাকে বললাম, না, মোটেই না। এবং তার নিদর্শনরূপে তার ঠোঁটের উপর বসিয়ে দিলাম আর একটি প্রগাঢ় চুম্বন।

আচ্ছা, এমিলির কথা লিখতে বা ভাবতে গিয়ে বার বার ছবির প্রতিকৃতিই মনে আসছে কেন? এমিলির জীবনে যদিও আমি প্রথম পুরুষ নই, তবু সে ত ছবি নয়। ছবির মত দেহ বিক্রয় করা তার ব্যবসা নয়।

তবে এটা কি আমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় মনের প্রতিক্রিয়া? বিয়ের কথা না ভেবে, শুধু আকর্ষণের পরিণতি হিসেবে একটি মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে দেহের সমতলভূমিতে মিলিত হয় এদেশে—নিঃসঙ্কোচে। এখানে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের দেশের নীতিবাগীশরা হয়ত মূর্চ্ছা যাবেন একথা শুনে!

ছবির কথাই আবার বলছি। স্বীকার করছি যে, তার জীবন আরম্ভ হয়েছিল সাধারণ পেশাদার মেয়ের মত, কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই সে নয়। ক্ষুধার তাড়নায়ই কি সে বাধ্য হয়নি পুরুষদের লালসা চরিতার্থ করতে? তারপর তার জীবনে এসে উপস্থিত হ'লাম আমি, কিন্তু তার ভার গ্রহণ করলাম না। স্নেহ, সহানুভূতির জন্য উন্মুখ ছিল তার মন, কিন্তু সত্যি-কারের স্নেহ সে কতটুকু পেয়েছে? নবকিশোর যদি তার প্রতি সহানুভূতি

দেখিয়ে থাকে, তবে সে কেন তার কাছে যাবে না? কি দিয়েছি বা দিতে প্রস্তুত ছিলাম আমি, যার উপর ভরসা করে তার ভবিষ্যৎ জীবন সে নিয়ন্ত্রিত করবে অন্য পথে? অপরাধ কি ছবির? অপরাধ যে আমারই।

এদেশের সমাজে এ-সব প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েরা এখানে স্বাধীন। সব চেয়ে বড় যে স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তা' এদের আছে। কাজেই এদেশে ছবির সমস্যা দেখাই যায় না। যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ছবির পথ বেছে নেয়, তারাও এদেশের সমাজে অপাংক্তেয় নয়।

না, জীবনের যে সব নীতি আমি এত দিন দূর থেকে দেখে এসেছি, নিজেকে বাঁচিয়ে, দূরবীক্ষণের সাহায্যে সে সব নতুন করে পর্য্যালোচনা করবার সময় এসেছে। লোকে হয়ত বলবে, আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। আমি প্রতিবাদ করব না।

১৫ই জানুয়ারী।

এর মধ্যে এমিলির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে, পলিটেক্‌নিক্‌-এ। প্রথম যেদিন দেখা হল—৩রা জানুয়ারী (২রা তারিখ পলিটেক্‌নিক্‌ বন্ধ ছিল)—তার মুখে কেমন যেন একটা অনুশোচনার চিহ্ন। আমি হেসে প্রশ্ন করলাম, ও কি এমিলি! অপরাধীর মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? আমাকে এড়াবারই বা কেন এই প্রয়াস?

সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আজ ক্লাসের পর তোমার ওখানে আসতে পারি?

আমি বললাম, নিশ্চয়।

যদিও বাসে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম, আমাদের মধ্যে একটিও বাক্য-বিনিময় হয়নি।

এমিলি কথা বলল আমার ঘরে ঢোকবার পর। প্রশ্ন করল, এ ক'দিন তুমি ভাল ছিলে ত, দীপ?

হো হো করে হেসে আমি জবাব দিলাম, কেন থাকব না? তোমার সন্দেহের কারণ?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল, না, এমনি ভাবছিলাম।

—ভাবছিলে পয়লা জানুয়ারীর কথা, এই ত? ভাবছিলে, তোমার ভারতীয় বন্ধুকে টেনে নিয়ে এসেছ তার সুউচ্চ মঞ্চ থেকে এবং সেটা হয়েছে প্রকাণ্ড একটা অপরাধ! তাহলে তোমাদের ভাষায়ই বলি, it had to happen some day and with somebody. আমার ভাগ্য ভাল—it was New Year's Eve and it was you!

এমিলি বলল, সত্যি বলছ, you have no regrets?

—সত্যি বলছি, none whatsoever.

তারপর এমিলির মনের সংশয় ঘুচিয়ে দিলাম চুম্বনে, আলিঙ্গনে।

আরেক দিনের কথা। এমিলি আবার আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমার ভারতীয় প্রেয়সীর কথা। যখন সে শুনল যে, আমার কাছে তার একখানা ফটোও নেই, সে ত অবাক! বলল, তুমি বলছ তুমি তাকে জান তিন চার বছরেরও বেশী, অথচ কোন সময় তার একখানা ফটো সংগ্রহ করবার ইচ্ছেও হয়নি তোমার?…আশ্চর্য্য তোমাদের ভারতীয়দের মন!

এমিলিকে তখন বুঝিয়ে বলতে হল যে, আমাকে দিয়ে যেন আমার দেশের সব লোককে বিচার না করে। আমি চিরকালই একটু খামখেয়ালী, সবাই যা করে, তা আমি করতে পারিনে বলেই দুঃখ পাই, অপরকে দুঃখ দিয়েও থাকি।

তাছাড়া দেশে আমার জীবন ছিল ছন্নছাড়া। বিলেতে এসে তবু একটা স্থিতি হয়েছে, কিন্তু সেখানে? সেখানে আমার না ছিল চাল, না ছিল চুলো!

এমিলি প্রশ্ন করল, তুমি তার কাছে চিঠি লেখ না কেন, দীপ?

—জাহাজ থেকে একখানা লিখেছিলাম, তারপর আর লেখা হ'য়ে ওঠেনি। …এখন এক বছর অনভ্যাসের পর কলম ধরতে লজ্জা করছে।

—সেদিন, ৩১শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়, তুমি কার কাছে চিঠি লিখছিলে?

—আমার দিদি, পাতান দিদির কাছে।

—পাতান দিদি, সে আবার কি?

আমাকে তখন বুঝিয়ে বলতে হ'ল আমাদের দেশের এই পাতান দিদি, দাদা, বৌদি, খুড়ো, খুড়ি প্রভৃতির কথা। অবাক হয়ে সে শুনল, তারপর বলল, ভারী চমৎকার ব্যবস্থা ত?

একটু পরে সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এখন তোমারআমার মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে, একে তোমার দেশের প্রথানুসারে কি বলবে?

বড় কঠিন প্রশ্ন। অনেক ভেবে জবাব দিলাম, আমাদের দেশে এ রকম সম্পর্ক গড়ে উঠবার সুযোগ বা সুবিধে এখনও হয়নি। সমাজ-ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে।

—অর্থাৎ, তোমাদের সমাজ মোটেই অনুমোদন করবে না, এই ত?

এবার আমার পাল্‌টা প্রশ্ন।—তোমাদের সমাজও অনুমোদন করছে কি এমিলি?

—সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন না করলেও আপত্তি করছে না। অর্থাৎ, দুটি ছেলেমেয়ে যদি পরস্পরকে ভালবাসে, তাহ'লে বিয়ে না ক'রেও তারা একত্রে থাকতে পারে। সমাজ তাতে বাধা দেবে না, যতক্ষণ তৃতীয় কোন পক্ষের ক্ষতি না হয়।

—আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু হতে বেশ দেরী হবে, এমিলি!

—কে তোমাকে চালু করতে বলছে?···এমিলি হেসে বলল।

৩০শে মার্চ্চ।

অনেক দিন ডায়েরী লেখা হয়ে ওঠেনি। যে অভ্যাস কোন দিন ছিল না, জোর ক'রে তার জের টেনে আনা সোজা কথা নয়!

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে এই যে, আমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং

ফার্ম্ম-এ চাকুরী পেয়েছি। পলিটেক্‌নিক্‌-এ এসেছিলেন এই ফার্ম্মের একজন ডিরেক্টার—আমরা, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশ করছি, তাদের কয়েক জনকে ডেকেছিলেন, আমি ছিলাম তাদের অন্যতম। ডিরেক্টার বাছাই করে নিলেন আমাকে এবং এদেশীয় আরও দু'জনকে।

সমাজের চোখে আমার মর্য্যাদা একটু বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাও। আমার ইউনিট-এর বন্ধুদের ছেড়ে চলে আসতে একটু কষ্ট হয়েছে বই কি, প্রায় এক বছর ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করেছি!

এমিলি খুসী হয়েছে। আমার এই ক্ষুদ্র ভাগ্য পরিবর্ত্তনে। বলেছে, দীপ, মনে মনে আমি এখনও বুর্জোয়া, তাই শ্রমিকশ্রেণীর ঊর্দ্ধে কেউ উঠলে তাকে অভিনন্দন জানাই, যদিও জানি যে আজকালকার যুগে এটা রীতিমত সিডিশন।

দেশ থেকে গায়ত্রীদি'র চিঠি এসেছে। দেশের খবর অনেকটা আশাপ্রদ! নতুন বড়লাট (লর্ড মাউণ্টব্যাটেন) কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন এবং বলছেন যে, তিনি চান এই বছরের মধ্যেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। মনে হচ্ছে, এবার দেশ সত্যি স্বাধীন হবে।

কিন্তু এই স্বাধীনতার বিনিময়ে মূল্য দিতে হবে ভারতবর্ষের ঐক্য। আমাদের মুসলমান ভাইরা চান আলাদা রাষ্ট্র—পাকিস্তান। পাঞ্জাব আর বাংলা দেশ নাকি দু' ভাগ করা হবে। এক ভাগ থাকবে হিন্দুস্থানে, অপর ভাগ পাকিস্তানে। পাঞ্জাবের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবে, এ যে কল্পনাই করতে পারি না। নদীমাতৃক বাংলা দেশ, যে বাংলা দেশের ধানের উপর বাতাস ঢেউ খেলে এসেছে যুগযুগান্ত থেকে, তার এক অংশ হবে বিদেশী রাষ্ট্র!

গায়ত্রীদি' লিখেছেন, কংগ্রেস এই দ্বিখণ্ডীকরণ পছন্দ করে না। তবে সমগ্র দেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেই রাজী হয়েছে। তারা দেখতে পাচ্ছে, পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত দেশব্যাপী আত্মকলহের অবসান হবে না, আর সেই নজীর দেখিয়ে বৃটেনও হয়ত ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই কংগ্রেস একরকম নিরুপায় হয়েই সম্মতি দিয়েছে!

আমি পলিটিক্স বুঝিনে, তবে সবাই যখন বলছেন উপায়ান্তর ছিল না, আমি মেনে নিচ্ছি। তা ছাড়া, আমি আজ প্রায় এক বছর দেশের বাইরে, এখানে কেন কি ঘটছে, তা' এখানে বসে বিচার করি এমন ধৃষ্টতা আমার নেই!

পাঁচ

দেখতে দেখতে আরো কয়েক মাস কেটে গেল। এল ৪৭ সালের জুন। এপ্রিলের শেষ হতেই বসন্তের সমাগমটা প্রদীপ উপলব্ধি করছিল, জুন আসতেই তার মনে হ'তে লাগল, লণ্ডনের বাইরে কোথাও বেরিয়ে যেতে হবে।

এমিলিকে তার আকাঙ্ক্ষার কথা জানাল। এমিলিও বলল যে প্রদীপের কয়েকদিন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন।

—কোথায় আমরা যেতে পারি বলো ত?…প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল।

—আমরা? আমি যাব একথা তোমাকে কে বলল?

—সে কি? তুমি যদি সঙ্গে না আস, তাহ'লে কি হলিডে হবে আমার?

—দুটো বাধা আছে, দীপ! প্রথম, সামনের নভেম্বরে আমার ডিপ্লোমা পরীক্ষা, এই গরমের ছুটিতে আমাকে তৈরী হতে হবে পরীক্ষার জন্যে, হলিডে করা চলবে না। দ্বিতীয়, আমি যদি লণ্ডনের বাইরে যাই, মা জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, ইত্যাদি। ওঁকে মিথ্যে কথা বলতে পারব না, অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখন।

প্রদীপ আহত বোধ করল। বলল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা কর, এই খবরটা তোমার মা জানেন।

—জানেন হয়ত, কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্ন কখনও করেন নি। লণ্ডনের বাইরে যদি যাই, তাহ'লে প্রশ্ন নিশ্চয়ই করবেন। আমি জানি, আমার এই ভীরুতার মধ্যে কোন লজিক নেই, তবু আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

প্রদীপ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, তাহ'লে আমি যাব না।

—এটা তোমার অন্যায় আবদার, দীপ! আমার সুবিধে অসুবিধেও ত থাকতে পারে। মার কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমার পরীক্ষাটা ত উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়।

তারপর একটু মোলায়েম সুরে বলল, তাছাড়া, তুমিই ত আমাকে বলেছ তুমি চিরদিন পছন্দ করেছ একটু স্বতন্ত্র, একটু একা থাকতে। লোকের সংসর্গ, সাহচর্য্য বেশী দিন তোমার ভাল লাগে না। আজ তোমার স্বভাব হঠাৎ বদলে গেল কেন?

অভিমানাহত স্বরে প্রদীপ বলল, যে দিনের কথা বলছ, তা' অনেক পেছনে ফেলে রেখে এসেছি, এমিলি! তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়নি!...তোমার সাহচর্য্য যে আমি কি তীব্রভাবে কামনা করি, তা কি তুমি এতদিনেও বুঝতে পারোনি?

—এ তীব্রতা যে এখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার প্রধান কারণ, বেশী দিন আমাদের পরিচয় হয়নি! এই কয়েক মাসের মধ্যেও আমরা পরস্পরকে নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছি কতটুকু? হিসেব করে দেখো ত, পলিটেক্‌নিক-এ ছুটো ছুটকোছাটকা কথা বলা ছাড়া একটু নিরিবিলি তোমার সঙ্গে থাকতে পেরেছি সর্ব্বসমেত আট কি দশ ঘণ্টা! স্বল্পপরিচয়ের নভেলটি এখনও মরে যায়নি, তাই তোমার কামনা এখনও তীব্র রয়েছে।

—তোমারই কথা অনুসরণ করে বলছি, মাসখানেকের হলিডে একসঙ্গে কাটাতে পারলে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারব আরও ভাল করে। সেটা কি ছু'দিক থেকেই কাম্য নয়?

—না। আমি নিজেকে তোমার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সম্মুখে তুলে ধরতে মোটেই রাজী নই। আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক আছে, সেগুলো তোমাকে জানতে দেওয়ার কি সার্থকতা? আধা-অন্ধকারে যা' লুকানো রয়েছে, থাকুক না তা' সেখানে।...আর তাছাড়া, তোমাকে আমি জানি, দীপ, একমাস আমার নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য্যে তুমি হাঁপিয়ে উঠবে, তখন আমাকে দূরে ঠেলে দেবার জন্য তুমিই হয়ে উঠবে আগ্রহান্বিত।

প্রদীপ এবার যথার্থই রাগ করল। বলল, বেশ, তুমি আসতে না চাও, না এলে! কোন প্রয়োজনই নেই আমার কারো সাথিত্বের!

—লক্ষ্মী, দীপ, তোমার এই স্পিরিটই ত দেখতে চেয়েছিলাম!

প্রদীপ বলল বটে যে, সে একাই যাবে হলিডে করতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে গেল না। জুন, জুলাই দু'মাস কেটে গেল, প্রদীপের ভ্রূক্ষেপই নেই। এমিলি অনেকবার চেষ্টা করল তাকে রাজী করাতে, কিন্তু একটা-না-একটা ওজর দেখিয়ে প্রদীপ লণ্ডনেই থেকে গেল।

অবশেষে এমিলি বলল, দেখছি তোমার সঙ্গে না এলে তুমি বাইরে আদৌ যাবে না! আমি আসব, কিন্তু একটা অনুরোধ, তিন চার দিনের বেশী আমাকে থাকতে বলো না। একটা জায়গায় তোমাকে স্থিতি করিয়ে দিয়েই আমাকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হবে আসন্ন পরীক্ষার তাগিদে।

উপায়ান্তর না দেখে প্রদীপ অবশেষে এই মীমাংসায় রাজী হ'ল।

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে তারা দু'জনে এল ব্রাইটনে—সমুদ্রতীরে। ব্রাইটন-এর সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য, হোটেল, বোর্ডিংহাউস ভর্ত্তি। অনেক কষ্টে সহর থেকে একটু দূরে একটা বোর্ডিংহাউসএ এমিলি দু'খানা ঘর জোগাড় করল।

এমিলি ব্রাইটন-এ রইল ঠিক তিন দিন। প্রদীপ অনেক অনুরোধ জানাল অন্ততঃ একটা সপ্তাহ থেকে যেতে, কিন্তু এমিলি কিছুতেই রাজী হ'ল না। প্রদীপকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে ছুটে পালাল লণ্ডনে।

প্রদীপ ক্ষুণ্ণ হ'ল। সে একা-একা ঘুরে বেড়াতে লাগল সমুদ্র-সৈকতে, খান-দুই-তিন বই নিয়ে। জনসমাগম যেখানে অপেক্ষাকৃত কম, এরকম দু'-একটা জায়গা সে আবিষ্কার করে নিল এবং অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগল নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে।

বই-এর পাতা ওলটাবার ফাঁকে ফাঁকে সে তার চিন্তাধারার স্রোত সম্পূর্ণ আলগা করে দিল। এমিলির ব্যবহার তার কাছে খুবই অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ঠেকছিল! যে তিন দিন এমিলি ব্রাইটনএ ছিল, প্রদীপকে মুহূর্ত্তের

অনুভব করতে দেয়নি যে, সে এসেছে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্ত। বরং সে এমন ব্যবহার করেছে, নিজেকে প্রদীপের কাছে এমন অকুণ্ঠিতভাবে সমর্পণ করেছে যে, তার মনে হয়েছে এমিলি বোধ হয় তার পরিণীতা বধূ। প্রদীপের স্বাস্থ্য, তার ছোটখাট অভ্যাস নিয়ে সে করেছে উদ্বেগ প্রকাশ, বার বার তাকে সাবধান করে দিয়েছে বিলেতের সমুদ্রতীরের অবিশ্বাসী আবহাওয়া সম্বন্ধে। একদিন প্রদীপ বাইরে বেরুতে চায়নি; কিন্তু এমিলি তাকে জোর করে নিয়ে এসেছে মুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে। সান্নিধ্য, সাহচর্য্য তাকে দিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তা' উন্মুক্ত আকাশের নীচে, জনতার মাঝখানে। প্রদীপ বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু এমিলি তার বিরক্তি উপেক্ষা করে তাকে টেনে নিয়ে এসেছে সেই সব জায়গায়, যেখানে জনতার কোলাহল, উৎসবের মুখরতা। প্রদীপকে এক প্রকার বাধ্য করেছে শ্লটমেশিনে পেনি ফেলে খেলা খেলতে, কার্নিভাল বুথএ ঢুকে নানাপ্রকার বাজি রাখতে। প্রদীপ যদি নাচতে জানত তাহ'লে তাকে হয়ত নাচঘরেও টেনে নিয়ে যেত এমিলি।

অথচ প্রদীপকে স্বীকার করতেই হবে, এই তিন দিন এমিলি তাকে নিবিড় সঙ্গ দিতে কুণ্ঠা করেনি। রাত বারোটার পর তারা যখন বোর্ডিংহাউসএ ফিরে এসেছে, তখন নিঃশব্দে এমিলি চলে এসেছে প্রদীপের ঘরে, শুয়ে পড়েছে তার বিছানায়। তেমনি নিঃশব্দে প্রদীপ তাকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তৃপ্তি পায়নি। কোথায় যেন একটা ফাঁক, একটা অপূর্ণতা সব সময়ই থেকে গেছে।

তারপর এমিলি যখন লণ্ডনের ট্রেণ ধরতে চলে গেল ষ্টেশনে, সে কিছুতেই প্রদীপকে আসতে দিল না তার সঙ্গে। বলল, মাসখানেক পরেই ত আবার দেখা হবে, ষ্টেশনে সেন্টিমেণ্ট্যাল ননসেন্স-এর অভিনয় না করলে কোন ক্ষতি হবে না।

অভিনয়? প্রদীপ প্রতিবাদ করেছিল এবং এমিলিও দুঃখ প্রকাশ করে তার কথাটা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়নি। বোর্ডিংহাউসে প্রদীপের ঘরেই তাকে একটি চুম্বন দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

অদ্ভুত এই এমিলি! অদ্ভুত এই দেশের মেয়ে। অথবা মেয়ে-জাতটার ধর্মই কি এই? কে জানে?…মেয়েদের সঙ্গে প্রদীপের পরিচয় কত অল্প, কত সংকীর্ণ! বন্দনা, সুমিত্রা, গায়ত্রীদি', ছবি এদের কাউকেই কি সে বুঝতে পেরেছে সম্পূর্ণভাবে?…নাঃ, এসব ভেবে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে মনঃ-সংযোগ করা যাক হাতের বইটার ওপর।

আচ্ছা, ছবি এখন কোথায় আছে? তার নার্সিং কোর্স'ও বোধ হয় শেষ হয়ে এল। সে কি এখনও নবকিশোরের মিস্ট্রেস? বেচারী ছবি, কোন অপরাধ তার নেই। যৌবনের প্রারম্ভে লুব্ধ পুরুষের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল ক্ষুধার তাড়নায়, তারপর যদিও বা তার জীবনের গতির মোড় ঘুরবার সূচনা দেখা দিল, তখন রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল নবকিশোর, তার অকুণ্ঠিত সহানুভূতি, সাহায্য নিয়ে।…আচ্ছা, কিসের প্রেরণায় সে নবকিশোরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছে—কৃতজ্ঞতার না ভালবাসার?

ছবির কথা বার বার মনে হচ্ছে কেন আজ? এমিলি আর ছবি—এক হিসেবে ছবিই তার জীবনের প্রথম নারী, বন্দনা নয়। বন্দনা প্রথম থেকেই ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাকে তার জীবনের নারী বলা অসঙ্গত, অশোভন হবে। অথচ ছবির কথা এমিলি জানে না, সে জানে যে প্রদীপের জীবনের প্রথম নারী বন্দনা, আর দ্বিতীয়া সে নিজে।

যদি, যদি সে নবকিশোরের উপর ছবির ভার না দিয়ে নিজেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করত, তাহ'লে ছবি কি তারই দিকে ঝুঁকত না উন্মুখ কৃতজ্ঞতায়? আর তখন সে কি করত? নবকিশোরের মত তাকে নিয়ে যেত মোমিনপুরের সেই ফ্ল্যাট-এ? না, না, তা' কিছুতেই পারত না। ছবির কৃতজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'ত।

দূর ছাই! কেবলই অসম্ভাব্য সব কথা মনে আসছে! এমিলি যদি আজ কাছে থাকত তাহ'লে এ-সব চিন্তাধারাকে এতটুকু বিপর্যস্ত করতে পারত না। গল্পে, পরিহাসে এমিলি তাকে ডুবিয়ে রাখত, তার দুরন্ত মনকে করত শান্ত।

আচ্ছা, ঐ দূরে একটি ভারতীয় মেয়েকে দেখা যাচ্ছে যেন! হ্যাঁ, ভারতীয়ই বটে, এখানে শাড়ীর প্রাচুর্য্য নেই, তাই শাড়ীপরা কাউকে দেখলে সহজেই নজরে আসে।

তার দিকেই মেয়েটি হেঁটে আসছে যে! সে তাকে সম্ভাষণ করবে কি? বিদেশে দেশের মেয়ের প্রতি সৌজন্য দেখানো নিশ্চয়ই তার কর্ত্তব্য।

ছয়

মেয়েটি অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল। প্রদীপের মনে হ'ল, অন্যান্য হলিডে মেকারদের মত সে-ও ভাবছে কোথায় যাওয়া যায়। বোধ হয় ব্রাইটন-এ আজকালের মধ্যেই এসেছে!

এ কি? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যেন?···অ্যাঁ, এ যে ছবি! ছবি এখানে? বিলেতে? ব্রাইটন-এ!

হঠাৎ ছবির চোখ পড়ল প্রদীপের দিকে। সে-ও বোধ হয় আশা করেনি এখানে এই ভাবে প্রদীপের সঙ্গে তার দেখা হবে। সে থমকে দাঁড়াল।

প্রদীপ উঠে পড়ল, এগিয়ে গেল ছবির কাছে। প্রশ্ন করল, তুমি ছবি, নয় কি?

ছবি ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।

যেন বহুদিনের পুরানো দুই বন্ধুর দেখা, এই ভঙ্গীতে প্রদীপ বলল, একেই বলে পৃথিবী কত ছোট। ব্রাইটন-এ তোমার সঙ্গে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। ভাল আছ ত!

ছবি তবু কোন কথা বলল না, ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে ভাল আছে।

—কবে এসেছ? কোথায় আছ?

এবার ছবি মুখ খুলল, বলল, গতকাল রাতে। আছি একটা বোর্ডিংহাউসে।

—একা এসেছ, না সঙ্গে আর কেউ আছে?

ছবি তিরস্কারের চোখে প্রদীপের দিকে তাকাল। তারপর বলল, একাই এসেছি।

দু'জনে তখন হাঁটতে সুরু করেছে। প্রদীপ বলল, কোন তাড়া নেই ত?

ছবি জবাব দিল যে, তার কোনই তাড়া নেই, সে বেরিয়েছে ব্রাইটনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়টা করে নিতে।

—তাহ'লে চলো, ঐ দিকে যাওয়া যাক্। বিলেতে কবে এলে?

—তা' মাস তিনেক হবে।

—কোথায় আছ?

—লণ্ডনে। দেশের নার্সিং কোর্স শেষ হয়ে গেছে, একটা স্কলারশিপ পেয়েছি। এখানে সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে কাজ করতে এবং শিখতে এসেছি। বছর দুই থাকতে হবে।

—বেশ, বেশ। আমিও লণ্ডনেই থাকি।

এবার ছবি প্রশ্ন করল, তাই নাকি? আপনি কত দিন এদেশে আছেন? কি করছেন?

সংক্ষেপে প্রদীপ জানাল তার বিলেতে আসার ইতিবৃত্ত। বিলেতে আসার পর সে কি কাজ করছিল এবং এখন কি করছে, তা'ও তাকে জানাল। আর বলল যে ব্রাইটন-এ সে মাসখানেক থাকবে—একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

ছবি বলল, আমার মাত্র দু'হপ্তা ছুটি। তারপর আমাকে ফিরে যেতে হবে হাসপাতালে।

—What a pity! সে যাই হোক, এই দু'হপ্তা দেখা-শুনা হবে নিশ্চয়ই।

ছবি কোন জবাব দিল না।

—তারপর দেশের খবর বলো। তুমি ত আমার অনেক পরে এসেছ, অনেক নতুন খবর দিতে পারবে নিশ্চয়ই?

—নতুন খবর আর কি আছে, মিঃ গুহ? কাগজে ত সবই দেখতে পান। আর দু'দিন পরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে, এতদিন চলছিল তারই জন্ত প্রস্তুতি।

প্রদীপের মনে পড়ে গেল আর দু'দিন বাদেই আসছে ১৫ই আগষ্ট।

—কলকাতার খবর বলো।

—কি খবর জানতে চান, বলুন?

কি খবর জানতে চায় তা' প্রদীপ ভালভাবেই বোঝে, (ছবিও বোঝে না কি ?) কিন্তু প্রশ্নটা জিভের গোড়ায় এসেও আটকে গেল।

সে বলল, এই যে বাংলা দেশ বিভাগ করা হচ্ছে, কলকাতার কি হবে ?

—কলকাতা ? কলকাতা পশ্চিম বাংলার মধ্যেই থাকবে। ওরা চেয়েছিল কলকাতাকে যুগ্ম রাজধানী করতে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বাংলার, কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজী হয়নি। ওদের রাজধানী হবে ঢাকায়।

—আর কলকাতার মুসলমান বাসিন্দারা ?

—তারা প্রায় সবাই কলকাতায়ই থাকবে। দু'-চারজন হয়ত ব্যবসার লোভে ঢাকায় যাবে, কিন্তু তারাও কলকাতার অফিসটা তুলে দেবে না।… আমরা ত আর মুসলমানদের তাড়াতে চাচ্ছি না !

—টেন্‌সন্ কি এখনও রয়েছে কলকাতায় ?

—না, এখন সব শান্ত। সবাই অপেক্ষা করে আছে ১৫ই আগষ্টের জন্ত।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পড়েছিল, যেখানে সব চেয়ে বেশী কোলাহল সেখানে।

ছবি বলল, আপনার এত সব চেঁচামেচি ভাল লাগে ? আমার কিন্তু লাগে না !

প্রদীপ বলল যে সে ছবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এবং সেইজন্তই সে খান-দুই বই নিয়ে বসেছিল নিভৃত ঐ কোণটায়।

—আপনি ক'দিন এখানে আছেন ?

—পাঁচ-ছয় দিন হবে।

—তাহ'লে ত ব্রাইটন্ আপনার বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। এখানে দেখবার কি আছে ?

—বিশেষ কিছুই নেই, এই সমুদ্রের ধারটা এবং একেই কেন্দ্র করে যে সব অ্যামুজমেণ্ট বুথ্ গড়ে উঠেছে সে ছাড়া। তবে যারা নাচতে ভালবাসে, তাদের জন্ত দু'-তিনটা বড় বড় নাচঘর আছে।

—আপনি নাচেন না !

—না, নাচতে আসে না!

—প্রশ্নটা করার অবশ্য কোনই মানে হয় না। আমার আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল আপনি নাচেন না।

এ কথার তাৎপর্য্য প্রদীপ চুপ করে রইল। তার একবার ইচ্ছা হ'ল যে ছবিকে প্রশ্ন করে, সে নাচে কি না, কিন্তু কি ভেবে এই প্রশ্ন সে উত্থাপন করল না।

ছবি নিজেই বলল, আমি কিন্তু একটু-আধটু শিখেছি এই বিদ্যেটা, দেশে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কয়েকজন নার্স-এর দৌলতে। আর এদেশে ত দেখছি প্রতি মাসেই একটা-না-একটা নাচের উৎসব লেগেই আছে। যেদিন উৎসব থাকে আমাদের হাসপাতালে সে কি উৎসাহ, কোলাহল! আমার কিন্তু এতটা ভাল লাগে না, যদিও মাঝে মাঝে নাচঘরে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আরও খানিকটা দূর তারা এগিয়ে গেল। তারপরই ছবি বলল, এখন ফেরা যাক, বেশ ক্লান্ত বোধ করছি।

প্রদীপ প্রস্তাব করল যে, তারা দু'জনে কোন একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে লাঞ্চ খায়, কিন্তু ছবি রাজী হল না। বলল, আজ বোর্ডিং-হাউসে আমার প্রথম লাঞ্চ। বুড়ীকে বলে আসিনি, যদি সময়মত উপস্থিত না হই, তাহলে ভাববে নতুন জায়গায় এসে বুঝি হারিয়ে গেলাম।

প্রদীপ ছবিকে এগিয়ে দিল তার বোর্ডিং-হাউসের দোরগোড়া অবধি। তারপর সে-ও চলে গেল তার নিজের আস্তানায়।

ছবির সঙ্গে প্রদীপের প্রায়ই দেখা হতে লাগল ব্রাইটন-এর সমুদ্র-সৈকতে। প্রদীপ লক্ষ্য করল, ছবির বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। তবে তার বন্ধুত্ব যে বিশেষ কোন একজন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এটাও তার নজর এড়াল না। যখন ছবি সহচর-সহচরী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত, প্রদীপ সাধারণতঃ তাকে সম্ভাষণ করবার কোন চেষ্টা করত না—যেন সে অন্য কিছু দেখছে বা ভাবছে, এই ভাণ করে দৃষ্টি এড়িয়ে নিত।

ছবি এক দিন প্রশ্ন করল, আচ্ছা মিঃ গুহ, আপনি এতদিন ব্রাইটন-এ আছেন, আপনার বন্ধু বা বান্ধবী একটিও দেখছি না ত?

—না থাকলে কি করে দেখবে? প্রদীপ জবাব দিল।

—আপনি ত চেষ্টা করেন না! এই সেদিন আমার দলের দু'জনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিলাম, তার মধ্যে একজন আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, কিন্তু পরের দিন যখন তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হ'ল, আপনি এমন ব্যবহার করলেন, যেন তাকে জন্মেও দেখেন নি! বেচারী কি অপমানিত বোধই না করল! আমাকে বলছিল, তোমার ভারতীয় বন্ধুটি কি অহঙ্কারী!

—অহঙ্কার আমার এতটুকু নেই, ছবি! তবে এই সব প্রগল্‌ভা তরলচিত্ত মেয়েদের সংসর্গ আমার ভাল লাগে না।

—ওরে বাবা! আপনি বুঝি intellectual মেয়েদের সঙ্গ চান? তাহ'লে ব্রাইটন-এ এলেন কেন? লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে গেলেই পারতেন।

—আমি কোন মেয়ের সঙ্গই কামনা করছি না, ছবি!

—তাহ'লে ত আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই উচিত হচ্ছে না। পরিহাসের সুরে ছবি বলল।

—তোমার কথা আলাদা।

—ধন্যবাদ! কিন্তু সত্যি বলছি মিঃ গুহ, আপনি যে জীবনযাপন করছেন বা করবার চেষ্টা করছেন, তা' অত্যন্ত অস্বাভাবিক। রুবিকে যদি আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে, তাহ'লে ডরিস-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব?

অসহিষ্ণুভাবে প্রদীপ জবাব দিল, তোমার রুবি, ডরিস কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই, ছবি! আমি যেমন আছি, তেমনি থাকতে দাও।

—আপনার যা অভিরুচি! আমি অবশ্য আপনার ভালর জন্যই বলেছিলাম।

—এবার আমার ধন্যবাদ দেবার পালা। শত-সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তারপর প্রশ্ন করল, আজ তোমার কি প্রোগ্রাম? লাঞ্চের পর সমুদ্র-স্নান, তারপর বেশ পরিবর্তন করে ঘুরে বেড়ানো, ডিনার খাওয়া এবং পরিসমাপ্তি নাচঘরে?

—আজ এই প্রোগ্রাম একটু বদল করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সমুদ্র-স্নানটা বাদ দিতে চাইনে, কারণ ওটা সত্যিই আমি ভালবাসি, তার পরে বেশ পরিবর্ত্তনও করব, তবে ভাবছি আজ আপনার স্কন্ধে আরোহণ করব কি না। আপনি সেদিন লাঞ্চ-এ নেমন্তন্ন করেছিলেন, গ্রহণ করতে পারিনি, তার বদলে আজ আমাকে ডিনারে নিয়ে যাবেন, মিঃ গুহ ?

—তুমি আসবে ? আমি খুব খুসী হ'ব। সাগ্রহে প্রদীপ বলল।

সন্ধ্যার একটু পরে তারা দু'জনে মিলিত হ'ল কার্ণিভ্যাল ষ্ট্যাণ্ড-এর বাইরে।

প্রদীপ বলল, এবার তোমার হুকুম করবার পালা। এই সন্ধ্যা এবং রাতটা সম্পূর্ণ তোমার, তুমি যে অভিলাষ প্রকাশ করবে, তা' আমি পূরণ করতে চেষ্টা করব, সাধ্যমত।

—সত্যি বলছেন ? ছবি একটু যেন গম্ভীরভাবেই বলল।

—সত্যি বলছি।

—নাঃ, আপনাকে বিপদে ফেলবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার দাবী খুবই সামান্য এবং সাধারণ। প্রথমে চলুন কার্ণিভ্যালে, তারপর কোথাও খেতে যাব, তারপর সমুদ্রতীরে খানিকটা ভ্রমণ, তারপর স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান এবং নিদ্রা।

—তথাস্তু। প্রদীপ বলল।

তারপর একটু ইতস্তত: করে বলল, আমাকে তুমি মিঃ গুহ ব'লে সম্বোধন করে আসছ, সম্বোধনটা বদলাতে পার না ?

—কি ভাবে বদলাব বলুন ত ? আপনার নামটা যে ভুলে গেছি, আপনাকে মিঃ পি. গুহ বলেই জানি।

ছবির কথার মধ্যে যেন একটা পরিহাসের সুর।

—আমার নাম তুমি নিশ্চয়ই জানো, এখন ভুলে যাবার ভাণ করছ। যাই হোক, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার নাম প্রদীপ।

—ওঃ হো, এবার মনে পড়েছে। কিন্তু আপনাকে নাম ধরে ডাকতে কিছুতেই পারব না, মিঃ গুহ এই সম্বোধনটাই আমার মুখে বেশী শোভন হবে।

— আমি বুঝতে পারলাম না, ছবি!

—সব জিনিসই যে বুঝতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? না বোঝার আনন্দটাই একটু উপভোগ করুন না কেন?

তারপর চপল হাসি হেসে বলল, যত সব সীরিয়স আলোচনা করে আজকের এই সন্ধ্যাটা আপনি মাটি করে দিচ্ছেন। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না—চলুন, কার্ণিভ্যালের টিকিট কিনে নিয়ে আসুন।

কার্ণিভালের ভেতরে গিয়ে ছবি হ'য়ে উঠল চঞ্চল, উচ্ছল, দুরন্ত। প্রদীপকে টেনে নিয়ে সে চলল এক ব্যুথ থেকে অন্য ব্যুথ-এ, প্রদীপকে বাধ্য করল তার হয়ে বাজি খেলতে, মৎস্যরাণী দেখবার জন্য লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নানারকম পরিহাস ক'রে প্রদীপকে সে করে তুলল উদ্ব্যস্ত। প্রদীপ পুরুষ মানুষ, তার উচিত নয় একজন মেয়ের সঙ্গে মৎস্যরাণী দেখা, তবু ছবি তার সঙ্গে এসেছে নির্ভয়ে, কারণ সে জানে, প্রদীপের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে অন্য দিকে! তারপর তারা দু'জনে চড়ল নাগরদোলায়, নেমে যখন এল তখন ছবির মাথা ঘুরছে, কিন্তু তবু তার ক্লান্তিবোধ নেই।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সমুদ্রের তীরেই এক রেস্তঁরায় ডিনার খেল, তারপর বেরিয়ে এল ভ্রমণে।···চারদিকে যুগল মূর্ত্তি, হাতে হাত ধরে চলেছে, হয়ত একটু থেমে কয়েক মিনিটের জন্য পরস্পরকে চুম্বন বা আলিঙ্গন করছে, হাস্‌ছে, গান করছে, মনের আনন্দে। মাঝে মাঝে প্রদীপ বেশ একটু লাল হয়ে উঠ্‌ছিল, কিন্তু ছবির ভ্রূক্ষেপও নেই। যেন সে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবীর মানুষ, এই পৃথিবীর নরনারীর হাস্যলাস্য যেন তার বোধশক্তির বাইরে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা দু'জনে এসে পড়ল প্রদীপের বোর্ডিংহাউস-এর কাছাকাছি। প্রদীপ প্রশ্ন করল, ক্লান্ত লাগছে কি, ছবি?

—একটু।

—আমার বোর্ডিংহাউস খুবই কাছে, একটু বিশ্রাম করবে?

—বেশ ত, চলুন না!

প্রদীপের পেছনে পেছনে ছবি ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বলল, উঃ, কি গরম! ...বলে সে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল।

প্রদীপ বলল, বসো।

ঘরে ছিল ছোট একটা ঈজিচেয়ার। ছবি সেখানে এলিয়ে দিল তার যৌবনদীপ্ত দেহ। আঁটসাট বাঁধুনীর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠল প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্য, প্রদীপ যেন আঘ্রাণ করল, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আদিম এক সৌরভ।

প্রদীপ বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, ছবি?...সঠিক জবাব দেবে?

নিমীলিত চোখে ছবি জবাব দিল, প্রশ্ন করুন, সম্ভব হ'লে জবাব দেব।

—নবকিশোরের কোন খবর পাও?

নবকিশোরের নাম উল্লেখে ছবি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসল। বলল, এ প্রশ্নের অর্থ?

—অর্থ বিশেষ কিছু নেই, শুধু কৌতূহল।

—আপনার কৌতূহল মেটাতে আমি অক্ষম, মিঃ গুহ!

প্রদীপ চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আর কোন প্রশ্ন তোমায় করব না, ছবি! শুধু তোমাকে জানাতে চাই যে, সেদিন মোমিনপুরে আমি নিজের উপর কনট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম।...আমার ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত, আমাকে ক্ষমা করো।

ছবি কোন কথা বলল না, চোখ বুজে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসে রইল।

ছবির এই নীরবতা প্রদীপকে ক'রে তুলল ক্ষিপ্ত, উদ্ভ্রান্ত। সে হঠাৎ চেয়ারটার হাতলের উপর এসে বসল এবং এক হাত দিয়ে ছবির মুখখানা টেনে নিয়ে তার রক্তিম অধরের উপর এঁকে দিল গভীর চুম্বন।

মুহূর্ত্তের জন্য। ছবি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, আপনার স্পর্দ্ধা ত কম নয়, মিঃ গুহ! আমার সরল ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমাকে ঘরে এনে অপমান করলেন!

—অপমান? আমি ত তোমাকে অপমান করতে চাইনি, ছবি!

অপমান ছাড়া এ আর কি? তীব্রভাবে ছবি বলল। 'আপনি মনে করেন, আমি হচ্ছি পুরুষের খেলার পুতুল, যখন যে আমাকে একটু স্নেহসূচক কথা বলবে, একটু আদর করবে, আমি তখ্‌খুনি হব তার শয্যাসঙ্গিনী! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মিঃ গুহ, আমারও একটা সত্তা, একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যার-তার আহ্বানে আমি সাড়া না-ও দিতে পারি!

—আমি ভুল করেছি, ছবি! কাতরভাবে প্রদীপ বলল।

—ভুল বললে একে অনেক লঘু করে দেখা হবে, মিঃ গুহ! প্রথম যেদিন মোমিন্‌পুরের ফ্ল্যাটে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন আপনি এমন ভাব দেখালেন যে, আমি মনে করলাম আপনার মত সদাশয়, মহৎ ব্যক্তি আর হয় না। তারপর আপনি আপনার বন্ধুর ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে সরে পড়লেন, একবারও ভেবে দেখলেন না, যার উপর দায়িত্ব চাপালেন, সে তা গ্রহণ করবার উপযুক্ত কি না। তারপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই হ'ল, আর তখন আপনি এলেন আপনার মহৎ বিরক্তি প্রকাশ করতে। অন্যের জীবন আপনার খুসী এবং খেয়াল মত চলবে না, চলতে পারে না, মিঃ গুহ!

—তোমার জীবন আমার খুসী অথবা খেয়ালমত নিয়ন্ত্রিত করতে চাইনি, ছবি!

—আপনি থামুন। তারপর হঠাৎ এখানে ব্রাইটন-এ হল দেখা। আমার উচিত ছিল আপনাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা, কিন্তু ভাবলাম, বিদেশে আমরা দু'জন বাঙালী, আগের পরিচয়ও আছে, কি প্রয়োজন অতীতের জের টেনে আনায়? তাই আপনার সঙ্গে মিললাম। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম, আমার বিগত জীবন সম্বন্ধে আপনার অদম্য কৌতূহল, ব্রাইটন-এ আমি একা এসেছি, না অন্য কেউ আমার সঙ্গে এসেছে, এই হল আপনার প্রথম প্রশ্ন। কোন্ অধিকারে আপনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পান? মিঃ গুহ! তা ছাড়া, আপনার মত নারীবুভুক্ষু পুরুষমানুষদের চিনতে আজকাল আমার দেরী হয় না। তাই খুবই চেষ্টা করলাম আপনাকে আমার দু'চারজন বন্ধুর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতে, কিন্তু তাদের আপনার মনে ধরল না, তারা

আপনার মত intellectual-এর যোগ্য সঙ্গিনী নয়! নিজেকে প্রতারণা করবেন না। মিঃ গুহ, আপনি বুদ্ধিসম্পন্না সঙ্গিনী চান না, আপনি চান আমার, বন্দনা দেবীর মত সঙ্গিনী। যাদের বুদ্ধি হয়ত খানিকটা আছে, কিন্তু তা' ছাড়াও আছে উত্তপ্ত দেহ, উদ্ধত বুক, রসসিক্ত ঠোঁট। এর জন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ এ চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পেতে হলে পাবার যোগ্য হ'তে হয়। আপনার না আছে সরল ব্যবহার, না জানেন টেকনিক!

ব'লে ছবি হাঁপাতে লাগল। অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে সে ক্লান্ত, অবসন্ন বোধ করল।

লজ্জায়, অপমানে প্রদীপ মাথা নীচু করে রইল।

কোটটা পরতে পরতে ছবি বলল, অনেকগুলো অপ্রিয় কথা আজ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মিঃ গুহ! এর জন্য ক্ষমা চাইব না, বরং প্রার্থনা করব, ভগবান যেন আপনাকে আপনার মনের গোলকধাঁধার হাত থেকে মুক্তি দেন। ...না, আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না, আমি পথ চিনে নিজেই যেতে পারব। নমস্কার!

সাত

এমিলি খুবই বিস্মিত হ'ল যখন সে শুনল যে, তার চলে আসার কয়েক দিন পরেই প্রদীপ ব্রাইটন্ থেকে ফিরে এসেছে। সে ছুটে গেল প্রদীপের কাছে, উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করল, তার শরীর ভাল আছে কি না।

ম্লান হাসি হেসে প্রদীপ বলল যে তার শরীরের এতটুকু অসুস্থতা নেই, কিন্তু ব্রাইটন্-এর আবহাওয়া তার আর ভাল লাগছিল না ব'লে সে আসতে বাধ্য হয়েছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এমিলি বলল, না দীপ, ব্রাইটন-এর আবহাওয়া বিষিয়ে যাবার পেছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে!

—গূঢ় কারণ আর কি থাকতে পারে? তোমার অভাবটাকেই কারণ বলে ধরে নিতে পার—পরিহাস করে প্রদীপ বলতে চেষ্টা করল।

—সেটা হয়ত অন্যতম কারণ, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। আমাকে বলতে কি কোন বাধা আছে?

প্রদীপ চুপ করে রইল, তারপর বলল, বলব এক সর্ত্তে।

—কি সর্ত্ত?

সর্ত্তটা আর কিছুই নয়, সব কথা জেনেও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেনা? অন্ততঃ আমাকে সুযোগ দেবে to prove myself?

—কি পাগলের মত কথা বলছ, দীপ! এমন কি অন্যায় তুমি করতে পার যার জন্য আমি তোমাকে ছেড়ে যাব? আর একজন মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, এই ত? তার জন্য দায়ী তুমি নও, তার জন্য দায়ী আমি অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতি এবং ব্রাইটন্-এর ছোঁয়াচে হাওয়া!

এমিলির কথার ভঙ্গীতে প্রদীপ আশ্বস্ত বোধ করল। ধীরে ধীরে সে তার কাছে খুলে বলল সব কথা—ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কাহিনী থেকে সুরু করে শেষ প্রত্যাখ্যানের অধ্যায় পর্য্যন্ত। এতটুকু গোপন সে করল না।

শান্তভাবে এমিলি সব শুনল, তারপর প্রদীপের মুখটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমার প্রিয়তম দীপ, আমি তোমাকে বলছি, তুমি অপরাধ কিছুই করোনি, তবে কতকগুলো ভুল, ছেলেমানুষী, বোকামি করেছ, যার জন্য আজ তোমাকে এতখানি কষ্ট পেতে হ'ল। তুমি শীগ্‌গীরই ভুলে যাবে তোমার জীবনের এই পরিচ্ছেদ, আমার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার ব্যথা ধুয়ে-মুছে ফেলতে।

—আমি এখনই অনেকটা হালকাবোধ করছি, এমিলি!

—তোমার উচিত ছিল, অনেক আগেই ছবির কথা আমাকে বলা। আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম, কোথায় তোমার ভুল হয়েছিল। তাহ'লে তুমি এই শেষের ভুলটা হয়ত করতে না—অন্ততঃ পরিসমাপ্তিটা এই ভাবে হ'ত না!

—সঙ্কোচে আমি তোমাকে বলতে পারিনি।

—সেটা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু এ জাতীয় সঙ্কোচ ভবিষ্যতে তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে, দীপ! নইলে জীবনে অনেক দুঃখ পাবে এবং যারা তোমার সংস্পর্শে আসবে, তাদেরও দুঃখের কারণ হবে।

—তুমি দুঃখ পেয়েছ, এমিলি?

—মোটেই না। কারণ, আমি এদেশের মেয়ে, [illegible] কাহিনী শুনে আমরা মূর্চ্ছা যাই না। তাছাড়া, তুমি ত জান, আমার জীবনও সরলগতিতে বয়ে যায়নি, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে আমিও দু'-একজনকে ভালবেসেছি, তাদের শয্যাসঙ্গিনীও হয়েছি। কিন্তু সে সব এখন বিস্মৃতির গর্ভে, সে সব পুরনো অনুভূতি আমার [illegible] অশান্তি আনে না, আমাকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় না।

—আমার মনটাকেও যদি তোমার মনের মত গড়ে তুলতে পারতাম, এমিলি!

—দুটো মন কখনও এক ছাঁচে ঢালা যায় না, দীপ। তবে, হ্যাঁ, কতকগুলো মোটা সূতো অনুসরণ করতে পার, যাতে ভবিষ্যতে তোমাকে এই জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়।

পরের দিন ১৫ই আগষ্ট। প্রদীপ গেল ইণ্ডিয়া হাউস-এ। অসংখ্য নর-নারী ছাত্র-ছাত্রীতে ইণ্ডিয়া হাউস ভর্ত্তি, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতা পেয়েছে, তারই উৎসব করছে প্রবাসী ভারতবাসীরা। জাতীয় সঙ্গীতের পর হাই-কমিশনার শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি। যাঁর যুদ্ধ আজ হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত। প্রদীপ যখন তার ঘরে ফিরে এল, মুখ উজ্জ্বল, মন আনন্দে

দেখল, এমিলি তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার ঘর সাজিয়ে দিয়েছে নানা রংএর ফুলে। তার বিছানার উপর নতুন একটা ঢাকনি।

—এ কি করেছ তুমি এমিলি ?

—ভাবলাম, তোমার আনন্দে আমিও একটু অংশগ্রহণ করি। আপত্তি আছে ?

গভীর স্নেহে প্রদীপ এমিলিকে চুম্বন করল।

এমিলি বলল, জবাব পেলাম। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করল, ইণ্ডিয়া হাউস-এ কি হয়েছিল, পরিচিত কাদের সঙ্গে দেখা হল, ইত্যাদি।

—দেশ ত স্বাধীন হল, দীপ, এবার তোমার মনটাকে স্বাধীন করতে চেষ্টা কর।

—তার মানে ?

—মানে আর কিছুই নয়, আত্মপ্রত্যয় তোমার আছে জানি, কিন্তু সেটা অনেক সময় চাপা পড়ে থাকে তোমার যুক্তিবাদের পাথরে। জীবনটাকে লজিক-এর আইনে সব সময় বেঁধে রাখা যায় না, কাজেই বাঁধা-ধরা নীতির মাপকাঠিতে সব সময় এর বিচার করো না। জানি, তোমার আদর্শবাদী মন এতে ব্যথা পায়, কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে এই মাটির পৃথিবীতে, সেখানকার শতকরা নব্বুই জন লোক আদর্শকে আমল দেয় না মোটেই, দিলেও সেটার ব্যতিক্রম করে নিজেদের সুযোগ এবং সুবিধামত।

—আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, এমিলি! আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করি তাহ'লে দেখতে পাই, এই

স্বাধীনতা এসেছে আদর্শবাদের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে। অন্য দেশেও নিশ্চয়ই তাই। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যা খাটে, মানুষের ক্ষেত্রে তা কেন খাটবে না?

—আমি সে-কথা বলছি না, দীপ! আদর্শ বা সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হতে আমি বলছি না, আমি বলছি এই যে, তুমি সবার মধ্যে এসব দেখবার আশা করো না, নিজেই দুঃখ পাবে। অর্থাৎ তুমি আগে থেকেই নিজের চারদিকে একটা কৃত্রিম আবরণ সৃষ্টি করে রেখো না, ব্যতিক্রমকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করো।

একটু পরে এমিলি বলল, একটা অনুরোধ করতে পারি?

—কি?

—বন্দনার কাছে একখানা চিঠি লেখ।

—হঠাৎ এই অনুরোধের কারণ?

—হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকেই আমি তোমাকে বলেছি যে, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে তুমি ভুল করেছ। এখন একটা অজুহাত এসেছে, তোমার দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখানে তোমার কেমন লাগছে, সেটা জানিয়ে একটা উপক্রমণিকা অন্ততঃ সৃষ্টি করতে পার!

—আমি ত তোমাকে আগেই বলেছি, বন্দনা আমার কাছ থেকে কোন চিঠির প্রত্যাশা করে না। তাছাড়া, তার অবসরের মধ্যে আমি অনধিকার প্রবেশ করতে চাই না।

—এটা নিছক অভিমানের কথা হল, দীপ! কি করে তুমি জানলে যে সে তোমার চিঠি প্রত্যাশা করে না? একবার লিখেই দেখ না!

—আর কঠোর উত্তর বা প্রত্যুত্তর পেয়ে আনন্দে নাচতে থাকি, কেমন?

—এটা তোমার একটা কমপ্লেক্স হয়ে দাঁড়িয়েছে, দীপ! যদি সে জবাব না দেয়, আর লিখো না। যদি তার জবাব মধুর না হয়? তার প্রতিজবাব দেবার পথ ত খোলাই থাকবে।

—আচ্ছা, আমি বন্দনার কাছে চিঠি লিখি বা না লিখি, তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

—বলব ? প্রথম, আমার মতে তুমি বন্দনার প্রতি অবিচার করছ। আমি মেয়েমানুষ, তাই তার পক্ষ হয়ে তোমার সঙ্গে লড়ছি। দ্বিতীয়, বন্দনার সঙ্গে তোমার সহজ সম্বন্ধ যদি পুনঃস্থাপিত হয় তাহলে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব।

—অর্থাৎ, আমি তোমার ঘাড়ের বোঝা, আমাকে অন্যের কাঁধে তুলে দিয়ে তুমি আলগা হতে চাও!

—খানিকটা তাই। চিরকাল ত আমরা একসঙ্গে থাকতে পাব না। একটা দিন আসবে, যখন আমাদের পরস্পরের কাছে বিদায় নিতেই হবে। সেই বিদায়ের সময়টাতে আমি একটু শান্তি পাব, যদি আমি জানি যে তোমাকে ভালবাসবার, তোমার দেখাশুনো করবার একজন লোক রয়েছে।

প্রদীপ হাসল।

—হেসো না, দীপ! তুমি ভাবছ এবার আমিই সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠছি। মোটেই নয়। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎটা দেখছি বলেই এ-সব কথা ভাবছি এবং উভয়কে প্রস্তুত করছি।

প্রদীপ এবার রাগ করল। বলল, আচ্ছা, এমিলি, তুমি আমার কাছে আস সপ্তাহান্তে একদিন বা তারও কম। সেই সময়টায় তুমি অন্যের কথা না তুলে তোমার আমার কথা বলতে পার না ? আমি তোমাকে ভালবেসেছি, এমিলি!

—না, দীপ ভালবাসা একে বলে না। আমাকে তোমার ভাল লাগে, একথা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমাকে ভালবেসেছ একথা বলে নিজেকে প্রবঞ্চনা করো না। আমার দিক থেকে কোনই ভ্রান্তি নেই এসম্বন্ধে। ভালবাসার প্রকৃত রূপ দেখবার এবং অনুভব করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল, আমি জানি, তুমি আমায় ভালবাস না, আমিও তোমাকে ভালবাসি না।

প্রদীপ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। এমন করে এর আগে কেউ তার মনকে বিশ্লেষণ করেনি।

এমিলি বলে চলল, আমি তোমার কতকগুলো খোরাক জুগিয়েছি মাত্র, শুধু দেহের খোরাক নয়, মনেরও। আমার তৃপ্তি সেইখানে। ছবির প্রত্যাখ্যানে তুমি যে আজ মুহ্যমান হ'য়ে পড়োনি তারও কারণ আমি। এতে দুঃখিত হয়ো না দীপ! তুমি তোমার নিজেকে অতিক্রম করে উঠতে পারো না—পারা সহজও নয়। আমিও আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির নিগড়ে বাঁধা।

এমিলি প্রদীপের ঘাড়ে একটা হাত রাখল। তারপর বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, দীপ! সপ্তাহান্তে একদিন বা তারও কম আমি তোমার কাছে আসি, সেই মূল্যবান সময়টা নষ্ট করা উচিত নয় এই প্রকার বিশ্লেষণে। বিশ্লেষণের কি শেষ আছে কখনও? চুলোয় যাক এই আলোচনা, বাতিটা নিবিয়ে দাও. আমাকে আদর করো।

এমিলি চলে যাবার পর প্রদীপ কেবলই ভাবতে লাগল বন্দনাকে নিয়ে আলোচনার কথা। ঠিকই বলেছে এমিলি, নিছক অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে সে বন্দনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। আজ এক বছরেরও বেশী হতে চলল, একখানা পোষ্টকার্ড লিখেও সে বন্দনাকে জানায়নি যে সে ভাল আছে! সে নিজে না জানালে তার ঠিকানাই বা বন্দনা পাবে কোত্থেকে?

কিন্তু কি লিখবে সে বন্দনার কাছে? তাকে সম্পূর্ণভাবে গোপন ক'রে যেতে হবে এমিলির কথা। সেটা কি উচিত হবে?

না, সে অত্যন্ত সাধারণ একখানা চিঠি লিখবে। কি প্রয়োজন গোড়াতেই এমিলির কথা পাড়বার? একবার ছবির বিষয় নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, এমিলির কথা তুলে সে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে চায় না!

অবশেষে সে লিখল:

"বন্দনা, অনেকদিন পরে তোমার কাছে চিঠি লিখছি। লিখবার একটা অজুহাত আছে, সেটা হচ্ছে যে গতকাল ছিল ১৫ই আগষ্ট। যে

দিনটার জন্য আমরা সবাই হয়েছিলাম উৎকণ্ঠিত, অবশেষে তা এল। এখানে আমরা—ভারতীয়েরা—নিজেদের মত আমোদ আহ্লাদ করেছি। খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতবর্ষব্যাপী উৎসবের সজ্জা। আশা করি তুমি ভাল আছ।

আমার নিজের খবর এই যে, আমি এখানে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম-এ চাকুরী করছি, আর সাথে সাথে সন্ধ্যাবেলায় পলিটেকনিক্-এ ক্লাশ করছি। আরও তিন বছর এইভাবে ক্লাশ করতে হবে, তারপর হয়ত একটা ডিপ্লোমা পাব।—আর সেই সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতাও হবে যথেষ্ট। আশা করি স্বাধীন ভারতে চাকুরীর অভাব হবে না।

তোমার বাবা কেমন আছেন? নবকিশোরের খবর কি? সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় কি? জ্যোতির্ম্ময় বাবু কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন? যে সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন সেই সুযোগও এখন এসেছে, দেশের কল্যাণ সাধনের পথে আর কোন বাধাই ত এখন রইল না। ওঁর খুবই উচিত একটা দায়িত্ব গ্রহণ করা।

আমার ঠিকানা ওপরে দিলাম। মাঝে মাঝে চিঠি লিখলে খুশী হব। ইতি

—প্রদীপ"

পরের সপ্তাহে এমিলি যখন এল, তখন প্রদীপ তাকে জানাল যে, তার উপদেশানুসারে সে বন্দনার কাছে চিঠি লিখেছে।

এমিলি বলল, You are a darling, দীপ!

যথাসময়ে বন্দনার কাছে প্রদীপের চিঠি পৌঁছাল। পরিচিত হস্তাক্ষর. কম্পিতবক্ষে বন্দনা চিঠিখানা খুলল।

খুবই সাধারণ চিঠি। কোন উচ্ছ্বাস নেই, কোন অভিযোগ বা অভিমানও নেই। এ যেন নতুন এক প্রদীপ!

বার বার চিঠিখানা সে পড়ল। তার ড্রয়ার থেকে বার করল জাহাজ থেকে লেখা প্রদীপের প্রায় দেড় বছর আগেকার লেখা অন্য চিঠিটা। দুটো পাশাপাশি সে রাখল. কোন ক্ষোভ, কোন অনুযোগ নেই প্রদীপের এই দ্বিতীয় চিঠিতে।

বন্দনারও কোন অভিযোগ নেই প্রদীপের প্রতি। দীর্ঘ এই অবকাশে সে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে সুরু করেছিল। তারও এক একবার মনে হয়েছিল যে, ছবির বিষয় নিয়ে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে! তাছাড়া, কথাপ্রসঙ্গে আরও দু'-একবার নবকিশোরের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ছবির নাম—বন্দনার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, নবকিশোরের সঙ্গে ছবির কি সম্পর্ক? তবে কি প্রদীপ অপরাধী নয়, অপরাধী নবকিশোর নিজে?

নবকিশোরকে এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন সে করেনি। ছিঃ, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও যে মনের অপ্রসারতার পরিচায়ক। তাছাড়া, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে দিয়ে প্রদীপ চলে গেছে, কি লাভ হবে অতীতের এই পরিচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি ক'রে?

কিন্তু আজ প্রদীপের চিঠি পেয়ে তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। চিঠিখানা নিয়ে সে সোজা হাজির হ'ল নবকিশোরের কাছে।

—দাদা, প্রদীপ বিলেত থেকে চিঠি লিখেছে।

—তাই নাকি? এতদিন পরে? কি খবর তার?

—এই দেখ না।—ব'লে বন্দনা নবকিশোরের হাতে চিঠিখানা দিল।

—বাঃ, বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ত! চাকুরী করছে, ডিপ্লোমার জন্ত তৈরী হচ্ছে, দেশে যখন ফিরবে তখন সে হবে মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার। তা' বেশ ভাল, তুই লিখে দিস্ আমাদের কার্খ্য়ে তার জন্ত জায়গা খোলা রইল।

—যা লিখবার আমি লিখব। আমার তোমাকে দু'-একটা প্রশ্ন করবার আছে, দাদা।

একটু ভয়ার্ত্তভাবে নবকিশোর বন্দনার দিকে তাকাল।

—কি বল্ না? ভণিতা করছিস কেন?

—প্রদীপ আর ছবির সম্বন্ধে তুমি যে কথা আমাকে বলেছিলে, তার কতটুকু সত্যি, আর কতটুকু বানানো, দাদা?

—আবার সেই পুরানো কথা তুললি! তুই জানিস, আমার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে চাইনি, তুই-ই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার পেটের মাঝ থেকে সব কথা বার করে নিলি। আর এখন প্রশ্ন করছিস তার কতটুকু সত্যি, কতটুকু বানানো? একেই বলে মেয়েমানুষী নিরপেক্ষতা!

—অপরাধটা যে আমার, তা' আমি মেনে নিচ্ছি দাদা, কিন্তু আমার সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দাও। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যা' বার হ'ল তাই কি সব, না আরও কিছু আছে?

নবকিশোর এবার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করল। কি বলতে চায় বন্দনা? ছবির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বন্দনা কি আর কারো কাছ থেকে শুনেছে নাকি?

নবকিশোরকে নীরব দেখে বন্দনার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'ল। বলে বসল, তুমি ছবিকে দেখেছ নিশ্চয়ই?

আমতা-আমতা ক'রে নবকিশোর বলল, হ্যাঁ, তা' দেখেছি বই কি—প্রদীপদা'ই ত আলাপ করিয়ে দিয়েছিল!

ব'লেই নবকিশোর উপলব্ধি করল যে, সে একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে বসল।

—তুমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে কেন?

একটু রাগতভাবে নবকিশোর বলল, সে সব দিয়ে তোর কি প্রয়োজন ? তুই দেখছি উকিলের মত জেরা করতে সুরু করেছিস্।

কাতরকণ্ঠে বন্দনা বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, দাদা, আসল ব্যাপারটা জানা আমার কতখানি প্রয়োজন। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে খুলে বলো কি হয়েছিল।

ততক্ষণে নবকিশোর নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে। বেশ কঠিন কণ্ঠেই বললে, তোকে যা বলেছি তার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই, বন্দনা !

বন্দনা তবু সন্তুষ্ট হ'ল না। প্রশ্ন করল, বোঝা যাচ্ছে, তোমার সঙ্গে ছবির মাঝে মাঝে দেখা হয়। তার ঠিকানা জান ?

নবকিশোর বলল, আবার তুই জেরা করতে সুরু করলি ? আমি তোর এই প্রশ্নের জবাব দেব না।

বন্দনা এবার তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। বলল, বেশ, তুমি যদি আমাকে না ব'লো, তাহ'লে আমাকে সুমিত্রার শরণাপন্ন হ'তে হবে।

নবকিশোর এবার রীতিমত ভয় পেল। বলল, এ তোর ভারী অন্যায়, বন্দনা ! এসব ব্যাপারে সুমিত্রাকে জড়াতে চাচ্ছিস কেন ?

—তাহ'লে তুমিই আমাকে ব'লো, দাদা।

—তবে শোন্। প্রদীপদা' আমাকে বলেছিল ছবির জন্য নার্সিং-এর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ক'রে দিতে, আমি সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত।

—দেখা হ'ত ? এখন হয় না ?

—সে এখানকার কোর্স শেষ ক'রে স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত চলে গেছে, আজ তিন-চার মাসেরও বেশী হ'ল। কোথায় আছে, সে খবরও রাখি না। আমার কি প্রয়োজন ? তাচ্ছিল্যের সুরে নবকিশোর জবাব দিল।

বন্দনা আর কোন কথা বলল না, নবকিশোরের কাছ থেকে চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে সে চলে এল তার ঘরে।

কেঁচো খুঁড়তে এ কি সাপ বেরিয়ে এল এবার ? ছবি বিলেতে ? কি

উদ্দেশ্যে সে গিয়েছে সেখানে ? প্রদীপের সঙ্গে মিলিত হতে কি ? বন্ধুবৎসল দাদা কিছুতেই সব কথা খুলে বলবে না তাকে।

প্রদীপের এই হঠাৎ চিঠি লেখার কারণও কি ছবি ? ছবিকে কাছে পেয়ে তার পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছে, তাই কি সে বন্দনার কাছে চিঠি লিখেছে ?

না, এ কি ছেলেমানুষি করছে সে! ছবি যদি প্রদীপের কাছে গিয়েই থাকে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কেন হবে বন্দনার কাছে চিঠি লেখা ? কিন্তু, কিন্তু, ছবি কি সত্যি নার্সিং-এর স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে গেছে, না এ-ও একটা অজুহাত মাত্র ?

কার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবে সে ? কে তাকে পরামর্শ দেবে ? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গায়ত্রীর কথা। গায়ত্রীদির কাছে সে যাবে, তাকে সব কথা খুলে বলবে, এবং তার কাছে চাইবে উপদেশ, প্রদীপের এই চিঠির জবাব সে দেবে কি না, এবং দিলেও কি লেখা সঙ্গত হবে ?

টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে সে বার করল মিঃ সুপ্রকাশ করের ঠিকানা। গায়ত্রী বলল, সে খুব খুশী হবে, বন্দনা যদি পরের দিন বিকেলে এসে তার কাছে চা খায়।

দু'খানা চিঠিই ব্যাগ-এ পুরে বন্দনা এল গায়ত্রীর কাছে।

—এসো বন্দনা, এসো। সেই একদিন দেখার পর আর তোমার কোন খবরই পাইনি। অবশ্য আমরাও ত মাঝখানে মফঃস্বলে ছিলাম। তা' ভাল আছ ত ?

—ভাল আছি, গায়ত্রীদি'।

—প্রদীপের চিঠিপত্র পাও ত ?

বন্দনা চুপ করে রইল। তারপর বলল, সে সম্বন্ধেই আপনার কাছে পরামর্শ করতে এসেছি। প্রায় দেড় বছর পরে গতকাল তার একখানা চিঠি এসেছে।

—সে কি ? বিস্মিতভাবে গায়ত্রী বলল। তোমার কাছে এত দিন চিঠি লেখেনি ? আমার কাছে ত নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছে। ব্যাপারখানা কি বলো ত ?

অশ্রুসজল মুখ তুলে বন্দনা গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল।

—ও কি, তুমি কাঁদছ? ছিঃ, প্রদীপের এ ভারী অন্যায়। কি ছেলেমানুষি করছে সে। তোমার কাছে একখানাও চিঠি লেখেনি এতদিন?

বন্দনা প্রদীপের চিঠি দু'খানা গায়ত্রীর হাতে দিল। গায়ত্রী পড়ল, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না, বন্দনা! বিলেত যাবার আগে কোন্ বিষয় নিয়ে তোমাদের আলোচনা হয়েছিল? কি অন্যায় সে করেছিল?

ধীরে ধীরে বন্দনা খুলে বলল ছবির কাহিনী, নবকিশোরের কাছে যতটুকু শুনেছিল। তারপর সে প্রকাশ করল তার সংশয়ের কথা। প্রথম সংশয়, তার দাদা ছবি সম্বন্ধে অনেক কিছু বোধ হয় গোপন করে গেছে। দ্বিতীয় সংশয়, কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি বিলেতে গেছে কি?

ছবির ইতিবৃত্ত শুনে গায়ত্রী ত স্তম্ভিত! প্রদীপ যে ছবির মত মেয়ের সঙ্গে এই ভাবে জড়িয়ে পড়েছে তা' বিশ্বাস করা কঠিন। গায়ত্রীকেও ত সে ঘুণাক্ষরে কোন কথা বলেনি। নাঃ, এসব হচ্ছে নবকিশোরের বানানো কাহিনী, প্রদীপের মত আদর্শবাদী ছেলে কখনও ছবির সাহচর্য্য কামনা করতে পারে না। এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেই হবে।

বলল, তোমার দাদার কাছ থেকে ছবির পুরো নাম, এখানে কোন্ হাসপাতালে ট্রেনিং নিয়েছিল তার নাম, এ-সব আমাকে জোগাড় করে দিতে পার?

ম্লানমুখে বন্দনা বলল, দাদা কিছুই বলবে না, তার ভয়, আমি হয়ত এমন কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলব যা' তার পক্ষে সুবিধাজনক হবে না।

—তা হ'লে ত মুস্কিল হ'ল। চিন্তিতভাবে গায়ত্রী বলল। তারপর বলল, আচ্ছা, র'সো। আমিই প্রদীপের কাছে চিঠি লিখব, সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে। আমার বিশ্বাস, আমার কাছে সে কিছু গোপন করবে না।

কৃতজ্ঞ চোখে বন্দনা গায়ত্রীর দিকে তাকাল। বলল, আপনি কিন্তু এই চিঠির কথা উল্লেখ করবেন না, অথবা বলবেন না যে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।

—সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

—আমি কি প্রদীপের চিঠির জবাব দেব, দিদি?

—নিশ্চয়! তুমি কেন তাকে সন্দেহের অবকাশ দেবে যে আমরা তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছি?—অবশ্য আমার ওকে চিঠি লেখাটা গোয়েন্দা-গিরি নয়, এ হচ্ছে সম্মুখ আক্রমণ!

হপ্তা দুই পরে একই ডাকে প্রদীপ পেল দু'খানা চিঠি, একখানা বন্দনার, আর একখানা গায়ত্রীর।

বন্দনা সহজ ভাষায় তার চিঠির জবাব দিয়েছে, জবাবে ছবির কোনই উল্লেখ নেই। অনেক দিন পরে প্রদীপের যে চিঠি লিখবার সময় হয়েছে, সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে তার কাজে এবং পড়ায় সাফল্যের জন্য। নবকিশোর যে বলেছে যে তার ফার্ম্ম-এ প্রদীপের জন্য জায়গা খোলা থাকবে, সে কথাও লিখতে ভোলেনি। তারপর সে খবর দিয়েছে সুমিত্রার এবং জ্যোতির্ম্ময় বাবুর। সুমিত্রার সঙ্গে নব-কিশোরের হয়ত শীগগিরই বিয়ে হবে, অন্ততঃ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এবং তার বাবার সেই ইচ্ছা। আর জ্যোতির্ম্ময় বাবু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি, তিনি থাকতে চান সিংহাসনের পেছনে প্রচ্ছন্ন শক্তি হিসেবে, প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চান না।

প্রদীপ হাসল। তারপর গায়ত্রীর চিঠি খুলল। একথা সেকথার পর গায়ত্রী লিখেছে:

"তোমার কাছে আজ একটা বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি এতটুকু গোপন না ক'রে তোমার দিদির কাছে সব খুলে লিখবে। এখানে আমরা শুনলাম, ছবি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে নাকি অদ্ভুত ভাবে তোমার পরিচয় হয়েছিল। তারপর সেই মেয়েটির নার্সিং শেখবার ব্যবস্থাও তুমিই করে দিয়েছিলে। এখানকার শিক্ষা সবাক্ত

করে সে নাকি বিলেতে গেছে, উচ্চতর একটা ডিপ্লোমা নিতে। তোমার দিদির কাছে এ সম্বন্ধে কিছুই বলোনি, হয়ত কোন সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু এখন তোমার দিদি জানতে চায়, প্রথম, কি সূত্রে ছবির সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল, দ্বিতীয়, তুমি কি সত্যি তার নার্সিং শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে, এবং তাই যদি হয়ে থাকে, কেন ? তৃতীয়, সে বিলেতে গেছে কি উদ্দেশ্যে এবং চতুর্থ, বিলেতে তোমাদের দেখা হয় কি এবং হয়ে থাকলে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা কি ? আমি জানি, তুমি কোন প্রকার গোপনতা পছন্দ কর না। তাই আশা করি ফেরৎ ডাকে আমার প্রশ্নগুলোর সহজ এবং সরল জবাব পাব। আর তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে লেখো, তোমার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা আমি করব না।"

প্রদীপ আবার না হেসে পারল না। যেখান থেকেই গায়ত্রী খবর পেয়ে থাকুক না কেন, চিঠিটার পেছনে যে মিঃ করের সিভিলিয়ানি মুসাবিদা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে এই সংবাদদাতা ? বন্দনা নিজে নয় ত ?

না, তাহ'লে বন্দনা এমন স্বাভাবিকভাবে তার কাছে চিঠি লিখতে পারত না।—কে জানে সিভিলিয়ানদের আড্ডায় কত গুপ্তচর থাকে, তাদেরই মধ্যে একজন (প্রদীপের শুভানুধ্যায়ী) গায়ত্রীর কাছে এই খবর পৌঁছে দিয়েছে কি না !

কি জবাব সে দেবে ? গায়ত্রী তার প্রশ্নগুলোর সহজ এবং সরল জবাব চেয়েছে, কিন্তু চিঠিতে সহজ এবং সরল জবাব দেওয়া কি সম্ভব ?

সে ঠিক করল, এমিলির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তার জবাব লিখবে।

এমিলিকে গায়ত্রীর চিঠিখানার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তর্জ্জমা ক'রে পড়ে শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দনার জবাব যে এসেছে, সে খবরও দিল।

এমিলি আনন্দ প্রকাশ করল যে প্রদীপের চিঠি লেখা ফলপ্রসূ হয়েছে। বলল, যাক্, এবার বরফ ভেঙে গেছে, আশা করি এর পর পত্রবিনিময় আরও সহজ, আরও স্নেহপূর্ণ হবে।

—তোমার ওই এক চিন্তা, এমিলি! আমার উপস্থিত সমস্যা হচ্ছে দিদির, মিসেস্ করের, প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া, সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য ক'রো দেখি।

—ছবির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক তার আমি কি জানি? ভাব করবে তুমি, আর জবাব লিখে দিতে হবে আমাকে? চমৎকার ব্যবস্থা ত! পরিহাসের সুরে এমিলি বলল।

—লক্ষ্মীটি, আমাকে আর জ্বালিয়ো না! আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী ভাল জান ছবির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। আমি একটা খসড়া জবাব লিখে রেখেছি, তুমি শুনবে?

দু'জনে মিলে কাটছাঁট করে জবাব তৈরী করল। জবাবটা গিয়ে দাঁড়াল এই:

"ছবি সম্বন্ধে তুমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করেছ, তার সহজ এবং সরল জবাব চেয়েছ। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম সহজ এবং সরল জবাব দিতে, তবে সব বিষয় বোধ হয় বোঝাতে পারলাম না—যদি ভবিষ্যতে সুযোগ পাই অনুচ্ছেদগুলো পূরণ করব।

প্রথম, ছবির সঙ্গে পরিচয় হয় অত্যন্ত অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে, এক এ, আর, পি ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে। আমার কোন অসাধু উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ছিল তার উল্টো। আদর্শবাদী আমি, চেয়েছিলাম তার জীবনের গতির মোড় ফিরিয়ে দিতে।

দ্বিতীয়, তার নার্সিং শেখার ব্যবস্থা আমি করিনি, নবকিশোর করেছিল, তবে আমারই অনুরোধে। এসব বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই আমি নবকিশোরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে নার্সিং শিখেছিল পি. জি. হাসপাতালে। তখন তার সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছিল,

নবকিশোর আমার সঙ্গে ছিল। ছবির সঙ্গে দেশে এই আমার শেষ দেখা। যতদূর জানি, নবকিশোর নিয়মিতভাবে ছবির খোঁজখবর করত।

তৃতীয়, ছবি বিলেতে এসেছে নার্সিং-এর উচ্চতর ডিপ্লোমা নিতে (তার নিজমুখে শোনা—সত্য-মিথ্যা জানি না), দেশ থেকে স্কলারশিপ নাকি পেয়েছে। সে এখানে এসেছে প্রায় চার-পাঁচ মাস হ'ল, কিন্তু আমি তার আসা সম্বন্ধে কিছুই জান্‌তাম না। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ব্রাইটন বলে একটা জায়গায়, যেখানে আমি গিয়েছিলাম হলিডে করতে।

চতুর্থ, বিলেতে ছবির সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। সে স্বাধীন জীবন যাপন করছে, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, আমার বা তার দিক থেকে কোন অভিলাষও নেই।

আশা করি যা' যা' জানতে চেয়েছ, সবই এই জবাবের ভেতর থেকে পাবে।"

প্রদীপ দু'বার তিন বার পড়ল। তারপর বলল, জবাবটা কিন্তু ঠিক হ'ল না, এমিলি! আমি নিতান্ত সাধু সেজে বসে রইলাম, ব্রাইটন-এর ব্যাপারটা ত বলা হল না।

এমিলি বলল, আবার সেই ব্রাইটন-এর ব্যাপার? তোমার এই অদ্ভুত বিবেকের সঙ্গে তাল রাখা যায় না! বেশ, পুনশ্চ করে লিখে দাও: ব্রাইটন-এ আমি ছবিকে চুমু খেয়েছিলাম, উদ্দেশ্য মোটেই সাধু ছিল না। কিন্তু ছবিই আমার গালে চড় মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং তারপর থেকে স্থির করেছি যে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না!

প্রদীপ বলল, কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, এমিলি! তুমি যা' বলবে তা'ই হবে!

নয়

আরও পাঁচ মাস পরের কথা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। বিলেতে প্রদীপের জীবন চলেছে গতানুগতিক ভাবে। দিনের বেলায় ফার্ম্ম, সন্ধ্যায় পলিটেকনিক-এ ক্লাস, আর মাঝে মাঝে এমিলির আগমন—এই ছিল তার রুটিন।

দেশ থেকে গায়ত্রীর চিঠি এসেছিল, তার জবাবের উত্তর। গায়ত্রী লিখেছিল, "প্রদীপ ভাইটি, তোমার চিঠি পেয়ে আমার সব সংশয় ঘুচে গেছে। ছবিকে জড়িয়ে তোমার নামে এখানে যে কুৎসা রটেছিল বা রটবার উপক্রম হয়েছিল, আমি অবশ্যি কোন দিনই বিশ্বাস করিনি। তোমার লেখা চিঠি আমার হাত আরও সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর প্রশ্ন করব না।" বন্দনার কোন উল্লেখ এই চিঠিতে ছিল না।

বন্দনার কাছে ইতিমধ্যে প্রদীপ দু'-তিনখানা চিঠি লিখেছে—উচ্ছ্বাসহীন, সংক্ষিপ্ত চিঠি। বন্দনার জবাবও এসেছে দেড় মাস দু'মাস অন্তর একখানা করে। দেশের খবর, কলকাতার খবরেই তার চিঠি ভর্ত্তি থাকত। সুমিত্রার সঙ্গে অবশেষে নবকিশোরের বিয়ে হ'য়ে গেছে, এই খবরটা শেষের একটা চিঠিতে ছিল।

ছবির সঙ্গে প্রদীপের আর দেখা হয়নি। লণ্ডনের বিরাট জনপ্রবাহে দেখা না হওয়াটা আশ্চর্য্যের বিষয় মোটেই নয়।

আবার নতুন বছরের সূচনা নিয়ে এল ৩১শে ডিসেম্বর। এবার এমিলি তার কাছে নেই, সে গিয়েছিল মাকে নিয়ে তার দিদিমার কাছে, লণ্ডনের বাইরে, পঞ্চাশ মাইল দূরে ছোট্ট একটি শহরে। দিদিমা মৃত্যুশয্যায়। এমিলি অবশ্য প্রদীপকে বলে গিয়েছিল যে সে খুব চেষ্টা করবে ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার আগে ফিরে আসতে। প্রদীপ যেন অন্ততঃ রাত দশটা পর্য্যন্ত তার

জন্য অপেক্ষা করে। তার মধ্যেও এমিলি যদি এসে না পৌঁছয়, তাহলে সে বুঝবে যে তার পক্ষে আসা সম্ভব হ'ল না।

প্রদীপ বার বার তার হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিল। দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। বোধ হয় এমিলি আসতে পারল না, হয়ত বা তার দিদিমার অবস্থা খুবই খারাপ, হয়ত বা তাঁর অন্তিম হয়ে গেছে। প্রদীপের কেবলই মনে হচ্ছিল, আগের বছরের এই রাতটির কথা—কি ভাবে এমিলি জোর করে তাকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরের বদ্ধ আবেষ্টনীর বাইরে। তারপর পিকাডিলি সার্কাসে নতুন বৎসরকে আবাহন (তার কাছে এই বছরটা কত ঘটনাবহুল, কত বৈচিত্র্যময়), সেখান থেকে এমিলিকে নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন, এবং নতুন বছরের নতুন উন্মাদনায় এমিলির তার কাছে, অথবা তার এমিলির কাছে, আত্মসমর্পণ।

ঘড়িতে দশটা বাজল। আরও পনেরো মিনিট কাটল। নাঃ, বাইরে সে যাবে না, ঘরেই বসে থাকবে, এমিলির প্রতীক্ষায়। কে জানে, উৎসবের রাত, পথে যা ভিড়, এমিলি হয়ত এসে পৌঁছবে একটু দেরীতে। প্রদীপকে দেখতে না পেলে সে অতন্ত নিরাশবোধ করবে।

হঠাৎ তার দরজায় কে টোকা মারল। প্রদীপ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজাটা খুলে দিল।

না, এমিলি নয়, তার বাড়ীর বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি।

—মিঃ গুহ, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে, কোন্ এক হাসপাতাল থেকে, অত্যন্ত জরুরী।

হাসপাতাল? সে কি! তাড়াতাড়ি সে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে।

—আপনি মিঃ দীপ গুহ কথা বলছেন? আমি সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ড থেকে বলছি। মিস এমিলি বার্ক নামে একজন মহিলা আধ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছেন। গাড়ী অ্যাক্সিডেণ্ট-এর কেস, অত্যন্ত সীরিয়স, আপনাকে খবর দিতে বললেন—আপনি যদি এখানে চলে আসতে পারেন ভাল হয়। আমি টেলিফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ কয়েক মিনিট। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি প্রশ্ন করল, কোন খারাপ খবর নয়ত, মিঃ গুহ ?

—আমার এক বন্ধু গাড়ী অ্যাক্সিডেণ্টে হাসপাতালে এসেছে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়। আমাকে এখ্খুনি যেতে হবে।

বুড়ীর কাছ থেকে সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের নির্দ্দেশ জেনে প্রদীপ ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। লোকে লোকারণ্য, চারদিকে উৎসবের মাতামাতি। ষ্ট্র্যাণ্ড-এ একটাও ট্যাক্সি নেই। প্রদীপ হাঁটতে সুরু করল, তার পর কিছুদূরে গিয়ে একটা ট্যাক্সি মিলল।

হাসপাতালে প্রদীপ যখন পৌঁছল, তখন সাড়ে এগারোটা হবে। Enquiry Counter এ প্রশ্ন করে সে সোজা ছুটল Casualty Ward এর অভিমুখে। বাইরে একজন নার্স দাঁড়িয়েছিল। প্রদীপ তাকে চিনতে পারল, সে আর কেউ নয়, ছবি।

—আপনি ? এখানে ? আপনার পরিচিত কোন কেস আছে নাকি ? ছবি প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ, এমিলি বার্ক ব'লে একটা কেস একটু আগে এসেছে। আমাকে টেলিফোন করা হয়েছিল, কেমন আছে সে ?

—ওঃ, আপনিই দীপ গুহ ? আমি বুঝতেই পারিনি! আপনার নাম প্রদীপ বলেই জানতাম। আসুন, এদিকে আসুন।

Emergency Operation Roomএর বাইরে একজন ডাক্তার বসেছিলেন। ছবি প্রদীপকে নিয়ে তাঁর কাছে গেল, বলল, ইনিই হচ্ছেন মিঃ দীপ গুহ, মিস বার্ক-এর বন্ধু, আমাদের টেলিফোন মেসেজ পেয়ে এসেছেন। ব'লে ছবি চলে গেল তার ডিউটিতে।

—বসুন। এখ্খুনি ত দেখতে পাবেন না, ব্লাড ট্র্যান্সফিউশন দেওয়া হচ্ছে। কেস সত্যি সীরিয়াস।

—কি হয়েছিল বলুন ত? উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—কি আর হবে, সেই চিরন্তন নিউ ইয়ার্স ইভ ক্যাস্যুয়্যালটি। নিজেই গাড়ী চালিয়ে আসছিলেন লণ্ডনের দিকে, পুলিশ-রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি গাড়ী চালাচ্ছিলেন ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে। লণ্ডনের কাছাকাছি এসে তাঁর সামনে পড়ে যায় উৎসবোন্মত্ত ছেলেমেয়ের দল। বোধ হয় তাদের এড়িয়ে যাবার প্রয়াসে ব্রেক কষেন। কিন্তু আজ অল্প অল্প বরফ পড়েছে দেখেছেন ত, চাকা skid করে গাড়ীটা ধাক্কা লাগে একটা ল্যাম্পপোষ্টে, বাঁ-দিকের মাডগার্ড এবং এঞ্জিনের খানিকটা চুরমার হয়ে গেছে। মিস বার্ক ষ্টিয়ারিং হুইলটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন, বুকে, বাঁ-হাতে, কোমরে খুবই জখম হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার কারণ হচ্ছে যে তাঁর মাথায় চোট লেগেছে।

—আপনার কি মনে হয়? Will she recover?

—বলা কঠিন, অপারেটিং সার্জ্জন বলতে পারবেন।

কাঠ হয়ে প্রদীপ বসে রইল, অপারেটিং সার্জ্জনের নিষ্ক্রমণের অপেক্ষায়।

আধ ঘণ্টারও বেশী কেটে গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজল। নতুন বৎসর—১৯৪৮ সাল।

হাই তুলে বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গি করে ডাক্তারটি বললেন, একেই বলে অদৃষ্ট! নিউ ইয়ার্স ইভ, কোথায় একটু ফুর্ত্তি করব, না, বসে থাকতে হচ্ছে এই হাসপাতালের করিডরে। আমাদের ডিউটি পড়ে by lots—আমার অদৃষ্ট এমন খারাপ যে lotএ আমারই নাম উঠল।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। Emergency operation room থেকে শাদা overall প'রে বেরিয়ে এলেন সার্জ্জন, তাঁর পেছনে পেছনে একজন বিলিতি নার্স।

ডাক্তারের সম্মুখে আসীন প্রদীপকে দেখে তিনি বললেন, আপনিই মিঃ গুহ? আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, ব্লাড ট্র্যান্সফিউসন ক'রেও কোন ফল হ'ল না।

মনে হয় না আমরা ওঁকে বাঁচাতে পারব। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, নার্স আপনাকে নিয়ে যাবে।

রক্তহীন মুখ নিয়ে নার্সের সঙ্গে প্রদীপ ঢুকল অপারেশন থিয়েটারে। এক পাশে ভাঁজকরা পর্দার আড়ালে লোহার খাটের উপর শুয়ে আছে এমিলি। সমস্ত মুখ তার ব্যাণ্ডেজ করা, খোলা আছে শুধু তার দুটি চোখ, নাক এবং ঠোঁট। বাঁ-হাত এবং সারা বুক এবং কোমরও ব্যাণ্ডেজ করা। গায়ের উপর একটা পুরু শাদা চাদর। তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন নার্স, পাশের টেবিলে ইন্‌জেকৃশন-এর যন্ত্রপাতি, ওষুদ।

প্রদীপ এসে এমিলির মুখের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। নার্স এগিয়ে দিল একখানা চেয়ার, প্রদীপ সেখানে বসল।

—তুমি আসতে পেরেছ, দীপ! I am so glad! ভয় হচ্ছিল বুঝি সময়মত পৌঁছতে পারবে না! উঃ—বড় যন্ত্রণা!

নার্স এগিয়ে এল ইনজেকৃশনের সূঁচ হাতে করে। এমিলি বলল, একটু পরে, নার্স—এখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে কি লাভ হবে, ঘুম ত আসবেই, তার আগে আমার fianceর সঙ্গে দুটো কথা বলতে দাও!

নার্স অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়াল।

—শোন, দীপ, আমি বলেছিলাম দশটার মধ্যে তোমার কাছে পৌঁছব, তাই গাড়ীটি চালিয়েছিলাম একটু বেগে। তারপর হঠাৎ কি যে হ'য়ে গেল কিছুই খেয়াল নেই। দিদিমার অবস্থা এখনও ভাল নয়, তাই মাকে তাঁর কাছে রেখে আমি একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম, to keep my assignment with you!—I have kept my assignment, কি বল?

প্রদীপের চোখ জলে ভরে উঠল।

—ছিঃ, কেঁদো না। এই হয়ত ভাল হ'ল। তবে, দীপ, তোমাকে একটা secret কথা বলে যাই। এই কয় দিন আমি নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছিলাম, অবশেষে স্থির করেছিলাম যে, নতুন বছরে আমিই তোমার কাছে প্রোপোজ করব। এটা ১৯৪৮ সাল, লীপ্‌ ইয়ার, জান ত? আমাদের দেশের

রীতি হচ্ছে, দীপ্, ইয়ারে মেয়েরা ছেলেদের কাছে প্রোপোজ করতে পারে, অবশ্য ছেলেরা সেই প্রোপোজাল প্রত্যাখ্যান করতে পারে নিঃসঙ্কোচে। তাই নয় কি, নার্স?

নার্স-এর চোখও ছলছল্ করে উঠছিল। সে শুধু বলল, আপনি কথা বলবেন না, মিস বার্ক, আপনার বিশ্রাম নিতান্ত দরকার।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল এমিলি। বলল, বিশ্রাম? বিশ্রামের অবসর যথেষ্ট মিলবে, নার্স। আমার fianceকে এই কথাগুলো বলবার সুযোগ ত আর পাব না!—হ্যাঁ, কি বলছিলাম, দীপ? ওঃ, আমি না হয় প্রোপোজ করতাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করতে না। কি ভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে বল দেখি?—ঐ যে একটি মেয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—নামটা মনে আসছে না—

—ছবির কথা বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ছবি। এইবার মনে হয়েছে, তার নাম ছবি।—না, না, তার প্রত্যাখ্যানের পেছনে ছিল অন্য কারণ, আর তোমার প্রত্যাখ্যানের মূলে থাকত—মূলে থাকত—

এমিলি কথাটা শেষ করতে পারল না, যন্ত্রণাসূচক একটা মুখভঙ্গী করল। নার্স এসে তাড়াতাড়ি তার ডান হাতে একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে দিল।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে এমিলি অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেয়ো, দীপ, ইংলণ্ডের আবহাওয়া তোমার সইবে না।

ভোর ছয়টার একটু পরে এমিলি মারা গেল।

প্রদীপ বাড়ীতে ফিরল তন্দ্রাগ্রস্তের মত। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থা করেছিলেন এমিলির মাকে খবর দিতে—প্রদীপ তাই আর সেখানে অপেক্ষা করল না। শুধু বলে এল, যদি কোন প্রয়োজন হয়, তাকে খবর দিলেই সে চলে আসবে।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় ছবির সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়েছিল। ছবি বলেছিল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ গুহ! যদি আপনার কোন প্রয়োজনে

'আসতে পারি আমাকে জানালে খুশী হব। আমাকে এই হাসপাতালের টেলিফোনেই পাবেন—আমি যদি না-ও থাকি এরা মেসেজ রেখে দেবে।

একটা অধ্যায়ের শেষ হল আজ। একেই বলে জীবনের ড্রামা! ঠিক একটি বৎসর, অধ্যায়ের সুরু ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে, তার ইতি ১৯৪৮ সালের ঐ তারিখটিতে! অথচ চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যদি প্রদীপকে কেউ বলত যে পরিসমাপ্তি হবে এই ভাবে, তাহলে সে বিশ্বাস করত না, হেসে উড়িয়ে দিত। নিয়তির কাছে সে পরাভব স্বীকার করেনি কখনও, কিন্তু এখন সে দেখতে পেল, মানুষ কত অসহায়, তার আস্ফালন কত অলীক!

কি অর্থ হয় এই বেঁচে থাকার? কেন মানুষ জন্মায়? মৃত্যু যেখানে অবধারিত, শুধু অবধারিত নয়, যে-কোন মুহূর্ত্তে আসতে পারে, তখন মানুষ কেন বোকার মত, পাগলের মত চীৎকার করে অর্থের জন্য, যশের জন্য, স্নেহ-ভালবাসার জন্য? চারদিকে এত হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, কাম, লোভ, এ-সবই একদিন হঠাৎ মিলিয়ে যাবে বুদ্‌বুদের মত—মৃত্যুর নিষ্ঠুর অথচ অবশ্যম্ভাবী সংঘাতে। এমিলির আকস্মিক মৃত্যুতে প্রদীপ আজ প্রথম অনুভব করল যে, জীবনটা অনেকখানি উপহাসের খেলা, নিয়তির কোলে মানুষ অতি দুর্ব্বল, অশক্ত!

দশ

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও তিনটি বছর। এর মধ্যে প্রদীপ বিলেতের কোর্স সমাপন করে পেল তার ডিপ্লোমা। ওদিকে ফার্ম্মও তার কাজে খুসী হয়ে তাকে দিল বড় বড় প্রশংসাপত্র। ইংলণ্ডে অভিজ্ঞ লোকের অপ্রাচুর্য্য, ফার্ম্ম প্রস্তুত ছিল প্রদীপকে পাকাপাকিভাবে তাদের অফিসার গ্রেড-এ ভর্ত্তি করে নিতে, কিন্তু সে রাজী হ'ল না। স্বাধীন ভারতে তার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনেক বেশী—গায়ত্রীও বার বার এই কথাই লিখছিল।

এই তিন বছর প্রদীপ কাটিয়েছিল ব্রহ্মচারীর মত। এমিলির মৃত্যুতে জীবনের অর্থহীন কলরবের উপর তার যে ধিক্কার এসেছিল, তা' যদিও ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে আসছিল, তবু শুধু দৈহিক আনন্দের প্রতি কোন আসক্তি তার ছিল না বললেই চলে।—ইচ্ছা করলে লণ্ডনের বিরাট নাট্যশালা থেকে সে একাধিক শয্যাসঙ্গিনী সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু সেদিকে তার প্রবৃত্তি যায়নি।

ছবির সঙ্গে তার আরও ছু'-একবার দেখা হয়েছিল, একবার একটা থিয়েটার-গৃহে, আর একবার উইম্‌বলডন্‌ টেনিস খেলার মাঠে। সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে সে ছবির সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছিল। যখন তারা মুখোমুখি এসে পড়েছিল, ছবি তাকে প্রশ্ন করেছিল তার পরীক্ষার কথা, তার দেশে ফেরার সময় হ'ল কি না। আর সে-ও পালটা প্রশ্ন করেছিল অনেকটা ঐ জাতীয়।

অবশেষে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে সে ভারতগামী এক জাহাজে রওনা হ'ল দেশের পথে। সুদীর্ঘ চার বৎসর পরে এই প্রত্যাবর্ত্তন।

ওদিকে দেশেও পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল অনেক, অন্ততঃ বাহ্যিক প্রকাশে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমে তৈরী হ'ল রাষ্ট্রের কাঠামো, ভারতবর্ষ বেছে নিল

সাধারণতন্ত্র। দেশকে উন্নত করার জন্য বসল কমিশন, তাঁরা তৈরী করলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া। বাইরে থেকে হঠাৎ যাঁরা উপস্থিত হ'লেন, তাঁরা অবাক্ হয়ে দেখলেন, দেশের লোকের মধ্যে জেগেছে একটা বিরাট উপলব্ধি—একটা অনুভূতি যে অবশেষে সুযোগ মিলেছে, দেশকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে এবং সেই সমৃদ্ধির অংশ দিতে হবে ছোট-বড় সবাইকে।

জ্যোতির্ম্ময়বাবু যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি তার পেছনে ছিল খানিকটা আদর্শবাদ। চিরকাল তিনি কর্ম্মী, অর্থের লালসা তাঁর কোন দিনই ছিল না, তাই বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা ক'রে রয়ে গেলেন মন্ত্রিসভার বাইরে।

বৃটিশ আমল থেকেই জ্যোতির্ম্ময়বাবু একটা সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সেটা হচ্ছে যে অর্থের চেয়েও বড় হচ্ছে ক্ষমতা, বিশেষ করে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যদি সম্ভবপর হয় যবনিকার অন্তরাল থেকে। মহাত্মা গান্ধীও ত সর্ব্বদা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট থাকেননি। এমন অনেক সময় গেছে যখন তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাইরেও ছিলেন। তবু তাঁর ক্ষমতা, তাঁর প্রভাব ছিল অতুলনীয়! জ্যোতির্ম্ময় বাবু বেছে নিলেন গান্ধীজির পন্থা।

অবশ্য গান্ধীজির মত যদি তাঁর নিঃস্বার্থতা থাকত, তিনি যদি হতেন দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য একাগ্রচিত্ত, তাহ'লে কিছুই বলবার ছিল না। কিন্তু যে আত্মম্ভরিতা, যে দম্ভ এত দিন প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশী রাজশক্তির প্রতিবাদে, আজ তা' ছড়িয়ে পড়ল, নতুন রাজশক্তির যারা বিন্দুমাত্র সমালোচনা করতে সাহস করে তাদের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে।—কংগ্রেসের যারা বিরুদ্ধাচারী, তারা সবাই দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, এই হ'ল তাঁর একমাত্র অনুধাবন।

এর ফল হ'ল এই যে ধীরে ধীরে তাঁর চারদিকে গড়ে উঠল স্বার্থান্বেষী স্তাবকের দল। প্রতিপক্ষের যাদেরই প্রতি ছিল কোন অভিযোগ, তাদের সম্বন্ধে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কাছে এঁরা নানারকম নিন্দা করতে লাগলেন, কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে। প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে,

তারাই আসল স্বার্থান্বেষী, অত্যাচারী।—ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাঁর পার্শ্বচরদের কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে লাগলেন এবং তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠল একটা দাম্ভিক আত্মপ্রত্যয়, যা' কোন প্রকার বাধা বা যুক্তি মানে না।

অটলবিহারী বাবু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এই মানসিক উদ্ভবের সুবিধা গ্রহণ করতে এতটুকু দেরী করলেন না। জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে বৈবাহিকরূপে পেয়ে বাজারে ইতিমধ্যেই তাঁর দাম অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল, এখন অটল-বিহারী বাবুর বাড়ীতেই আনাগোণা সুরু করেছিল কত অনুগ্রহপ্রার্থীর দল। তিনি এদের মধ্যে বাছাই করতে সুরু করলেন। যারা সত্যি সত্যি অনুগত, অর্থাৎ যারা বিদ্রোহের কথা স্বপ্নেও মনে করতে পারে না, তাদের তিনি দিলেন আশ্বাস। আর আশ্বাস দিলেন আর এক শ্রেণীর লোককে, যাদের মারফতে হ'বে তাঁর ব্যবসার উন্নতি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা হবার সম্ভাবনা।

বাছাইকরা লোকদের নিয়ে তিনি যেতে সুরু করলেন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বৈঠকখানায়। সেখানে আসতেন শুধু মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের সম্প্রদায় নয়, বড় বড় বিলিতি কোম্পানীর সাহেব, ধনী মাড়োয়ারী, পদস্থ ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, এমন কি গর্ব্বোদ্ধত সিভিলিয়ান সুপ্রকাশ কর এবং তাঁর অনেক সতীর্থ। জ্যোতির্ম্ময় বাবু সর্ব্বদা ব্যস্ত, কাউকে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু যারা প্রার্থী, যারা উপযাচক, তারা ঐ সময়টুকু পেলেই কৃতার্থ। অটল-বিহারী বাবু সর্ব্বদা দেখতে লাগলেন, জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ঐ মাপা পাঁচ মিনিটটুকু যেন উপযুক্ত পাত্রে বর্ষিত হয়।

নবকিশোরেরও উন্নতি হ'ল। সুমিত্রাকে বিয়ে করার পর তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খানিকটা খর্ব্ব হলেও তার ক্ষতিপূরণ সে পেল অন্য ভাবে। শ্বশুরের অনুগ্রহে সে অচিরেই বহাল হ'ল একটা বিলিতি কোম্পানীর শাখা-ম্যানেজার ভাবে এবং তারই কয়েক মাসের মধ্যে কোম্পানীর খরচে সে সস্ত্রীক চলে গেল ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণী সফর করতে। বামপন্থী এক কাগজে এ সম্বন্ধে

একটু মন্তব্য করা হয়েছিল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মুখপত্র থেকে এল তীব্র প্রতিবাদ। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর নিরপেক্ষতা এবং নির্লিপ্ততার উপর সন্দেহ প্রকাশ, এ যে ঘোরতর সিডিশন!

মিঃ সুপ্রকাশ করও দলের মধ্যে ভিড়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে তিনি হচ্ছেন সিভিল সার্ভেণ্ট অর্থাৎ অনুদ্ধত দাস। কি তাঁর প্রয়োজন প্রতিবাদ করায়? বৃটিশ আমল থেকেই তিনি শিখে এসেছিলেন যে সিভিল সার্ভেণ্টের কর্ত্তব্য হচ্ছে নির্ব্বিচারে হুকুম তামিল করা, হুকুমের যুক্তিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও যে ঔদ্ধত্য! তাই নতুন যুগেও তিনি অনুসরণ করলেন সেই নীতি, যদিও মাঝে মাঝে তাঁর সিভিলিয়ানি বিবেকও হয়ে উঠত একটু চঞ্চল, একটু ক্ষুব্ধ। এই সব মুহূর্ত্তে মনকে সান্ত্বনা দিতেন এই বলে যে, তিনি যদি হুকুম তামিল না-ও করেন, তাহ'লে কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ পালন করবার লোকের অভাব হবে না। তখন উপকার হবে কার? মাঝখান থেকে তাঁরই হবে সমূহ ক্ষতি।...এমন বোকামিও কেউ করে, বিশেষ ক'রে পেন্সনের প্রাক্কালে?

নতুন পরিবেশের সঙ্গে স্বামীর সামঞ্জস্য আনবার কঠিন কাজে স্ত্রী গায়ত্রীই এগিয়ে এসেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেক পার্টিও দিয়েছিল নতুন যুগের প্রভুদের এবং তাদের অনুচরবৃন্দকে। কিন্তু একদিন সে-ও বেঁকে দাঁড়াল, যখন সে দেখল যে আদর্শ সিভিল সার্ভেণ্ট হবার প্রচেষ্টায় সুপ্রকাশ সাধারণ নৈতিক অনুশাসনেরও অবমাননা করছে। ঘটনাটা ঘটল, যখন একজন কর্ম্মপ্রার্থী গায়ত্রীর এক বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল গায়ত্রীর বাড়ীতে।

গায়ত্রী অনিমেষের কাহিনী শুনল। সে শুনল যে, তার স্বামীরই অধীনস্থ এক দপ্তরে একটি অফিসারের চাকুরী খালি হয়েছিল, যথারীতি বিজ্ঞপ্তি এবং ইণ্টারভিয়্যুর পর সুপারিশ কমিটি তাকেই মনোনয়ন করেছে, কিন্তু মিঃ কর এই মনোনয়ন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, তার স্থানে তিনি মনোনয়ন করবেন অপর একজনকে, যার স্থান অনেক নীচে।

গায়ত্রী বলল, দেখুন, ওঁর অফিসিয়াল ব্যাপারে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করি না। কাজেই কি কারণে উনি আপনাকে সিলেক্ট করেননি, সে সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আমি অসমর্থ। নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

করুণভাবে অনিমেষ বলল, যুক্তিসঙ্গত কোনই কারণ নেই, মিসেস কর! আসল কারণ হচ্ছে এই যে, উনি যাকে নিতে চান, তিনি হচ্ছেন জ্যোতির্ময় বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

—এ আমি বিশ্বাস করি না।—দৃঢ়ভাবে গায়ত্রী বলল।

—আমি মিছে কথা বলছি না, মিসেস কর। আপনিই ওঁকে প্রশ্ন করে দেখবেন, আমি নিশ্চিত জানি, উনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

সন্ধ্যার পর মিঃ কর যখন বাড়ীতে ফিরলেন, তখন গায়ত্রী উত্থাপন করল অনিমেষের কথা—নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে।

—আমার অফিসিয়াল ব্যাপার নিয়ে তুমি ত এত দিন মাথা ঘামাওনি, গায়ত্রী! আজ হঠাৎ?

—মাথা ঘামাতাম না, কিন্তু অনিমেষ আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে বলেই প্রশ্ন করছি।

একটু বিরক্তির সঙ্গে মিঃ কর জবাব দিলেন, অনেক কারণ আছে, যার জন্য আমরা অনিমেষকে এই চাকুরীর জন্য বিবেচনা করতে পারি না। সব কথা তোমাকে খুলে বলা যায় না।

কাতরভাবে গায়ত্রী বলল, ভবিষ্যতে এ-সব বিষয় নিয়ে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। শুধু আজ আমাকে বল, কি কারণ, আমি কাউকে বলব না, অনিমেষকেও নয়।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মিঃ কর বললেন, একটা কারণ, অনিমেষ হচ্ছে বামপন্থী, সরকারের নীতির সে নিন্দা করে থাকে।

—আর অন্য কারণগুলো কি?

—আরেকটা কারণ, এই চাকুরীটা দিতে হবে অন্য একজনকে, ওপর থেকে হুকুম এসেছে।

—হুকুম এসেছে ? লিখিত হুকুম ?

—তুমি বড্ড তর্ক কর, গায়ত্রী ! হুকুম কি সরকার সব সময় কাগজে-কলমে লিখে দেন ? মুখের নির্দ্দেশই যথেষ্ট ।

—তার মানে, যদিও তোমাদের কমিটি বলছে যে অনিমেষই সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী, তবু সে চাকুরীটা পাবে না। কারণ, তোমার ওপরওয়ালা কারোর অন্য প্রার্থী আছে। অনিমেষকে বাতিল করবার জন্য তোমরা খুঁজে খুঁজে বার করেছ অত্যন্ত অর্থহীন একটা ওজর—কি না, সে সরকারের নীতির নিন্দা করে থাকে। কে সরকারের নীতির নিন্দা করে না শুনি ? তুমি করো না ? আমি করি না ?

গায়ত্রী সত্য সত্যই রেগে উঠেছিল। বলে চলল, তবু খানিকটা সান্ত্বনা থাকত, যদি জানতাম যে যাকে তোমরা চাকুরীটা দেবে বলে স্থির করেছ সে তার উপযুক্ত ! এক কালে নির্ভীক নিরপেক্ষ অফিসার বলে তোমার কত প্রশংসা শুনেছি জনসাধারণের কাছে, বন্ধু মহলে। কোথায় গেল তোমার নির্ভয়, তোমার নিরপেক্ষতা ?

ক্লান্তভাবে মিঃ কর বললেন, তোমার তিরস্কার আমি মেনে নিচ্ছি গায়ত্রী, কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। আমি আপত্তি করলেও সে আপত্তি টিকবে না।

তীব্র শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে গায়ত্রী বলল, পৃথিবীর মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষদের ঐ এক কথা: আমি আপত্তি করলেও সেই আপত্তি টিকবে না, আমি যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করি, তাহলে আমার স্থানে আসবে এমন লোক যার বিবেক বলে কোন পদার্থই নেই। অতএব যে পথে সবচেয়ে কম বাধা, সেই পথই অনুসরণ করা যাক।

মিঃ কর চুপ করে রইলেন।

যথাসময়ে বন্দনা প্রদীপের চিঠি পেয়েছিল। রওনা হবার হপ্তাখানেক

আগে প্রদীপ তার কাছে চিঠি লিখেছিল, তার ডিপ্লোমা লাভের খবর দিয়ে এবং তাকে জানিয়ে যে মাসখানেকের মধ্যেই সে দেশে পৌঁছবে।

প্রায় তিন সাড়ে তিন বৎসর পত্রবিনিময় তারা করেছে, কিন্তু বন্দনার কাছে প্রদীপ রয়ে গিয়েছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রদীপের চিঠিতে ভালবাসার এতটুকু প্রকাশ সে দেখেনি, একমাত্র তার জাহাজ থেকে লেখা প্রথম চিঠিটায় ছাড়া। বিলেতের আবহাওয়াই বোধ হয় মানুষকে এমন করে বদলে দেয়!

তবে একটা পরিবর্ত্তন তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বন্দনা লক্ষ্য করেছিল, ১৯৪৮ সালের পর অবধি প্রদীপের চিঠিগুলোর মধ্যে ছিল একটা অবসাদের সুর, যেন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, জীবনের বোঝা আর বইতে পারছে না। বন্দনা তার এক চিঠিতে একবার এ সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করেছিল, কিন্তু প্রদীপ এই প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিল। শেষ অবধি প্রদীপের চিঠিতে বিষাদের ছায়া ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বন্দনা প্রদীপের চিঠিগুলো গায়ত্রীকে দেখাত। ছবি সংক্রান্ত ব্যাপারে গায়ত্রীর হস্তক্ষেপ করার পর অবধি গায়ত্রীদি'র সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অনেকখানি গভীর এবং সহজ হয়ে এসেছিল। গায়ত্রী ও প্রদীপের এই অবসাদের কোন কারণ নির্দ্ধারণ করতে পারেনি। অবশেষে তারা দু'জনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, এতদিন দেশের বাইরে থাকার ফলে প্রদীপের মত লোকের মনে বিষাদের ছায়া পড়া মোটেই আশ্চর্য্যের নয়।

এগারো

যে তিন সপ্তাহ প্রদীপ জাহাজে ছিল তার অধিকাংশ সময় সে কাটাল নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে এবং নিশ্চুপ আত্মবিশ্লেষণে। জাহাজে পূর্ব্বপরিচিত বিশেষ কেউ ছিল না, দু'-চারজনের সঙ্গে পরিচয়ের যে সূত্রপাত হয়েছিল তা' হয়ত খানিকটা অন্তরঙ্গতায় পূর্ণতালাভ করতে পারত, কিন্তু প্রদীপ সেদিকে ঘেঁষল না। সে নিজেকে মগ্ন রাখল বই-এর পাতায় এবং সমুদ্রের কালো, নীল, লোহিত জলের ধ্যানে। ফলে, তার সঙ্গে যারা আলাপ করতে সুরু করেছিল তারাও ধীরে ধীরে কেটে পড়ল।

সে ভাবতে লাগল, দেশের নতুন পরিবেষ্টনে তার স্থান কোথায় হবে। যে ভাবে এবং যে সময়ে সে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল (পলায়ন বই কি? এমিলিও ঠিক এই আখ্যাই দিয়েছিল তার প্রস্থানকে) তাতে তার ভূতপূর্ব্ব শুভানুধ্যায়ীরা যে খুসী হয়নি, তা' সে খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল। সেবাব্রতী কর্ম্মী প্রদীপ আজ বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিং-এর ছাপ নিয়ে "সাহেব" হয়ে ফিরছে, এটা কি সকলে পছন্দ করবে? যারা তার সহকর্ম্মী ছিল তারা কি একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করবে না?

কিন্তু সকলেই নিশ্চয় তাকে অবহেলা করবে না! খবরের কাগজে সে পড়েছে দেশনেতৃবৃন্দের আবেদন—বিরাট কাজ পড়ে আছে প্রত্যেক ভারত-বাসীর সম্মুখে, তোমরা এসে যোগদান করো এই মহান্ অভিযানে, গড়ে তোল নতুন ভারত, এনে দাও তাকে বিশ্বের দরবারে প্রথম শ্রেণীতে। এই চার বছরে যেটুকু অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে, তা' সে উৎসর্গ করতে চায় দেশের কাজে। নিজের খাওয়া-পরার মত এবং মাসে মাসে কিছু বই কেনবার মত টাকা পেলেই সে হবে সন্তুষ্ট।

আচ্ছা, বন্দনা তাকে গ্রহণ করবে কি ভাবে? ইচ্ছা করেই সে বন্দনার কাছে কোন উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লেখেনি তার জীবনের একটা অধ্যায়, যা'

এমিলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বন্দনার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সেটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে সে কি করে বন্দনাকে জানায় তার একাকীত্ব, প্রার্থনা করে তার সহানুভূতি, তার স্নেহ-ভালবাসা?

শুধু এমিলির কথা নয়, ছবির কথাও জানাতে হবে বন্দনাকে। কোন ঘটনাই বাদ দেওয়া চলবে না, সেই মোমিনপুরে ছবির সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকে সুরু ক'রে ব্রাইটন-এর উপসংহার পর্য্যন্ত।

আচ্ছা, এ-সব বন্দনাকে জানিয়ে কি লাভ? বিশেষ ক'রে এমিলির কাহিনী? কুহেলিকার অন্তরালে থাকুক না পড়ে তার বিগতজীবন! এমিলি এ পৃথিবীর বুক থেকে চলে গেছে চিরদিনের জন্য, আর ছবিও মুছে গেছে তার জীবনের পটভূমিকা থেকে! কি প্রয়োজন জের টেনে আনবার এমন দুটো অধ্যায়ের, যার ছায়া বন্দনাকে হয়ত কোন দিনই স্পর্শ করবে না?

কিন্তু এ কি Machiavellian নীতি অনুসরণ করবার কথা ভাবছে সে? অবশেষে সে, প্রদীপ, ব্যবহারিক জগতের লাভলোকসানের মাপকাঠিতে স্থির করবে তার কর্ম্মপদ্ধতি? না, না, যত ক্ষতিই হোক্ না কেন, প্রতারণার আশ্রয় সে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, প্রতারণা বই কি! যখন তুমি জান যে অপর পক্ষ তোমাকে বিশ্বাস করছে, তোমাকে গ্রহণ করছে নির্ব্বিচারে, তখন তার কাছে তোমার জীবনের অত্যন্ত নিবিড় অধ্যায়গুলো গোপন করে যাওয়া প্রতারণা ছাড়া আর কি?

প্রদীপ অনেক ভাবল, কিন্তু কি করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারল না।

বোম্বাই থেকে প্রদীপ সোজা চলে এল কলকাতায়, গায়ত্রীর কাছে। গায়ত্রীই তাকে লিখেছিল যে, কলকাতায় যত দিন তার অন্য ব্যবস্থা না হয়, সে যেন তার কাছেই থাকে। তার ফ্ল্যাটটা বেশ বড়, প্রদীপকে রাখতে কোনই অসুবিধা হবে না। কৃতজ্ঞচিত্তে প্রদীপ গ্রহণ করল গায়ত্রীর আমন্ত্রণ।

সে অবাক্ হয়ে দেখল, এই কয়েক বছরের মধ্যে মিঃ কর কি ভয়ানকভাবে বদলে গেছেন। প্রথমতঃ, তাঁর বয়স যেন এগিয়ে গেছে অন্ততঃ দশ বা পনর

বছর। চুলগুলো প্রায় সাদা এসেছে, নেই সেই আগেকার গম্ভীর ঔদ্ধত্য। দ্বিতীয়তঃ, কথা বলেন তিনি খুবই কম, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত, যখন কাজ থাকে না তখনও অন্যমনস্ক। এর আগেও প্রদীপ তাঁর কাজে ব্যস্ততার পরিচয় পেয়েছে, কিন্তু তখন তার মধ্যে প্রাণ ছিল, এখন কাজের চাপ যেন তাঁকে জোর করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আরও অবাক্ হল মিঃ করের বেশভূষা, চালচলনের পরিবর্ত্তন দেখে। খদ্দরের বুশসার্ট বা গলাবন্ধ কোট ছাড়া অন্য কোন পোষাক তিনি পরেন না, পাইপ খাওয়া এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছেন বললেই চলে, সন্ধ্যাকালীন নিয়মিত পানীয়ও খান চুপি চুপি, যেন কেউ জানতে না পায়। তাঁর ড্রইংরুমের পর্দাগুলো খাদি প্রতিষ্ঠানের আমদানী, এবং ম্যাণ্টেলপিস্‌এ আছে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি, যাতে ঘরে ঢুকলেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেদিকে।

প্রদীপ একটা প্রশ্ন করবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, দিদি, নতুন যুগ এসেছে, তাই নতুন বেষ্টনীর সৃষ্টি করার প্রয়াসটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সার জন্ হার্বার্ট এবং মিঃ কেসির স্বাক্ষরিত ফটোগুলো গেল কোথায়? তোমার সেই ক্রেট-এর ঘরে নয় ত?

ক্ষণিকের জন্য গায়ত্রীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। বলল, সেগুলো বাক্সে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে।

প্রদীপ আরও লক্ষ্য করল, মিঃ কর প্রতি রবিবার ভোর আটটার সময় কোথায় বেরিয়ে যান, বাড়ীতে ফেরেন দশটা, এগারোটা বা বারোটায়।

প্রদীপের প্রশ্নের উত্তরে গায়ত্রী বলল, উনি যান ওঁর মন্ত্রীর বাড়ীতে।

—কেন? রবিবারে আবার কি কাজ? শনিবারেও ফেরেন সেই সন্ধ্যা সাতটায়!

—উনি যে এখন সেক্রেটারী হয়েছেন। অনেক জরুরী কাজ থাকে।

—প্রত্যেক রবিবারে?—সবিস্ময়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—সে আমি কি করে জানব, প্রদীপ! ওঁকে যেতে হয়।

প্রদীপ তবু নাছোড়বান্দা। প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন ফাইল নিয়ে যেতে ত দেখি না!

—আঃ, প্রদীপ, কেবল প্রশ্ন! সব সময় ফাইলের প্রয়োজন হয় না।

—দিদি, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।

—কেন?

—কেন তা' তুমি নিজেই জানো। তুমি কেন মিঃ করকে ব'লো না যে কোন লাভ নেই এই প্রকার মূর্ত্তিপূজায়?—আমি নিজেই হয় ত বলতাম, কিন্তু আমি যে তোমাদের অতিথি, অনধিকার চর্চ্চা আমার শোভা পাবে না।

—আমাকে যে তুমি বলছ সেটা বুঝি অনধিকার চর্চ্চা নয়?

—তোমাকে মিসেস কর হিসেবে বলছি না, বলছি আমার দিদি হিসেবে।

—শোন,প্রদীপ, তুমি সদ্য-সদ্য বিলেত থেকে এসেছ, তাই তোমার কাছে এসব অদ্ভুত ঠেকছে। কিছুদিন এখানে থাকলে এ তোমার গা-সওয়া হয়ে যাবে।

—ঐ ভয়ই ত আমি করছি, দিদি! স্বাধীন ভারতের রাজকর্ম্মচারীদের গতিবিধির নমুনা দেখে এখন চাঞ্চল্য জাগছে, কিন্তু দু'মাস পরে আমারও হয়ত মনে হবে, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, শোভনও।

—প্রদীপ, তুমি এখনও আগেরই মত ভাবালু রয়েছ। এভাবে পৃথিবীতে বাস করা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম, এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।

—হয়ত তোমার কথাই ঠিক, দিদি! বিলেতের ধোপটা এখনও গায়ে লেগে রয়েছে কি না, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সেটা কেটে যেতে খুব বেশী দেরী হবে না!

প্রদীপ ভেবেছিল গায়ত্রীর সঙ্গে এমিলির কাহিনী আলোচনা করবে, ছবি সম্পর্কিত যে সব কথা চিঠিতে বলা হয়নি তা'-ও বলবে। কিন্তু মিঃ করকে উপলক্ষ্য ক'রে তার এবং গায়ত্রীর মধ্যে যে বাদানুবাদ হ'ল তাতে তার কেবলই মনে হতে লাগল যে, গায়ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহানুভূতি সে পাবে না।

অশান্ত মন নিয়ে সে গেল বন্দনার কাছে।

বাড়ীতে বন্দনা ছিল একা। কম্পমান বক্ষে সে অপেক্ষা করছিল প্রদীপের আগমন। গায়ত্রীর বাড়ী থেকে টেলিফোন করে প্রদীপ তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে সে আসছে।

—এই চার বছরে তোমার চেহারার এতটুকু পরিবর্ত্তন হয়নি ত' বন্দনা! প্রদীপ বলল।

বন্দনা সত্যি কাঁপছিল, কিন্তু সে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করল প্রদীপের এই সহজ সম্ভাষণে। নতমুখে, অথচ একটু হেসে, জবাব দিল, তুমি খুব পরিবর্ত্তন দেখবে আশা করেছিলে বুঝি?

—না, তবে ভেবেছিলাম, স্বাধীন ভারতে অনেকের মত তোমার চেহারাও ঠিক আগের মত থাকবে না। যাক সে কথা, তোমার বাবা, দাদা, ওরা কোথায়?

—বাড়ীতে নেই। তোমাকে টেলিফোনে বলেছিলাম, ভুলে গেছ বুঝি?

অপ্রস্তুতভাবে প্রদীপ জবাব দিল, এই দেখ, আমার যে কি হয়েছে, সব কথাই ভুলে যেতে সুরু করেছি! তোমাকে যে ভুলিনি, সেটাই আশ্চর্য্য!

তারপর একটু গম্ভীরভাবে বলল, শোন, বন্দনা, আমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে, অনেক কথা বলবার আছে। তোমার বাড়ীতে যদিও এখন কেউ নেই, তবু সুরু করতে ভরসা পাই না, কখন তোমার দাদা অথবা বাবা এসে পড়েন।

—খুবই জরুরী কথা কি? উদ্বিগ্নভাবে বন্দনা প্রশ্ন করল।

—জরুরী বই কি, তবে এমন জরুরী নয় যে দু'দিন অপেক্ষা করা চলে না। ঘণ্টা দুই দরকার হবে, তুমি ভেবে-চিন্তে ব'লো, কোন্ দিন এবং কোথায় এই সময়টুকু পেতে পারি।

—তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছ, প্রদীপ! এমন কি কথা আছে যা' বলতে দু'ঘণ্টা লাগবে?

—সে রহস্য এখন ভাঙতে পারব না। যথাসময়ে এবং যথাস্থানে শুনতে পাবে।

এবার প্রদীপ অন্য কথার অবতারণা করল। বলল, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক পেয়ালা চা' দিতে পার?

লজ্জিতভাবে বন্দনা বলল, দেখ, আমারও কেমন ভুল! চায়ের জল বসিয়ে রেখে এসেছি, তোমার হেঁয়ালি শুনতে গিয়ে খেয়ালই ছিল না!

সে ছুটল চা' তৈরী করতে।

মিঃ করের নির্দ্দেশমত সে তার আবেদনপত্র পাঠাল সরকারী এবং বেসরকারী তিন-চারটি দপ্তরে—চাকুরী প্রার্থনা ক'রে। মিঃ কর আশ্বাস দিলেন যে তিনিও চেষ্টা করবেন যাতে শীগগিরই একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। বললেন, তোমার যে ডিপ্লোমা এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাতে বেশ মোটা মাইনেই পাবে বলে মনে হয়।

প্রদীপ বলল যে সে খুব মোটা মাইনের প্রার্থী নয়। সে চায় এমন কাজ যেখানে তার উপরওয়ালা তার ঘাড়ে ছেড়ে দেবেন অনেকখানি দায়িত্ব। সে নিজে হাতে গড়ে তুলতে চায় কোন একটা প্রতিষ্ঠান—একা নয়, সকলের সাহায্য নিয়ে।

এর কয়েক দিন পরে প্রদীপ গেল জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ওখানে। গায়ত্রীর কাছ থেকেই সে শুনেছিল জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সময়ের মূল্যের কথা—তাই বুদ্ধিমানের মত আগে থেকেই তাঁর সেক্রেটারীর মারফৎ অ্যাপয়ণ্ট্মেণ্ট ক'রে নিয়েছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কামরায় তার ডাক পড়ল। পূর্ব্ব অভ্যাসমত সে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু খুসী হলেন। তাকে বসতে বললেন, কুশল-প্রশ্ন করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, বিলেতে তার শিক্ষার কথা এবং এখন তার কি প্ল্যান্।

সংক্ষেপে প্রদীপ জানাল কি কি বিষয়ে সে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করে এসেছে। আরও জানাল যে, মিঃ করের নির্দ্দেশানুসারে সে কয়েক জায়গায় পাঠিয়েছে তার আবেদনপত্র।

—মিঃ কর ? কোন্ মিঃ কর ?—জ্যোতির্ম্ময় বাবু চেয়ারে উঠে বসলেন।

প্রদীপ মিঃ করের পরিচয় দিল।

—সিভিলিয়ান কর ? তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল কি করে ?

প্রদীপ বলল যে, বিলেত যাবার অনেক আগেই তার পরিচয় হয়েছিল মিঃ কর এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।—মিসেস কর যে তাকে অনেকখানি স্নেহ করেন, তার আভাসও সে দিল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, প্রদীপ, তুমি কি ক'রে এঁদের দলে ভিড়লে, যখন আমরা এঁদের সঙ্গে করছিলাম যুদ্ধ ! এ যে রীতিমত চক্রান্ত !

প্রদীপ হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। বলল, আমি চক্রান্ত করিনি, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় ! সিভিলিয়ান ব'লে ওঁরা যে অপাংক্তেয়, এ নির্দ্দেশ আমাদের কখনও দেওয়া হয়নি। তাছাড়া ওঁদের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা আমি করিনি, করবার প্রয়োজন হয়নি। মানুষ হিসেবে ওঁদের সঙ্গে মিশেছি।

বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় বাবু বললেন, মানুষ ? তুমি সুপ্রকাশ করকে মানুষের পর্য্যায়ে ফেল ? মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ যত এই উচ্ছিষ্টভোজী সিভিলিয়ানের দল !

প্রদীপ ত স্তম্ভিত ! যে কথা জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মুখ দিয়ে আজ হঠাৎ বেরিয়ে এল তা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, প্রদীপ জোর করে বলতে পারে না, বিশেষ ক'রে এই কয় দিনে মিঃ করকে সাম্নাসামনি পর্য্যবেক্ষণ করার পর। কিন্তু তার কেবলই মনে হ'তে লাগল, কি হতভাগ্য এই সব রাজকর্ম্মচারীর দল। প্রাণপণে তারা প্রভুর সেবা করছে, কিন্তু যাদের সেবা করছে তারা খাতির করে, সময় সময় ভয়ও করে বা, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না। হায়, মিঃ সুপ্রকাশ কর !

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলে চললেন, কারও ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা আমার স্বভাব নয়, তবে তুমি আমার ছেলের মত, এবং এককালে ছিলে কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী, তাই তোমাকে বলছি, এঁদের সংস্রব এড়িয়ে

চলতে চেষ্টা করো। এঁরা হচ্ছেন মিউজিয়ম পীস। বৃটিশ রাজত্বে বিলিতি প্রভুরা এঁদের দিয়ে করিয়ে নিতেন কতকগুলো অপ্রীতিকর কাজ। যখনই আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চেঁচিয়ে বলতাম বৃটিশ কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করছে, তখন সরকার সাজতেন সাধু, ভারতীয় সিভিলিয়ানদের দেখিয়ে বলতেন, এঁরা ত তোমাদেরই আপনজন, এঁরা যা করছেন তাকেই তোমরা অত্যাচার বল? আর বিদেশেও চলত অনুরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডা, অন্যায় বিদ্রোহ করছে কয়েক জন মুষ্টিমেয় লোক, দেশের শাসনভার ত দেশীয় কর্ম্মচারীদেরই হাতে!

—অথচ আপনারা এঁদেরই সাহায্য নিয়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালাচ্ছেন?

—সেটা হচ্ছে ট্যাক্‌টিক্স, প্রদীপ। আমরা অরাজকতার সৃষ্টি করতে চাইনে। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এক্ষুণি সব ওলট-পালট করা চলবে না, তাই এঁদের আমরা গ্রহণ করেছি। যতদিন আমাদের আদর্শ, আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করবেন, আমরা এঁদের ভাতে মারব না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, এঁদের নেই!

—আপনি বড্ড sweeping কথা বলছেন। এর ব্যতিক্রম কি কখনও আপনার চোখে পড়েনি?

জ্যোতির্ম্ময় বাবু একটু ভাবলেন, তার পর বললেন, হ্যাঁ, চোখে পড়েছে বই কি! কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই—ব্যতিক্রমকে অবলম্বন ক'রে সাধারণ সংজ্ঞা টানা যায় না। তা ছাড়া, আবার বলছি, তোমার মিঃ কর এই ব্যতিক্রম নন।

এর জবাবে প্রদীপ কি বলবে ভেবে পেল না।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বললেন, আমার মতামত আমি তোমার ওপর জোর ক'রে চাপাতে চাই না, কিন্তু এখনও আমার উপদেশ, তুমি মিঃ করের সংসর্গ বর্জ্জন করে চলো।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পাশের টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুললেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, এখন তুমি এসো, দিল্লী থেকে একটা ট্রাঙ্ক কল এসেছে, অত্যন্ত জরুরী এবং গোপনীয় কল এটা।

প্রদীপ নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

বারো

প্রদীপ বেরিয়ে এল অনেকটা মুহ্যমানের মত। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সঙ্গে কথোপকথন তাকে ক'রে দিয়েছিল বিপর্য্যস্ত, বিক্ষিপ্ত! যে সিভিল সার্ভিসকে সে এত দিন জেনে এসেছে ইস্পাতের বর্ম্মরূপে, এই হয়েছে তার পরিণতি! আর এঁদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কি উচ্চ ধারণা! তার ইচ্ছা করছিল, এখুনি যেয়ে মিঃ করকে সব কথা বলে, এবং তাঁকে অনুরোধ করে যেন এই শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁর আত্মসম্মান বিসর্জ্জন না দেন, তাঁর স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

অন্যমনস্কভাবে সে চলতে সুরু করেছিল ভবানীপুরের ফুটপাত ধরে। চমকে উঠল যখন কে একজন তার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, এই যে, প্রদীপ বাবু না?

প্রদীপ দেখল, প্রশ্নকর্ত্তা আর কেউ নয়, এ-আর-পির সেই সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

সন্তোষ বলল, কত দিন পরে দেখা, প্রদীপ বাবু! শুনলাম আপনি নাকি বিলেত গিয়েছিলেন? কবে ফিরলেন? আমাদের ত আর সে সৌভাগ্য হ'ল না!

প্রদীপ মোটেই খুসী হল না সন্তোষের এই গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায়। নিছক ভদ্রতার খাতিরে সে তার প্রশ্নগুলোর জবাব দিল সংক্ষেপে।

সন্তোষ কিন্তু তাতে এতটুকুও অপ্রস্তুত বোধ করল না। বলে চলল, আপনি এখন মস্ত বড়লোক। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়ত লজ্জাবোধ করেন। আমরা ত আপনাকে ভুলতে পারিনে! সেই মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এর কথা মনে আছে ত?

প্রদীপ এবার সত্যি বিরক্তি বোধ করল! কি মতলব সন্তোষের? হঠাৎ মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এর পুনরাবৃত্তি কেন?

কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল যে, সন্তোষ মোমিনপুরের উল্লেখ করেছে পরিচয়ের সুতো টেনে আনতে, কোন গূঢ় উদ্দেশ্য তার নেই।

—চাকুরী পেয়েছেন কি ?…সন্তোষ প্রশ্ন করল।

—না, এখনও পাইনি। এই ত সবে মাত্র দেশে ফিরেছি।

—তা মুরুব্বি যদি যোগাড় করতে পারেন তাহলে মোটা চাঁকুরী পেতে বিশেষ দেরী হবে না। আপনার অনেক contact আছে, connexions আছে, আপনার কথা আলাদা !

—কি বলছেন আপনি সন্তোষ বাবু ?

—নতুন বিলেত থেকে এসেছেন কি না, তাই দেশের হাওয়াটা এখনও রপ্ত হয়নি। দেখুন, অপেক্ষা করুন, অনেক কিছু শিখবেন।

—আপনার লজ্জা করে না এইভাবে দেশের নেতাদের নিন্দা করতে ? বেশ একটু ভৎর্সনাসূচক স্বরেই প্রদীপ বলল।

সন্তোষ এতটুকু ভড়কাল না। বলল, সত্যি কথা বলতে লজ্জা করবে কেন প্রদীপ বাবু ? দেশের নেতাদের কথা বলছেন, ওরা আছেন বড় বড় পলিসি নিয়ে ব্যস্ত, সাধারণের অভিযোগ ওঁদের কানে সব সময় পৌঁছয় না, পৌঁছলেও আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রাণপণে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন, এসব হচ্ছে have-notদের নিষ্ফল আস্ফালন। আনন্দের বিষয় এই যে, অমাত্য পরিষদবর্গের এই প্রচেষ্টা সফলও হয়।

—আনন্দের বিষয় বলছেন কেন ? বিস্মিতভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—সোজা কথা বুঝছেন না ? আমরা ত এই-ই চাই—আমরা চাই যে দেশে অসন্তোষ আরও বাড়ুক, যাতে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের মাঝ থেকে জ্বলে নতুন বিদ্রোহের বহ্নি। আমরা তখন তৈরী করব নতুন সমাজ, দূর করে দেব এই সব ক্যাপিট্যালিষ্টবৎসল স্বার্থান্বেষীদের।

—আপনারা ? আপনারা কে ?

—ওঃ, আপনাকে বলা হয়নি বুঝি ? আমি যে মোমিনপুর এলাকার এক বামপন্থী পার্টির সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ। আমাদের সঙ্গে ভাব রাখবেন প্রদীপ বাবু ! এক কালে আমরা আপনার কাজে আসতে পারি।

সন্তোষের এই গর্ব্বোদ্ধত কথা শুনে প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছিল, কিন্তু

তার কৌতূহল বিরক্তিকে অতিক্রম ক'রে গেল। দেখাই যাক না, লোকটা আরো কি বলতে চায়। চার বছর সে দেশছাড়া, দেশের নতুন রূপ সে দেখতে পাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। এ অভিজ্ঞতা উপেক্ষনীয় নয়।

প্রদীপ বলল, আপনাদের পার্টি সম্বন্ধে একটু খুলে বলুন ত?

—আপনি পঞ্চমবাহিনীর লোক নন আশা করি। আর হলেই বা কি, পঞ্চমবাহিনীর অনেক লোককেই আমরা দেখেছি। হ্যাঁ, আমাদের পার্টির নেতার নাম আপনি খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন। আমরা এখন কলকাতায় এবং তার উপকণ্ঠে জনমত সৃষ্টি করছি বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা পাবার পরও শাসকদের শোষণনীতি যে এতটুকু বদলায়নি, সেটা প্রমাণ করাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। তাই আমরা খুঁজে বেড়াই ছিদ্র, কোথায় সরকারের কি গলদ। তা উপস্থাপিত করি আমাদের সাপ্তাহিক সান্ধ্য মজলিস-এ। আপনি আসবেন আমাদের মোমিনপুরের বৈঠকে? আজই একটা মিটিং আছে।

প্রদীপকে একটু ইতস্তত: করতে দেখে সন্তোষ বলল, আপনার ভয় নেই, আপনাকে এখ্খুনি আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে বলছি না। তবে আপনারা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক, আপনারা আসুন, দেখুন, দেশের লোক কি বলছে বা ভাবছে।

হাতে উপস্থিত কোন কাজ নেই, প্রদীপ রাজী হ'ল সন্তোষের সঙ্গে যেতে।

প্রদীপ সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ করল, যখন সন্তোষ তাকে নিয়ে চলল মোমিনপুরের সেই ফ্ল্যাট-এর পথে।

প্রশ্ন করল, কোথায় চলেছেন, সন্তোষ বাবু? আমি আপনাদের পার্টি-মিটিং-এ যেতে চাই, আর কোথাও নয়।

সন্তোষ হাসল। বলল, ঠিক জায়গায়ই যাচ্ছি, প্রদীপ বাবু! দেশের হাওয়া বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মপদ্ধতিও বদলে গেছে। আপনার

সেই পরিচিত জায়গায়ই যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে আমরা সীরিয়স কাজ করি, মেয়েমানুষ নিয়ে খেলা করার অবসর কোথায়? তা ছাড়া, দেখতে পাচ্ছেন না আমার পরিবর্ত্তন? ছিলাম এ-আর-পি'র একজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্তা, আর এখন হয়েছি বামপন্থী পার্টির স্থানীয় সম্পাদক।

পরিবর্ত্তনের মত পরিবর্ত্তনই বটে! প্রদীপের মনে জাগল সেই অনেক বছর অতীতের স্মৃতি, যখন সে সন্তোষের প্ররোচনায় এসেছিল ছবির সকাশে। সত্যি, বড় অনভিজ্ঞ সে।

দু'জনে এসে উপস্থিত হল সেই আগেকার কামরায়। এবার দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নেই, তার পরিবর্ত্তে আছে অন্য প্রতিকৃতি। আসবাব-পত্রের মধ্যে আছে একটি টেবিল এবং একটি হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার। তা' ছাড়া সামনে বিস্তৃত রয়েছে ময়লা একটি সতরঞ্চি। সেখানে বসে আছে জনকয়েক কুলিশ্রেণীর লোক, দু'-একজন কলেজের ছাত্র এবং আরও কয়েক জন ছেলেমেয়ে যাদের কোন বিশেষ পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

সন্তোষ বলল, চেয়ারের অভাব, প্রদীপ বাবু! আপনাকে সতরঞ্চির উপর বসতে হবে।

প্রদীপ দ্বিরুক্তি না করে আসন গেড়ে বসল।

সন্তোষ সুরু করল সভার কাজ।

বলল, ভাই সব, বোনেরা, এক সপ্তাহ পরে আমরা মিলিত হয়েছি আমাদের এই সভায়। আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের উদ্দেশ্য কি। যাঁরা নবাগত, যাঁরা আজ প্রথম এই সভায় এসেছেন (এর মধ্যে আমার এই বন্ধুও আছেন) তাঁদের অবগতির জন্য বলছি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ত্তমান সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং হঠকারিতার প্রতিবাদ করা। কিন্তু শুধু বক্তৃতা দিলে চলবে না, সরকারের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে অসাড় করাই হবে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি। এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এখন থেকেই।

মোমিনপুরের চটকলে পুঁজিবাদী মালিকেরা শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করেছেন, তার প্রতিরোধ করব আমরা—এটাই হবে আমাদের প্রথম অভিযান!

শ্রোতাদের মধ্যে দু'-একজন বলে উঠল, ধর্ম্মঘট, আমরা ধর্ম্মঘট করতে চাই!

সন্তোষ বলল, না, ধর্ম্মঘট করবার সময় এখনও আসেনি। আমাদের ইউনিয়নের বাইরে এখনও অনেক শ্রমিক আছে, যারা সম্পূর্ণভাবে মালিকদের করতলগত। এখনই ধর্ম্মঘট সুরু করলে শেষ পর্য্যন্ত তা' আপনারা চালাতে পারবেন না। আমি বলব, আপনারা অন্য পন্থা অবলম্বন করুন। কাজে বিরতি দিন, যে কাজ এক ঘণ্টায় করা সম্ভব তা' করুন দু'ঘণ্টায়, কল খারাপ হয়ে গেলে তা' সারাতে অবহেলা করুন। দেখবেন, এই উপায়ে আপনারা মালিককে করে তুলবেন উদ্ব্যাস্ত, এবং তিনি বাধ্য হবেন আপনাদের কাউকে বরখাস্ত করতে। এখন এই অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন আপনারা সকলে। সরকার হয়ত মালিকের পক্ষ সমর্থন করবে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ডাকবে, তখন সুযোগ আসবে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ম্মঘট করবার। শ্রমিকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করলে কোন শ্রমিকই চুপ ক'রে বসে থাকতে পারবে না—সে আপনাদের ইউনিয়নের সভ্য হোক বা বাইরের লোক হোক। বলুন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

উপস্থিত যারা ছিল সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

এর পর সন্তোষ বলল, সামনের শনিবার এখানে আবার মিটিং হবে। আমরা তখন শুনতে চাইব যে-পথ আজ আপনাদের বাৎলে দিলাম তাতে আপনারা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। আবার বলুন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

প্রতিধ্বনি উঠল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

সভাভঙ্গের পর সন্তোষ প্রদীপকে প্রশ্ন করল, কি মনে হয় আপনার প্রদীপ বাবু? এইভাবে ভেতর থেকে sabotage করাই কি সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নয়? ১৯৪২ সালেও ত এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছিল।

প্রদীপ বলল, কিন্তু ১৯৪২ সালের সঙ্গে এখনকার তুলনা করছেন, সন্তোষ বাবু? তখন আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল বিদেশী শাসক, আর এখন আমাদেরই নমস্য, আমাদেরই প্রতিনিধিরা হয়েছেন কর্ণধার। আপনাদের অভাব-অভিযোগ যদি কিছু থাকে, তাহ'লে তা' উপস্থাপিত করুন এঁদের সম্মুখে, এঁরা নিশ্চয়ই শুনবেন আপনাদের কথা।

—আপনি পাগল হয়েছেন, প্রদীপ বাবু! ওঁরা শুনবেন না। শুনতে চাইলেও ওঁদের শুনতে দেবে না পার্শ্বচরবৃন্দ। এ অবস্থায় direct action ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই!

—আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, সন্তোষ বাবু! আপনারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন সে যে বিপ্লবের, অরাজকতার সৃষ্টি করবে। আমরা এখন চাই শান্তি, বিশ্রাম। যুদ্ধে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্লান্ত, মুহ্যমান দেশকে আগে বাঁচিয়ে তুলতে হবে ত! আপনাদের ছোটখাট অভিযোগ দূর করবার জন্য অন্য পথ গ্রহণ করুন।

সন্তোষ হাসল। বলল, আপনার এখনও বুর্জ্জোয়া মেণ্টালিটি রয়ে গেছে প্রদীপবাবু। আপনি যাকে ছোটখাট অভিযোগ বলছেন, তা আমাদের কাছে অতি বৃহৎ। আর এসব অভিযোগের নিষ্পত্তি আবেদন ক'রে, দরবার ক'রে হবে না, এর নিষ্পত্তি হবে দলবদ্ধ সংগ্রামে।

—কিন্তু তাতে যে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে, উন্নতির গতি প্রতিহত হবে, তা ছাড়া অনেক নির্দ্দোষ নিরীহ লোক নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়বে।

—ঐ ত আমরা চাই, প্রদীপ বাবু! ছুটকোছাটকা সংগ্রামকে অবলম্বন ক'রে আমরা একদিন চালাব বৃহত্তর সংগ্রাম। যারা এত দিন আমাদের শোষণ করে এসেছে, তাদের স্বীকার করতে হবে পরাজয়। আপনার ভয় নেই প্রদীপ বাবু! আমাদের বর্ত্তমান প্রভুদের মতিগতি যদি বদলায়, তাহলে তাঁদের। আমরা ফেলে দেব না, যেমন তাঁরা ফেলে দেননি, বৃটিশ যুগের সিভিলিয়ানদের।

মোমিনপুরের মিটিং থেকে প্রদীপ ফিরল আরও বিহ্বল হয়ে। এ কোন্

পথে চলেছে দেশ? কেন? দেশের যাঁরা নেতা, তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না যে এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষের কারণগুলো গোড়া থেকে উপড়ে না ফেললে তার বিষাক্ত শেকড় ছড়িয়ে পড়বে সমাজের প্রতি কোণে, দেশের মাটির প্রতি অণু-পরমাণুতে?

বাড়ীতে ফিরেই মিঃ করের সঙ্গে দেখা।

—অনেক রাত হ'ল যে প্রদীপ? কোন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

ডিনারে বসে প্রদীপ প্রশ্ন করল, আচ্ছা, মিঃ কর, আপনার কি ধারণা, আপনাদের যারা বর্ত্তমান প্রভু, যাদের বিরুদ্ধে আপনারা এত দিন চালিয়েছেন অভিযান, তাঁরা মনে মনে আপনাদের শ্রদ্ধা করেন?

—একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, প্রদীপ?—গায়ত্রী বলল।

—জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যে যে, দু'-চারজনের সঙ্গে কথা বলে আমার প্রতীতি হয়েছে, এঁরা আপনাদের সহ্য করেন মাত্র, মনে মনে তাঁদের রয়েছে পুঞ্জীভূত রোষ, অশ্রদ্ধা!

মলিন হাসি হেসে মিঃ কর জবাব দিলেন, এ আর নতুন কথা কি বলছ, প্রদীপ? এ ত আমি অনেক আগে থেকেই জানি!—এদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তাঁরা তাঁদের অনুভূতি গোপন ক'রে রাখেন, যাঁরা ততটা বুদ্ধিমান নন তাঁরা প্রকাশ ক'রে ফেলেন।—এর জন্য অবশ্য দায়ী আমরা, আমাদের সাহস নেই প্রতিবাদ করি। অপমান আমরা হজম করে যাই নির্ব্বিবাদে।

—কিন্তু কেন করেন, মিঃ কর? এসব জেনে-শুনেও আপনাদের মনে বিদ্রোহ জাগে না?

—না, বিদ্রোহ জাগে না। জাগলেও তার বিপক্ষে আমরা উপস্থাপিত করি নানাপ্রকার যুক্তি। সমাজে যে প্রতিষ্ঠাটুকু আছে, আমাদের যারা অধীন, তাদের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করবার যে সুযোগটুকু আমরা পাই, তা আঁকড়ে

ধরে থাকতে চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব।—না, প্রদীপ, তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু ব'লো না, আমি নিজেই স্বীকার করছি, আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ।

বলতে বলতে মিঃ করের গলাটা যেন একটু ভারী হয়ে এল। প্রদীপ লক্ষ্য করল, গায়ত্রীও আঁচলের খুঁট দিয়ে তার চোখটা মুছল।

তেরো

সন্তোষের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হ'ল। মাসখানেকের মধ্যেই প্রদীপ একটা চাকুরী পেল—সরকারী দপ্তরে। মিঃ করই এই সুখবরটা দিলেন সর্ব্বাগ্রে।

প্রদীপ মিঃ করকে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। আর সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে ছায়া তার মনে ঘনিয়ে আসছিল তা-ও হালকা হয়ে গেল অনেকখানি। সরকার তাহলে গুণের আদর করতে জানে!

তার বিগত জীবনের অধ্যায় নিয়ে বন্দনার সঙ্গে পরিকল্পিত আলোচনার সুযোগ সে এত দিন পায়নি, নিজেই ইচ্ছা করে সময় প্রার্থনা করেনি। এখন স্থির করল, বন্দনাকে সব কথা বলবে।

চাকুরীতে যোগ দিয়েই সে উঠে গেল একটি ফ্ল্যাট-এ। গায়ত্রী এবং মিঃ কর দু'জনেই তাকে বলেছিলেন যে, সে নিঃসঙ্কোচে আরও কিছুকাল থেকে যেতে পারে, কিন্তু প্রদীপ রাজী হল না।

টেলিফোন ক'রে সে বন্দনাকে জানাল যে, যে জরুরী কথা বলবার জন্য তার কাছে সময় ভিক্ষা করেছিল তা সে বলতে চায়, আর দেরী না ক'রে। বন্দনা একবার তার ফ্ল্যাট-এ আসতে পারবে কি?

যথাসময়ে বন্দনা এল।

দু'-একটি অবান্তর বাক্য-বিনিময়ের পর প্রদীপ বলল, অত্যন্ত গুরুতর কয়েকটা কথা জানাবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব পরিষ্কার ক'রে বলতে, যদি তোমার কোন প্রশ্ন থাকে, উত্থাপন করতে দ্বিধা করো না।

—তুমি ব'লে যাও, প্রদীপ!

—ছবির কথা বলতে চাচ্ছি। ব'লে প্রদীপ সুরু করল।

বন্দনা বাধা দিয়ে বলল, কোন প্রয়োজন নেই, প্রদীপ! গায়ত্রীদি'র কাছে তোমার লেখা চিঠি আমি দেখেছি। আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, আমার কাছে জবাবদিহি করবার কোনই প্রয়োজন নেই।

প্রদীপ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। গায়ত্রী যে তার চিঠি বন্দনাকে দেখিয়েছে এই সংবাদের জন্ম সে প্রস্তুত ছিল না, গায়ত্রী এ সম্বন্ধে তাকে কিছুই বলেনি।

তারপর বলল, চিঠিতে সব কথা খুলে বলা সম্ভব হয়নি, বন্দনা! আরও বলবার আছে।

—বলো।

প্রদীপ তখন বলল, কেন সে প্রথমে গিয়েছিল মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এ। তারপর জানাল নবকিশোরের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তার ইতিবৃত্ত, অবশেষে তাকে বলল মোমিনপুরে নবকিশোর ছবির সঙ্গে তার শেষ সংঘাতের কাহিনী।

চুপ করে বন্দনা শুনল, তারপর বলল, তুমি কোন অন্যায় করোনি, প্রদীপ!

—কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। ছবির সঙ্গে বিলেতে ব্রাইটন-এ দেখা হয়েছিল।

—আমি সেকথাও জানি। গায়ত্রীদি'র কাছে লেখা তোমার চিঠিতে তার উল্লেখ ছিল।

—কিন্তু কি হয়েছিল তা আমি লিখিনি, বন্দনা! লিখতে ভরসা পাইনি। আজ তোমাকে সেই কথাই বলব।

ধীরে ধীরে সে বর্ণনা করল ব্রাটইন-এর সমুদ্রতীরে ছবির সঙ্গে তার মাঝে মাঝে দেখা হওয়ার কথা, তারপর সে বলল, কি ভাবে ছবি এসেছিল তার বোর্ডিং হাউস-এ, কেমন করে সে প্রলুব্ধ হয়েছিল ছবির যৌবনে এবং পরিশেষে ছবি তাকে করেছিল প্রত্যাখ্যান।

বন্দনা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি যদিও এই শেষ অধ্যায়ের অনুমোদন করছি না, করতে পারি না, তবু আমি তোমার মনের গতি বুঝবার চেষ্টা করছি। আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে এই জাতীয় পরিস্থিতির কথা বই-এ পড়েছি। তুমি যখন বলছ ছবির সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্ক ধুয়ে-মুছে গেছে এবং তুমি তোমার নিজেকে ফিরে পেয়েছ, তখন আমি তোমার জীবনের এই অধ্যায় ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি, প্রদীপ!

ঘর অন্ধকার হয়ে এল। প্রদীপ উসখুস করতে লাগল। এবার তাকে করতে হবে সব চেয়ে কঠিন স্বীকৃতি, বলতে হবে এমিলির কথা!

কিন্তু বলবে কি সে? ছবির কাহিনী বন্দনা যতখানি সহজভাবে নিতে পেরেছে, তেমন সহজভাবে কি নিতে পারবে এমিলির সঙ্গে প্রদীপের জীবনের অধ্যায়? না, না, বন্দনাকে অবশেষে সে ফিরে পেয়েছে, তাকে হারাতে সে প্রস্তুত নয় কোন কারণেই।

বন্দনা বলল, তোমার কাহিনী শেষ হয়েছে ত?

—আজকের মত শেষ হয়েছে।

—আরও অনেক গল্প আছে বুঝি? সে পরে একদিন শোনা যাবে, কেমন? এখন ত অনেক সময় পাওয়া যাবে! বলে চটুল চোখে বন্দনা প্রদীপের দিকে তাকাল।

এমিলির কথা প্রদীপ বন্দনাকে না বললেও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সে জানতে পারল সেই অধ্যায়ের ঘটনাবলী। সংবাদবাহক হল সুমিত্রা নিজে।

সুমিত্রা শুনেছিল তার স্বামী নবকিশোরের কাছে এবং নবকিশোর শুনেছিল ছবির কল্যাণে।

বিলেতের ট্রেনিং শেষ করে ছবিও দেশে ফিরে এসেছিল। এসেই সে নবকিশোরের সঙ্গে দেখা করেছিল। কথা প্রসঙ্গে নবকিশোর শুনেছিল প্রদীপ এমিলির কথা, যে হাসপাতালে এমিলির মৃত্যু হয় সেখানেই যে সে ট্রেনিংএ ছিল তাও জেনে নিয়েছিল নবকিশোর।

বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিতভাবেই খবরটা পৌঁছল বন্দনার কাছে।

স্তব্ধভাবে শুনল বন্দনা। তারপর বলল, তুই না আমার বন্ধু, সুমিত্রা?

থতমত খেয়ে সুমিত্রা বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই···

—তাহলে কেন এসব কথা আমায় বলতে এলি তুই? যে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, যে মেয়ে পৃথিবীর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, তার ইতিহাস জেনে আমার কি লাভ হল আজ?

আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে সুমিত্রা জবাব দিল, শুনলাম, প্রদীপ তোকে বিয়ে করবে বলেছে, তাই ভাবলাম বিলেতের জীবনের এই কাহিনীটা তোর জানা উচিত, যাতে তুই বুঝতে পারিস সে তোর যোগ্য কি না।

অবসন্ন কণ্ঠে অথচ একটু শ্লেষ মিশিয়ে বন্দনা বলল, তোদের মঙ্গল কামনা থেকে আমাকে একটু অব্যাহতি দিলেই আমি খুসী হ'ব, সুমি!...আর প্রদীপ আমার যোগ্য অযোগ্য কি না সেটা বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে।

টেলিফোনে বন্দনার গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল প্রদীপের কাছে। অফিস থেকে ফিরেই সে ছুটে গেল অটলবিহারী বাবুদের বাড়ীতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ভেতরের বারান্দায় একা বসে আছে বন্দনা।

—বসো। গম্ভীর ভাবে বন্দনা বলল।

প্রদীপ বসল।

—সুমিত্রা এসেছিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে রইল।

—এসেছিল বন্ধুর কাজ করতে। তোমার এমিলির ইতিবৃত্ত জানাতে।

চম্‌কে উঠল প্রদীপ। বন্দনার সঙ্গে মিলনের যে সেতু নতুন ক'রে গড়ে উঠেছিল, তাহ'লে সেটা আবার নির্ম্মমভাবে ভেঙে দিল নবকিশোর? প্রদীপের আর কোনই সন্দেহ রইল না যে ছবি খবরটা দিয়েছে নবকিশোরকে, আর নবকিশোর বলেছে তার স্ত্রী সুমিত্রাকে।

মুখ নীচু করে প্রদীপ প্রশ্ন করল, আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাও কি?

—বলতে পার। ক্লান্ত সুরে বন্দনা বলল।

অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এল। যে অন্ধকার এনে দেয় বিস্মৃতির শান্ত প্রলেপ, অনুরাগের স্নিগ্ধ সৌরভ, তা' আজ কেন এমন বিভীষিকাময় ঠেকছে?

সংক্ষেপে প্রদীপ বলল এমিলির সঙ্গে তার জীবনযাত্রার কাহিনী। কি ভাবে তাদের আলাপ হয়েছিল, কি ভাবে এমিলি এসেছিল তার অঙ্কে এক নববর্ষের প্রত্যুষে, কি ভাবে কেটেছিল একটি বৎসর, এবং কি ভাবে তার পরিসমাপ্তি হয়েছিল আর এক নববর্ষের প্রভাতে।

কাঠ হয়ে শুনল বন্দনা। উদ্‌গত অশ্রু শুকিয়ে গেল তার চোখে, হৃৎপিণ্ডের গতি যেন বন্ধ হয়ে এল।

তারপর বলল, এই সব ? না, এর পর আরও কোন অধ্যায় আছে, ডরোথি বা মার্গারেটকে অবলম্বন ক'রে ?

আহত স্বরে প্রদীপ জবাব দিল, না, এই সব।

তারপর বলল, সেদিনই হয়ত বলতাম, কিন্তু তোমাকে আবার হারাবার সম্ভাবনা আমাকে করে ফেলেছিল দুর্ব্বল, ভয়াতুর।

—আর এখন বুঝি সে সম্ভাবনাটা নেই ? তীব্রকণ্ঠে বন্দনা প্রশ্ন করল।

প্রদীপ মাথা হেঁট ক'রে রইল।

বন্দনা বলে চলল, তোমার কাছে এটা হয়ত একটা বিরাট, একটা অমূল্য অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি তোমার এই স্বেচ্ছাচারী দুর্ব্বলতার প্রকাশ দেখে। তোমার সাহসও ত কম নয়! ওদিকে তোমার বিদেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে তুমি চালিয়েছ তোমার লীলা, আর আমার কাছে করে গেছ মৃদু প্রেমনিবেদন! আর যেহেতু এখন তোমার হৃদয়ের রক্তাক্ত দুয়ার আমার সামনে খুলে ধরেছ, তুমি আশা করছ আমি মুছে দেব সেই রক্ত, পরিচর্য্যা করব তোমার আঘাত ? স্পর্দ্ধার, আত্মম্ভরিতার একটা সীমা থাকা উচিত, প্রদীপ!

প্রদীপ বলবার চেষ্টা করল, আমার কোনই স্পর্দ্ধা নেই, বন্দনা। আমি এসেছি…

বাধা দিয়ে বন্দনা বলল, তুমি এসেছ অনুশোচনার উপঢৌকন নিয়ে, এই ত ?…যথেষ্ট ধন্যবাদ। তোমার অনুশোচনা তোমার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকুক, আমাকে তার অংশ গ্রহণ করতে বলো না।

বন্দনা উঠে দাঁড়াল। বলল, কেন তুমি নিজেকে এতটুকু সংযত করে রাখতে পারলে না, প্রদীপ? আমার অন্তর-নিংড়ানো সমস্ত অনুরাগ দিয়ে যে-বিগ্রহকে আমি পূজো করছিলাম কেন তা' তুমি এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে দিলে?

ব'লে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার আর্ত্তস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাত্রির অন্ধকারে।

দু'দিন পরে প্রদীপ গেল গায়ত্রীর কাছে। তার রুক্ষ চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল দেখে গায়ত্রী প্রশ্ন করল, এ কি চেহারা তোমার হয়েছে, প্রদীপ? অসুখ করেনি' ত?

—না। প্রদীপ জবাব দিল।

—তবে বন্দনার সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি? সস্নেহে গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

—না।প্রদীপ আবার জবাব দিল।

প্রদীপ বলল, দিদি, সব গোলমাল হয়ে গেছে, এবার শোধরাবার আর পথ নেই।

—আমাকে খুলে বল প্রদীপ!

প্রদীপ খুলে বলল সব কথা, প্রথম থেকে শেষ অবধি। আর বর্ণনা করল বন্দনার মনের প্রতিক্রিয়া।

সব শুনে গায়ত্রী বলল, তুমি বড্ড বোকামি করেছ।

—কি বোকামি করলাম, দিদি? আমি ত যেচে বন্দনাকে বলতে যাইনি!

—বোকামি হয়েছে সব চেয়ে প্রথমে, তোমার সেই সন্তোষ মুখুজ্যের প্ররোচনায় পড়ে ছবির সঙ্গে আলাপ করায়। ভেবে দেখ দেখি, ছবি যদি এর মধ্যে জড়ানো না থাকত, তাহলে বন্দনা বা সুমিত্রা কি ঘুণাক্ষরে জানতে পারত তোমার এই বিদেশিনী বান্ধবীর কথা?

এর জবাবে কি আর বলবে প্রদীপ? সে চুপ করে রইল।

একটু পরেই মিঃ কর এলেন। তাঁর মুখ চিন্তাকুল। প্রদীপকে দেখে বললেন, এই যে প্রদীপ, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাল।

—কথাটা হচ্ছে এই যে, সরকারী চাকুরীতে তুমি নতুন ঢুকেছ, একটু সাবধানে চলাফেরা করো, যেখানে সেখানে যেয়ো না।

প্রদীপ ঠিক বুঝল না মিঃ কর কি বলতে চান। গায়ত্রীও বিস্মিতভাবে স্বামীর দিকে তাকাল।

—এর মধ্যে তুমি এক বামপন্থীদের মিটিংএ গিয়েছিলে শুনলাম? সেখানে খুব গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, তুমি নাকি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলে?

এই কথা? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রদীপ বলল, আপনি ভুল শোনেন নি, মিঃ কর, তবে শেষের দিকটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমার এক পুরানো বন্ধুর (বন্ধু বলা হয়ত ঠিক হচ্ছে না, পরিচিত বললেই সঙ্গত হবে) সঙ্গে দেখা, একথা সে-কথার পর আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাদের মিটিং-এ, আমি সেখানে ছিলাম একজন শ্রোতা ভাবে, কোন অংশগ্রহণ করিনি, প্রয়োজনও হয়নি।

—কি হয়েছিল এই মিটিংএ?

—কি আর হবে? সভাপতি খুব লম্বা-চওড়া গলায় বললেন, কারখানায় go-slow tactics অবলম্বন করতে হবে শ্রমিকদের, যাতে মালিকেরা disciplinary action নিতে বাধ্য হয়, তারপর সময় এবং সুযোগ বুঝে শ্রমিকরা করবে ধর্ম্মঘট।

—তুমি আশা করি এ-সব পদ্ধতিতে বিশ্বাস কর না?

হেসে প্রদীপ বলল, নিশ্চয়ই নয়, মিঃ কর। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ হয়ত আছে, কিন্তু তার প্রতিকারের পথ এ নয়।

—শুনে সুখী হ'লাম। ভবিষ্যতে আর কখনও এজাতীয় মিটিংএ যেয়ো না, তোমার চাকরীর ক্ষতি হতে পারে।

প্রদীপ বিস্মিতভাবে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। শ্রোতা বা দর্শক হিসেবেও যাব না?

—না, কারণ পরে ওরা তোমারই নাম করে বলবে যে তোমার সহানুভূতি আছে তাদের প্রতি। সেটা খুব বাঞ্ছনীয় হবে না। এই যে আমি খবর পেলাম, এ-ও তোমার সেই বন্ধুর দৌলতে, নিজে এসে আমাদের দপ্তরে বলে গেছে যে তুমি তাদের একজন সমব্যথী, যাকে বলে sympathiser!

অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছে প্রদীপ। আরও কত শেখবার, জানবার আছে, কে বলতে পারে?

বন্দনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ ক'রে দিল প্রদীপ। বন্দনার প্রতি কোন অভিযোগ তার নেই, ঠিকই বলেছে বন্দনা, অত্যন্ত দুঃসাহস এবং স্পর্দ্ধা তার যে, সে এক দিকে উপভোগ করেছে এমিলির সাহচর্য্য, অপর দিকে বন্দনাকে করেছে মৃদু প্রেমনিবেদন। যদিও তার চিঠিতে প্রেমের কোনই উল্লেখ ছিল না, তবু তলিয়ে দেখলে আর কোন্ পর্য্যায়ে সে ফেলতে পারে তার চিঠিগুলো? তার প্রতি বন্দনার অনুরাগকে জাগিয়ে রাখার সূক্ষ্ম প্রয়াস কি ছিল না এই চিঠিগুলোয়?

সত্যি, সে বড় একা। এই একাকীত্বের বোঝাই তাকে টেনে আনে অননুভূতপূর্ব্ব সংস্থায়, পরিস্থিতিতে। প্রথম থেকে শেষ অবধি জীবনটাকে পর্য্যালোচনা করলে তাই মনে হয় না কি? মেদিনীপুরে সে গিয়েছিল, কেন? স্বাতন্ত্র্যের বোঝা তাকে ক'রে তুলেছিল অভিভূত, তাই সে চেয়েছিল বিক্ষুব্ধ জনতার স্রোতে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে, কিন্তু সফল হয়নি। তারপর সন্তোষের সঙ্গে মোমিনপুরে অভিযান, ছবির সঙ্গে পরিচয়, তার পেছনেও কি ছিল না নিজের একাকীত্ব দূর করবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস? বিলেতেও সে শান্তি

পায়নি, যত দিন না তার পরিচয় হ'ল এমিলির সঙ্গে। এমিলির আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ, এ-ও হচ্ছে তার একাকীত্বের প্রতিক্রিয়া। আর এখনও যে সে বন্দনাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তার অর্থও কি সেই একই নয়?

কিন্তু একমাত্র সেই কেন একাকী? তার চারদিকে অগুণতি নর-নারী —তাদের মুখ দেখে ত মনে হয় না একাকীত্বের বোঝা তাদের জীবনকে করে রেখেছে দুঃসহ? তারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় নির্ব্বিচারে মেনে নিয়ে তারা জীবনের সঙ্গে করেছে সন্ধি স্থাপন, অথচ সে কেন পারছে না? তার অহমিকাই কি একমাত্র প্রতিবন্ধক? আদর্শবাদের প্রতি যে স্তুতি সে জানায়, তার কতটুকু অন্তরের কথা, আর কতটুকুই বা বাইরের খোলস?

না, যত দুঃখই তার অদৃষ্টে থাকুক না কেন, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সে কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে বলি দিতে পারবে না সুবিধাবাদের যুপকাষ্ঠে। লোকে তাকে হয়ত বলবে queer, বেসংসারী, এমন কি দাম্ভিক। বলুক তারা, সে মাথা পেতে মেনে নেবে তাদের নিরপেক্ষ, অথচ কঠোর বিচার।

চৌদ্দ

প্রদীপ চেষ্টা করল তার নতুন কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে। তার অফিস কলকাতায়, কিন্তু সে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই সব অনধিগম্য জায়গায়, যেখানে তার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা সচরাচর যান না। এই পরিভ্রমণের ফলে সে অর্জ্জন করল সম্পূর্ণ নতুন রকমের অভিজ্ঞতা। সে দেখল, জনসাধারণ বা নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে ওপরওয়ালার একটু সহানুভূতি, একটু সাহায্যের জন্য—যার সামান্য নিদর্শন পেলে তারা কাজ করতে থাকে দ্বিগুণ উৎসাহে।

ঘুরতে ঘুরতে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল বিরাট একটা দুর্নীতি, তারই একজন অধস্তন কর্ম্মচারী বেশ উদার হাতে উৎকোচ গ্রহণ করছে। প্রদীপ তথ্যগুলি এনে তার ওপরওয়ালার কাছে নালিশ করল।

মিঃ বক্সী তার নালিশটা গায়ে মাখলেন না। বললেন, অবিনাশ চৌধুরীর কথা বলছেন ত? ওর কাণ্ডকারখানা আমার জানা আছে।

জানা আছে? অথচ কিছু বলেন না তিনি?···প্রদীপ ত স্তম্ভিত!

মিঃ বক্সী বোধ হয় বুঝতে পারলেন প্রদীপের অবাক্-বিস্ময়। বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি নিজেই এ বিষয়ে এনকোয়ারি করব।

সপ্তাহান্তে প্রদীপ শুনল যে, এনকোয়ারি হয়ে গেছে, অবিনাশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রদীপ ভয়ানক রেগে গেল। সে স্থির করল, সে নিজেই আলাদা একটা এনকোয়ারি করবে এবং অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করবে সরকারের সম্মুখে।

বহু পরিশ্রম ক'রে মাসখানেক পরে সে দাখিল করল তার রিপোর্ট। রিপোর্ট পেয়ে মিঃ বক্সী ভ্রূকুঞ্চন করলেন। বললেন, এর অর্থ?

—আমি ওখানে সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন যাই। আমার নজরে যা' আসে তা' আপনার নজর এড়িয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাই সম্পূর্ণ এই রিপোর্টটা আপনাকে দিলাম।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, আমার এনকোয়ারিটা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই আপনি নতুন ক'রে এনকোয়ারি করতে বাধ্য হয়েছেন ?

—আমি কিছুই বলতে চাই না, মিঃ বক্সী আপনি পড়ে দেখবেন। যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে ডাকবেন।

প্রদীপ শুনল, তার রিপোর্ট নিয়ে হেড কোয়ার্টার-এ জোর আলোচনা চলছে। তার দু-একজন সতীর্থ এসে তাকে অভিনন্দন জানাল যে অবশেষে সে অবিনাশ চৌধুরীর দুর্নীতির দুর্ভেদ্যজাল ভাঙতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু অভিনন্দন শীগগিরই এল অন্য ভাবে। একদিন প্রদীপ হঠাৎ হুকুম পেল যে তাকে কলকাতা সার্কেল থেকে বদলী করা হয়েছে মেদিনীপুর সার্কেলে।

প্রদীপ সোজা চলে গেল মিঃ বক্সীর কাছে। বলল, এই বদলীর অর্থ ?

—অর্থ কিছুই নয়, প্রদীপ বাবু! আপনি এখন আছেন ট্রেনিং-এ, মফঃস্বলের অভিজ্ঞতা খানিকটা অর্জ্জন করা দরকার, তাই আপনাকে কলকাতার বাইরে কিছুকাল থাকতে হবে।

তারপর একটু হেসে বললেন, আর মেদিনীপুর ত আপনার পুরানো জায়গা। ১৯৪২ সালে আপনি সেখানে ছিলেন একজন নেতা, তা আমরা ভুলে যাই নি।

প্রদীপ গুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে, মিঃ বক্সী! অবিনাশ চৌধুরীর ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে কলকাতা সার্কেলে রাখা হোক। আমি বাইরে চলে গেলে আপনাদের তদন্তে সাহায্য করবে কে ?

—আপনি সেজন্য ভাববেন না, প্রদীপ বাবু! আপনার রিপোর্ট আমাদের কাছেই আছে, সেটা বিবেচনাধীন। প্রয়োজন হ'লে আপনাকে মেদিনীপুর থেকে ডেকে আনা হবে, বেশী দূরে ত নয়।

প্রদীপ বুঝল অবিনাশ চৌধুরী সম্বন্ধে রিপোর্টই তার বদলীর কারণ।

প্রদীপ ছুটে গে   করের কাছে, সব কথা তাঁকে খুলে বলল

—অবিনাশ চৌ ? তাকে কে না চেনে? তুমি তার বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করেছিলে, তোমার দুঃসাহস আছে বটে, প্রদীপ!

—কেন? বিস্মিত ভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—ওঃ, তুমি জানো না না বুঝি? অবিনাশ যে আমাদের জ্যোতির্ম্ময় বাবুর শ্যালিকার ছেলে। তার পেছনে তুমি লাগতে গিয়েছিলে কেন?

—আমি কারও পেছনে লাগতে যাই নি, মিঃ কর! আমার কাজের সূত্রে যদি আমি দুর্নীতি, অন্যায় আবিষ্কার করি তা আমি কর্তৃপক্ষকে জানাব না?

—তুমি ত একবার জানিয়েছিলে মিঃ বক্সীকে। তারপর চুপ ক'রে থাকলেই পারতে?

—কিন্তু মিঃ বক্সী এনকোয়ারি ক'রে বললেন, অবিনাশের বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই—

—কাজেই তোমাকে নামতে হ'ল রণক্ষেত্রে, তুমি করলে তোমার এনকোয়ারি। জানো, সরকারী কানুনে এ হচ্ছে ঘোরতর বিদ্রোহ, নিজের ওপরওয়ালাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার এই প্রচেষ্টা।

—আমি ত ওপরওয়ালা সম্পর্কে কিছুই বলিনি, যদিও এখন মনে হচ্ছে, বললে সেটা হয়ত অশোভন হ'ত না! বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই প্রদীপ জবাব দিল।

—শোন প্রদীপ, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে সরকারের কাজে আমার অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে অনেক বেশী। আমি তোমাকে বলছি, কোন দুর্নীতি বা অন্যায় যদি তোমার চোখে পড়ে, প্রথমে অনুসন্ধান করো কে সেই দুর্নীতি বা অন্যায় করছে এবং তাকে যে প্রশ্রয় দিচ্ছে, সে কে। আরও অনুসন্ধান করো, মন্ত্রী বা নেতৃস্থানীয় কারোর সঙ্গে তার আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব আছে কি না। যদি থাকে, তাহ'লে চোখ বুজে থেকো—মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়ো যে তুমি একা দেশের সব দুর্নীতি বা অন্যায়ের উচ্ছেদকরতে পারবে না। তাছাড়া,

ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে। ভগবান মান ত? তিনিই যথাসময়ে এর বিধান করবেন।

—আপনি বলেন কি মিঃ কর? আপনার উপদেশ অনুসরণ করা মানে হচ্ছে অন্যায়কে মেনে নেওয়া! আমার ধারণা ছিল, বিদেশী আমলে আর যে অপরাধই আপনারা করে থাকুন না কেন, এই অপরাধ আপনারা কখনও করেন নি!

—কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু তার কারণ ছিল। বৃটিশ যুগে আমাদের ওপরওয়ালা যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে পারতেন, যেহেতু রাম শ্যাম যদু মধুর সঙ্গে তাঁদের কোন স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল না। কি ক্ষতি বা লাভ হত মিঃ কলিন্‌স-এর, যদি অবিনাশ চৌধুরীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে হ'ত, অথবা তাকে পাঠাতে হত জেলে? তাই আমরা, যারা ছিলাম বৃটিশশাসকের দক্ষিণ হস্ত, নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারতাম আমাদের তথাকথিত ন্যায়ের তুলাদণ্ড। কিন্তু এখন অবিনাশ চৌধুরীকে টানতে গেলেই বেরিয়ে পড়বেন জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এইভাবে দেশ যদি চলে, তাহ'লে স্বাধীনতা টিঁকবে কত দিন মিঃ কর?

—তুমি বড্ড পেসিমিষ্টিক প্রদীপ! এর সঙ্গে স্বাধীনতার কি সম্পর্ক? আমেরিকায় কি হয় তা' তুমি শোননি'? অথচ তাদের স্বাধীনতা কি কমে গেছে? তাছাড়া, এসব বিষয়ে আমরা এখনও অনেক দেশের ওপরে। আমাদের আশে-পাশে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় যা হচ্ছে তার তুলনায় আমরা স্বর্গে আছি, প্রদীপ!

—তাহলে আপনি বলছেন আমার কর্ত্তব্য সরকারের হুকুম মেনে নেওয়া এবং আর কোন কথাটি না বলে চলে যাওয়া মেদিনীপুরে?

—ঠিক তাই। অবিনাশ চৌধুরীর কি হ'ল না হ'ল তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। আর একটা কথা বলি, তুমি সদ্য-সদ্য বিলেত থেকে এসেছ, বৃটেনের নীতি এদেশে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করো না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমরা এখন আর বৃটেনের দাস নেই, আমরা এখন স্বাধীন, মুক্ত!

মিঃ করের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি যেন দেখা গেল কি? অথবা, প্রদীপেরই চোখের ভুল?

সারাটা রাত প্রদীপ কাটাল ছটফট করে। এ কি উপদেশ দিলেন মিঃ কর? না, না, এই পথে সে চলতে পারবে না। আর কার সঙ্গে পরামর্শ করবে সে? বন্দনা? না, সেই দুয়ারও যে বন্ধ! আচ্ছা, গায়ত্রী হয়ত তাকে বলতে পারবে কি করা তার কর্ত্তব্য।

স্বামীর কাছে গায়ত্রী আগেই ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছিল। তাই পরের দিন প্রদীপ যখন তার কাছে এল, সে নিজেই প্রশ্ন করল, কি, ওঁর উপদেশ বুঝি মনে ধরল না, তাই এসেছ দিদির কাছে নৈতিক নির্ভরের আশায়?

—তুমি আমাকে বলো দিদি, এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

—তোমার মন কি বলছে?

—আমার মন বলছে এই অন্যায় মেনে না নিতে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে।

—কিন্তু এটা কি তুমি ভেবে দেখেছ যে, প্রতিবাদ করলেও কোন ফল হবে না, মাঝখান থেকে তোমাকেই বেরিয়ে পড়তে হবে সরকারের কর্ম্মশালা হ'তে?

—কেন?

—কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা বিশাল, অপ্রতিহত। তুমি একজন নগণ্য কর্ম্মচারী, কি করতে পার তুমি এই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে?

প্রদীপ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমার মন স্থির ক'রে নিলাম দিদি! এই অন্যায় মেনে নেব না। প্রতিবাদ জানাব, যতই ক্ষীণ হোক্ না আমার নগণ্য অস্বীকৃতি।

—আমি জানতাম, এই সিদ্ধান্তেই তুমি আসবে। এছাড়া তোমার আর কোন পথই নেই। আমি খুব খুশী হয়েছি প্রদীপ! বলে গায়ত্রী সস্নেহে তার দিকে তাকাল।

অফিসে গিয়েই প্রদীপ দিল দরখাস্ত—অবিনাশ চৌধুরী সংক্রান্ত ব্যাপারটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তার মেদিনীপুর বদলীর আদেশ যেন মুলতুবি রাখা হয়।

দরখাস্তটা পেয়েই মিঃ বক্সী প্রদীপকে ডেকে পাঠালেন।

—এ আপনার কি আবদার, প্রদীপ বাবু? আপনার সঙ্গে সেদিন কথা হ'ল, আমি আপনাকে বললাম যে প্রয়োজন হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব, তবু এই দরখাস্ত দেবার অর্থ? আপনি সরকারের হুকুম মানতে চান না বুঝি?

—মানতে নিশ্চয়ই চাই, তবে আমার ভয় যে আমি এখান থেকে চলে গেলে আমাকে ডাকবার প্রয়োজন আপনাদের হবে না।

—যদি প্রয়োজন না হয়, আপনি আসবেন না। এ ত অত্যন্ত সহজ কথা।

—আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে না, মিঃ বক্সী! তাছাড়া, আপনারা ত ইচ্ছে করলেই হপ্তাখানেকের মধ্যে আমার রিপোর্টের ওপর আপনাদের চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন, তারপর আমি সানন্দে চলে যাব আমার নতুন কর্ম্মস্থলে।

—সরকার আপনার আবদার মাফিক চলবে না, চলতে পারে না। আপনি তাহলে এখন মেদিনীপুর যেতে প্রস্তুত নন্?

—আমার যা বক্তব্য তা আমার দরখাস্তেই বলেছি, মিঃ বক্সী!

—বেশ। আচ্ছা, আসুন।

প্রদীপ বেরিয়ে এল।

দু'দিন পরে প্রদীপ নতুন আদেশপত্র পেল। যেহেতু সে সরকারের হুকুম মানতে রাজী নয়, সেজন্ত তাকে চাকুরী থেকে অবসর দেওয়া হল। তবে সরকার কোন অবিচার করতে চান না, নোটিশের বদলে তাকে এক মাসের অগ্রিম বেতন দেওয়া হবে।

প্রদীপ এতটুকু বিস্মিত হল না। এরকম আদেশপত্র যে আসবে তা

আগে থেকেই জানত। তবে সে অবাক হয়ে গেল সরকারের দ্রুতগতিতে কাজ করবার এই প্রমাণ পেয়ে। কে বলে যে ব্যুরোক্রেসী এবং লালফিতার বন্ধনে সরকারী পরিকল্পনা আটকে থাকে?

সরকারের সঙ্গে প্রদীপের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হল চাকুরীতে ঢুকবার ঠিক চার মাস পরে। প্রদীপ ডায়েরীতে লিখে রাখল তারিখটা—৩১শে জুলাই, ১৯৫১।

পনেরো

অখণ্ড অবসর মিলেছে প্রদীপের। অফিসে যাবার তাড়াহুড়ো নেই, অন্যায় দুর্নীতির প্রতিবাদ করবার দায়িত্ব নেই, সে এখন সময় কাটাতে পারে নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে।

এক মাসের মাইনে অগ্রিম পেয়েছে, তাছাড়া এই কয় মাসের উপার্জ্জন থেকে কিছু সঞ্চয়ও করতে পেরেছে সে। চলে যাবে তার একার জীবন আরও চার পাঁচ মাস। এর মধ্যে সে স্থির করে নেবে কোন্ দিকে ঘোরাবে তার ভবিষ্যৎ। এখন কিছুদিন সে কাটাবে স্বপ্নালস গোধূলির চক্রবালে।

দরজায় কে কড়া নাড়ছে যেন? প্রদীপ উঠল তার বিছানা থেকে, দরজাটা খুলে দাঁড়াল। দেখল, আগন্তুক সন্তোষ।

একগাল হাসি হেসে সন্তোষ বলল, এই যে, প্রদীপ বাবু, আপনার অফিস থেকে অনেক কষ্টে ঠিকানাটা জোগাড় করেছি।...আপনি যথার্থ মানুষের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা সবাই গর্ব্বিত বোধ করছি আপনার কথা আলোচনা ক'রে।

একটু শ্লেষের সঙ্গে প্রদীপ জবাব দিল, আপনাদের অভিনন্দনের জন্য অজস্র ধন্যবাদ।...আমার এখন সময় নেই, কিছু মনে করবেন না।

—আহা, আপনি যে আমাকে প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন দেখছি। ...এতদিনের বন্ধুত্ব, তার খাতিরে একটু বসতে বলতেও ত হয়! ব'লে একপ্রকার জোর করেই সে ফ্ল্যাট-এর ভিতরে ঢুকল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ব্যাচেলার হ'লে যা হয়, ঘরে এতটুকু শ্রী নেই...আপনার বিয়ে করা উচিত, প্রদীপ বাবু, ব্যাচেলার জীবন আপনাকে মানায় না।

সন্তোষের চোখে অর্থপূর্ণ হাসি।

প্রদীপ বলল, আপনার আর কি বক্তব্য আছে বলুন, ব্যাচেলার জীবন সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা হবে।

সন্তোষ একটা চেয়ার অধিকার করে বসল। অগত্যা প্রদীপকেও বসতে হ'ল আর একটা চেয়ারে।

—বক্তব্য খুবই সামান্ত, প্রদীপ বাবু।...এবার আপনি দেখলেন ত সরকারের ব্যবহারের নমুনা!...আমাদের পার্টিতে আসুন, আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে।

—আমার যদি ইচ্ছা না থাকে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের কাজে লাগাতে?

—রাগ করছেন কেন?...জানেন ত, একদিন আমরাই হ'ব সরকার, তখন আপনাকে ভুলে যাব না।

তীব্রকণ্ঠে প্রদীপ জবাব দিল, আপনাদের অনুগ্রহের জন্ত আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার কোনই অভিলাষ নেই আপনাদের পার্টিতে যোগ দেবার।

—তাহ'লে আপনি চাকুরী ছাড়লেন কেন?...বিস্মিত স্বরে সন্তোষ প্রশ্ন করল।

—আমি চাকুরী ছাড়িনি, আমাকে অবসর দেওয়া হয়েছে।

—ঐ একই কথা, প্রদীপ বাবু! এ ঘোরতর অন্যায়, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব আমরা, আমাদের পার্টি থেকে।

—মাপ করবেন সন্তোষ বাবু। আপনাদের সহানুভূতির প্রত্যাশায় আমি নিজেকে আজ এই পরিস্থিতিতে টেনে আনিনি!

—আপনি বড্ড একগুঁয়ে, প্রদীপ বাবু! সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রিক জীবনে একা কখনও থাকা সম্ভব? আপনাকে কোন না কোন পার্টিতে আসতেই হবে, কর্মী সভ্য হিসেবে না আসুন, সমব্যথী হিসেবে আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ করছি।

—আপনাদের আমন্ত্রণ আমার নোট বই-এ টুকে রাখছি। কিন্তু বৃথাই আপনি সময় নষ্ট করছেন। কোন পার্টিতেই যোগ দেবার স্পৃহা আমার নেই,

সমব্যথীভাবেও নয়। আচ্ছা, আজ তাহ'লে আসুন। ব'লে একরকম জোর করেই সে বার দিল সন্তোষকে।

প্রদীপের চাকুরীবিভ্রাটের কথা তার পরিচিত মহলে গোপন রইল না। জ্যোতির্ম্ময় বাবু একটু হেসে বললেন, বিলেত থেকে গরম রক্ত নিয়ে এসেছে, দু'দিন উপোস করে থাকলেই আস্ফালন কোথায় মিলিয়ে যাবে, দেখো!

অটলবিহারী বাবুও বললেন সেই একই কথা। তবে তার সঙ্গে তিনি আরও বললেন, প্রদীপ বড্ড বোকামি করল।

সুমিত্রা নবকিশোরকে বলল, শুনেছ ত তোমার বন্ধুর কীর্ত্তি? এমন ভাল একটা চাকুরী, সেটা কিনা ছেড়ে দিল?

নবকিশোর দুঃখিত বোধ করল প্রদীপের জন্য। একদিন সে সোজা চলে গেল তার ফ্ল্যাট-এ। বলল, প্রদীপদা', তুমি ত জান আমি তোমাকে চিরকাল শ্রদ্ধা করে এসেছি। তুমি চাকুরীর জন্য ভেবো না। আমার ফার্ম্ম-এর দুয়ার তোমার জন্য চিরকাল খোলা আছে, তুমি চলে এসো আমাদের কাছে, আমরা দু'জনে মিলে-মিশে কাজ করব।

ছবিকে অবলম্বন করে নবকিশোর সম্বন্ধে তার যে অভিযোগ ছিল তা সে অনেক দিন আগেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু সুমিত্রার মাধ্যমে বন্দনার কাছে এমিলির কাহিনী উত্থাপনের পরিণতির জ্বালা সে ভুলতে পারেনি।

তবু কোন অসৌজন্য সে প্রকাশ করতে পারল না। সংক্ষেপে নবকিশোরকে জানাল তার কৃতজ্ঞতা, তারপর বলল, চাকুরীর সখ তার মিটে গেছে, চাকুরী আর করবে না।

—সে কি? একটা কিছু করতে হবে ত? খাবে কি ক'রে?

—একটা পেটের জন্য ভাবনা করি না, নবু! চলে যাবে কোনরকমে। কিন্তু চাকুরীর কথা ব'লো না, বিশেষ ক'রে তোমাদের ফার্ম্মে।

—কেন, আমাদের ফার্ম্ম কি অপরাধ করল? বেশ আহতস্বরেই নবকিশোর বলল।

—অপরাধ কিছু করেনি। তবে তোমাদের ব্যবসার যা পদ্ধতি তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব না। মাঝখান থেকে শুধু অশান্তি সৃষ্টি হবে। কি প্রয়োজন তাতে ?

প্রদীপের আপত্তি গায়ে না মেখে নবকিশোর বলল, ঐ ত তোমার দোষ, প্রদীপদা' ! তুমি চাও যে সমস্ত পৃথিবীটা গড়ে ওঠে তোমার অভিরুচি মত। সে ত হয় না ! দোষে-গুণে মিশিয়ে আছি আমরা সবাই। কেবল দোষের ভাগটাই তোমার নজরে পড়ে, আমরা দেশের দশের যে উপকার করছি তা তুমি দেখতেই পাও না ! জানো, এবার আমরা কনট্র্যাক্ট পেয়েছি দু'কোটি টাকার ওপর, গড়ে উঠবে দশতলা দালান, মস্ত বড় পার্ক, মহাত্মাজীর স্মৃতি-মন্দির। আর অন্নসংস্থান হবে অন্ততঃ হাজার দু'হাজার লোকের। তুমি এর অংশ গ্রহণ করতে চাও না ?

—না, নবু ! দৃঢ়স্বরে প্রদীপ জবাব দিল।

—তুমি চিরকেলে obstinate, প্রদীপদা' ! আমি বলছি দু'দিন বাদে তোমার এই obstinacy কেটে যাবে, তুমি নিজেই চলে আসবে আমাদের কাছে। হাজার হোক, জীবনধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে ত ?

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, জীবনধর্ম্ম যেন আমাকে এমন কাজ করতে বাধ্য না করে, যা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। তাছাড়া, আমি খুসী হব, যদি আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা আর কেউ না ভাবে !

প্রদীপের স্বরে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, তীব্র ব্যঙ্গ।

নবকিশোর এসে সুমিত্রাকে জানাল, প্রদীপের সঙ্গে তার কথোপকথনের সারমর্ম্ম। সুমিত্রা বলল, তোমার কোনই অপমানবোধ নেই। কেন যেচে নিজের ওপর ডেকে আনলে এই অসম্মান ? তোমার বন্ধুর দাম্ভিকতার তুলনা হয় না !

বিরক্তির সুরে নবকিশোর জবাব দিল, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি, এর

মধ্যে অপমানের কি আছে? আমার শুধু খারাপ লাগছে প্রদীপদা'র ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

—যার বিয়ে তার খেয়াল নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। আমি তোমাকে বলে রাখছি, তুমি আর কখখনো তার কাছে যাবে না। দেখবে, একদিন নিজেই চলে এসেছে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে।

অন্যমনস্ক ভাবে নবকিশোর জবাব দিল, ঐখানেই ত আমার ভয়, সুমিত্রা! প্রদীপদা'কে যতটুকু জানি, সে না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তবু মাথা হেঁট করবে না। দম্ভ? হ্যাঁ, একে দম্ভ তুমি বলতে পারো।

সুমিত্রাই বন্দনার কাছে পৌঁছে দিল প্রদীপের দর্পের ইতিবৃত্ত। দুঃখ-প্রকাশ করল যে, প্রদীপ তার স্বামীর এমন উদার আমন্ত্রণকেও করল প্রত্যাখ্যান!

বন্দনা চুপ ক'রে শুনল, কোন কথা বলল না।

ষোল

পনেরোই আগষ্ট, ১৯৫১ সাল, স্বাধীনতা দিবস।

উৎসব-মুখর কলকাতা। ভোর হতে না হতেই প্রভাতফেরী বেরিয়েছে সহরের পথে পথে। জাতীয়পতাকা বহন ক'রে গান গাইতে গাইতে চলেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কিশোর-কিশোরীর দল। পার্কে, সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহে নেতৃবৃন্দ তুলছেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, তাদের সম্মুখে তুলে ধরছেন তাদের কর্ত্তব্যের তালিকা। ফুল, পাতা এবং ক্ষুদ্রসংস্করণ পতাকার সাহায্যে দোকানপাট সাজান হয়েছে। দিল্লীর লালকেল্লার ওপর থেকে বক্তৃতা দেবেন পণ্ডিতজী, আর তা শোনা যাবে সারা ভারতবর্ষে, বেতারের মাধ্যমে।

প্রদীপের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ভোর পাঁচটায়, তাদেরই পাড়ার প্রভাত-ফেরীর আবাহনে। সে উঠে একবার বারান্দায় গিয়ে দেখেছিল শোভাযাত্রা, তারপর আবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তার বিছানায়।

ঘুম কিছুতেই আসছিল না। প্রদীপ কেবলই ভাবছিল, এই উৎসবের মধ্যে তার কোনই স্থান নেই। অপরাধ প্রধানতঃ তারই, জোর ক'রে সে হয়ে রইল বিচ্ছিন্ন, স্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণতাকে সে চিরকাল করে রাখল তীক্ষ্ণতর। নব-কিশোর ঠিকই বলেছে, সে কেবলই চেয়েছে পৃথিবীটা গড়ে ওঠে তারই আদর্শা-নুসারে, দোষে-গুণে মিশিয়ে যে জনস্রোত চলেছে তার মধ্যে নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে পারে নি। এটা শুধু সামাজিক এবং রাষ্ট্রীক জীবনে নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনেও সে দেখেছে বহু বার। আজ সে পড়ে আছে একা, দুটো সান্ত্বনার কথাও বলতে আসে না কেউ।

আবার তার মনে পড়ছে জীবনের সেই গোড়ার কথা, মানুষ জন্মায় কেন? জন্মাবার বায়োলজিক্যাল কারণ সে জানে, সে প্রশ্ন সে তুলছে না। সে শুনে এসেছে, বিধাতার এই রাজ্যে প্রত্যেকটি প্রাণীর অস্তিত্বের একটা গভীর

আছে, শুধু অস্তিত্বের নয়, তাদের কার্য্যকলাপের, তাদের হাসিকান্নার, তাদের হিংসা-ভালবাসারও। কিন্তু তার নিজের অস্তিত্বের কোন অর্থই সে খুঁজে পাচ্ছে না, যদি না অর্থ-না-থাকাটাই সব চেয়ে বড় অর্থ ব'লে মেনে নেওয়া হয়। ছবিকে, এমিলিকে, এমন কি বন্দনাকে কেন্দ্র ক'রে তার জীবনের যে অধ্যায়-গুলো রচিত হয়েছিল, তা থেকে সে নিজে হয়ত খানিকটা সুখ-দুঃখ অনুভব করেছে, কিন্তু তার কোন প্রভাবই কি পড়েছে এই তিন জনের জীবনে? ছবি তাকে একবার মনেও করে না নিশ্চয়ই, এমিলি চলে গেছে ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে, আর বন্দনাও নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে ফেলেছে প্রদীপের স্মৃতি। তাই কেবলই তার মনে হচ্ছে, যদি সে পৃথিবীতে একেবারেই না জন্মাত তাহ'লে কারও এতটুকু ক্ষতি হ'ত না। কত বড় উপহাসের বস্তু এই জীবন, অথচ এরই উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে পৃথিবীর নরনারী, লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ছুটকো-ছাটকা দু-একটা উপঢৌকনের দিকে।

দূর ছাই, কি সব এলোমেলো চিন্তা আসছে তার মনে, অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন এই সংলাপ। চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকার এই ফল। নাঃ, ঘরের বাইরে সে আজ বেরুবে, যাবে গায়ত্রীর কাছে, যাবে, হ্যাঁ, যাবে বন্দনার কাছে।

স্নানের ঘরে গিয়ে প্রদীপ দাড়ি কামাতে সুরু করল।

হঠাৎ খুট্ করে একটা শব্দ হ'ল যেন? প্রদীপ উকি মেরে দেখল, সুমিত্রা।

সারা গালে সাবানের ফেনা, হাতে দাড়ি কামাবার বুরুশ, প্রদীপ বেরিয়ে এল স্নানের ঘর থেকে।

—তুমি ঢুকলে কি ক'রে? দরজা কে খুলে দিল?

—কেউ খুলে দেয়নি। কাল নিশ্চয়ই দরজায় চাবি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলে। তা' ভালই হয়েছে, নইলে কতক্ষণ কড়া নাড়তে হ'ত কে জানে।

কি বলতে চায় সুমিত্রা? অত্যন্ত সাদাসিদে একখানা খদ্দরের শাড়ী পরে

এসেছে সে। হাতে আছে মাত্র দু'গাছা সোনার চুড়ি। অটলবিহারী বাবুর পুত্রবধূ নবকিশোরের পত্নী সুমিত্রা আবার রূপান্বিত হয়েছে ১৯৪২ সালের তপঃক্লিষ্টা সুমিত্রায়।

—অর্দ্ধেকটা দাড়ি কামান হয়েছে, বাকিটা কামিয়ে মুখ পরিষ্কার ক'রে এসো। আমি বসছি।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি ছুটল স্নানের ঘরে।

ফিরে এসে দেখে সুমিত্রা এরই মধ্যে বিছানা গুছিয়ে রেখেছে, তার টেবিলের ওপরকার ময়লা ঢাকনিটা বদলে সেখানে দিয়েছে নতুন ফর্সা একটা আবরণী। দশ মিনিটের মধ্যেই ঘরের চেহারা বদলে গেছে।

সুমিত্রা বলল, খাঁটি ব্যাচেলারের অ্যাপার্টমেণ্ট। আচ্ছা, প্রদীপ, আর কত দিন তুমি এমন ছন্নছাড়া জীবন কাটাবে?

প্রদীপ পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার এই হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ?

একটু লজ্জিতভাবে সুমিত্রা জবাব দিল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

—ক্ষমা? কিসের জন্য?

—বন্দনার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদের কারণ আমি। তোমার বিলেত-জীবনের কাহিনী তাকে বলাটা আমার উচিত হয়নি।

আসলে কিন্তু এটা একটা অজুহাত মাত্র। সুমিত্রা এসেছে প্রদীপকে পরীক্ষা করতে, দেখতে তার সঙ্গিহীন একাকী জীবনে কোন নারীর স্নেহস্পর্শের প্রয়োজন আছে কি না। প্রদীপের প্রত্যাখ্যান, তার অবহেলা তাকে ক'রে তুলেছে আরও উচ্ছৃঙ্খল, আরও উদ্দাম। তাই সে এসেছে অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে, যদি প্রদীপের মন একটু আর্দ্র হয়।

প্রদীপ কিন্তু কঠিন হয়েই রইল। সংক্ষেপে বলল, চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায় না সুমিত্রা, তবু আজকের দিনে তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

সুমিত্রা এবার প্রশ্ন করল, চাকুরী ছেড়ে দিয়েছ শুনলাম, এখন কি করবে স্থির করেছ?

প্রদীপ এবার সত্যই বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, তোমাদের সেই এক প্রশ্ন, এখন কি করবে? তোমার স্বামীকে আমি দু'দিন আগেই জানিয়ে দিয়েছি, আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা আমি নিজেই ভাবব, আর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমাকে এখন বাইরে বেরুতে হবে, অর্থহীন কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট করবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।

সুমিত্রার চোখের কোণে জলের আভাস দেখা দিল। তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়াল। বলল, আমাকেও উঠতে হবে, উনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, মথুরাপুরে যেতে হবে, সেখানে বিরাট কৃষাণ-কন্‌ফারেন্স হচ্ছে, উনি সেখানে প্রধান অতিথি।

আর দেরী না করে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ।

অদ্ভুত এই পৃথিবী! সুমিত্রা যে হঠাৎ এভাবে তার কাছে আসবে স্বপ্নেও সে কল্পনা করেনি। সুমিত্রার চোখের কোণের অশ্রু তার নজর এড়ায়নি। জীবনের কাছ থেকে যা' চেয়েছিল সুমিত্রা কি তা' পায়নি? প্রতিপত্তি, সম্মান, অর্থ, কিছুই কি তাকে দিতে পারেনি আনন্দ, শান্তি? অথবা, উঞ্ছবৃত্তিই কি জীবনের ধর্ম্ম?

—আরে, মিঃ গুহ যে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কোথায় চলেছেন?

বিস্ময়ের পর বিস্ময়, অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনার পর ঘটনা! ১৯৫১ সালের পনেরোই আগষ্ট তার জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত দিন বটে!

কিন্তু এই ছবিই না দেশে ফিরে এসে [illegible] কাছে এমিলির কথা বলেছে, যা' শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে পৌঁছেছে বন্দনার কানে। যার ফলে আজ সে নিতান্তই একা!

তবে ছবি হয়ত নিতান্তই গল্পচ্ছলে বলেছিল এসব কাহিনী, সে হয়ত চায়নি যে বন্দনার কানে পৌঁছয়। সত্যি ত, তার জীবনে বন্দনা ব'লে যে কেউ আছে তা' ছবি কি ক'রে জানবে?

না, ছবির প্রতি তার কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

—ছবি? তুমি বিলেত থেকে কবে ফিরলে?

—ফিরেছি অনেক দিন। সেই পুরোনো হাসপাতালেই কাজ পেয়েছি, এখন আমি সিস্টার-ইন-চার্জ্জ।

—শুনে খুব খুশী হ'লাম। তারপর তুমি কোথায় চলেছ?

—কোথাও নয়। আজ আমার অফ-ডিউটি। সহরের সাজসজ্জা দেখতে বেরিয়েছি।···আপনি কোথায় চলেছেন?

—বিশেষ কোথাও নয়।···আমার উদ্দেশ্যও প্রায় তোমারই মত।

—তাহ'লে চলুন না, চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাই।

নীরবে প্রদীপ চলল ছবির সঙ্গে। বিনিময় করতে লাগল টুক্‌রো টুক্‌রো কথা।

পার্ক ষ্ট্রীটের কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা। ছবি বলল, চলুন একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে এক পেয়ালা কফি খাওয়া যাক্।

প্রদীপ কোন আপত্তি করল না।

রেস্তরাঁয় বসে কফির পেয়ালায় ক্রীম ঢালতে ঢালতে ছবি বলল, I owe you an apology, Mr. Guha!

—Apology? কেন?

—সেদিন ব্রাইটন-এ আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম তা' ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। লণ্ডনে অনেক বার ভেবেছি আপনার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি, কিন্তু সাহস হয়নি।

ক্ষণিকের জন্য প্রদীপের হৃৎপিণ্ডটা মোচড় দিয়ে উঠল যেন। তারপর বলল, অতীতের জের টেনে আনবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই, ছবি! তবে ক্ষমা যদি কাউকে চাইতে হয় সে হচ্ছে আমি। তুমি কোনই অপরাধ করোনি।

—আপনি আজ-কাল কি করছেন? একটু পরে ছবি প্রশ্ন করল।

—আপাততঃ কিছুই না। এসে এখানে একটা সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছিলাম, সেটা ছেড়ে দিয়েছি। ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

—আরেকটা চাকুরী পেতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না। আপনার যা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স তাতে যে-কোন বিলিতি ফার্ম্ম আপনাকে লুফে নেবে।

—সে দেখা যাবে, উপস্থিত আমি একটু স্বার্থপর হতে চাচ্ছি, অর্থাৎ I simply want to laze.

—আপনি তা পারবেন না, মিঃ গুহ! চুপ ক'রে বসে থাকা আপনার ধাতে আসে না।

প্রদীপ কোন জবাব দিল না।

ছবি চলে গেল তার এক বন্ধুর কাছে, প্রদীপ পার্কষ্ট্রীটের মোড়ে দক্ষিণগামী একটা ট্রামে উঠে পড়ল।

কোথায় যাবে সে? বন্দনার কাছে? কিন্তু কি বলবে তাকে? মনে পড়ছে বন্দনার কথাগুলো, স্পর্দ্ধার, আত্মম্ভরিতার একটা সীমা থাকা উচিত, প্রদীপ! কেন তুমি নিজেকে এতটুকু সংযত ক'রে রাখতে পারলে না? আমার অন্তর-নিংড়ানো সমস্ত অনুরাগ দিয়ে যে বিগ্রহকে আমি পুজো করছিলাম, কেন তা তুমি এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে দিলে?

কিন্তু আজ নতুন একটা সাহস তার মনে দেখা দিচ্ছে যেন। ভয়াতুর, কর্ম্মভিত্তিক পৃথিবীর অপূর্ণতা তাকে আর বিদগ্ধ ক'রে তুলছে না, ভাব-বিলাসের কুয়াসা অপসৃত হয়ে ধীরে অথচ নিশ্চয়তার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে একটা অভিযাত্রিক মন, যা জীবনকে অর্থশূন্য বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। জীবনটা হয়ত একটা ট্রাজেডি, কিন্তু যারা বীর্য্যবান তারা এই ট্রাজেডির কৃপণতা থেকেও খানিকটা বৈভব নিংড়ে আনতে পারে। প্রদীপও কেন তা পারবে না?

এই দশ বছরে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও কম হয়নি। কত বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন সে হয়েছে, কখনো দেখেছে মধ্যাহ্নের দীপ্ত আকাশ, কখনো ঢেকে ফেলেছে তামসী রাত্রির ঘনান্ধকার, কিন্তু এসব কিছুর মধ্য দিয়েই কি প্রতি-

ধ্বনিত হয়নি চলার অপরূপ অনন্তযৌবনের ছন্দ? এ বিরাট যাত্রাযজ্ঞে প্রত্যেকটি মানুষ যে একজন অভিযাত্রী। তাই আকাশে-বাতাসে হাসিকান্নায় শুনতে পাওয়া যায় অভিযানের আগমনী।

না, আজ সন্ধ্যায় সে বন্দনার কাছে নিশ্চয়ই যাবে। তাকে বলবে, নতুন এক আলোর পরিচয় সে পেয়েছে, এবং সে এসেছে এই আশায় যে বন্দনাও তা দেখতে পাবে। জীবনের যে সব ক্ষুদ্র অধ্যায়ের স্মৃতি বহু পুরানো চরণচিহ্নের মত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, তাদের যেন বন্দনা প্রাধান্য না দেয়, সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে শাশ্বত সত্যের ওপর।

অন্যমনস্কভাবে প্রদীপ ঢুকল তার ফ্ল্যাট-এ। দেখল, একটা চিঠি পড়ে আছে—বন্দনার লেখা।

হাতটা কাঁপছে যেন! সংক্ষিপ্ত চিঠি:

"প্রদীপ,

কোন রকম উপক্রমণিকা না ক'রে সোজা কথাটা বলে ফেলি। তোমার চাকুরীর ইতিপ্রাপ্তি, তারপর দাদার সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা, সব খবরই আমি পেয়েছি। অনেক ভেবে দেখলাম, আমার তোমাকে যতখানি না প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন তোমার আমাকে। তাই আমি স্থির করেছি যে আমার ভাগ্য তোমার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলতে সন্ধ্যার দিকে তোমার কাছে আসব, তুমি বাসায় থেকো কিন্তু।

—বন্দনা।

পৃথিবী সত্যি এত সুন্দর?

সমাপ্ত